সত্তর দশকের একাংক

[চোদ্দটি একাংক নাটক-সংকলন]

সম্পাদনা

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

নির্মল বুক এজেন্সী ॥ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রথম সংস্করণ ঃ অক্টোবর ১৯৭০

প্রকাশিকা ঃ
আর. দেবী
'আনন্দলোক'
৬ মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর ঃ
এম. ঘোষ
প্রসাদ প্রিণ্টার্স
৪১ শংকর ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

'নবান্ন' নাটকের রচয়িতা
সংগ্রামী নাট্যকার ও দক্ষ নট
বিজন ভট্টাচার্য স্মরণে

বোম্মানা বিশ্বনাথমের গ্রন্থাবলী

নাটক

প্রতিবাদের একাংক
সত্তর দশকের একাংক
তুমি আমায় কম্যুনিষ্ট করেছ
দৃশ্যের দর্পণে/ট্যাক্সমন্ত্রী (২য় সং)
অতন্দ্র সীমান্ত
নাম রেখেছি ঝাঁটা
অগ্নিদীক্ষা
সার্কাসের বাঘ/অন্বেষণ
আজকের ডাক
নাটিকা
সূচনা

গল্পসংগ্রহ

কৃষণচন্দরের গল্প
এখন যে হাওয়া বইছে
জিদ
দক্ষিণী
হিন্দী গল্পসংকলন
উর্দু গল্পসংকলন
কেরালার গল্পগুচ্ছ
অন্ধ্রের গল্পগুচ্ছ
একসূত্রে গাঁথা
প্রতিবেশিনী
ভারতীয় গল্পসঙ্কলন
আধুনিক ভারতের গল্প সঞ্চয়ন

লোককথা

আমার দেশের লোককথা
ভারতের রূপকথা (১ম খণ্ড)
ভারতের রূপকথা (২য় খণ্ড)

কবিতা

তিন্ প্রদেশী কবিতা
বাতিল কবিতা
আধুনিক ভারতের-কবিতা সঞ্চয়ন

কবিতা

বিক্ষত ভালবাসা

উপন্যাস

কল্যাণমল
উজ্জ্বল আগামী
আকর্ষণ
তিন মূর্তি
মাটির রঙ কালো
ঝাড়লণ্ঠন
নারায়ণ রাও
কেরল সিংহম্
চিংড়ি
দেবদাসী
আম্রপালী
সন্ধ্যারাগ
নায়িকার নাম গীতা
ইন্দুমতী
অশ্রুত এক রাগিণী
জেলেনী
রমণী
নায়িকার নাম রীতা
অগ্নিকন্যা
নায়িকা
সুরের সানাই বাজুক
জানা-অজানা
কান্তম্
মঙ্গলা
দক্ষিণাবর্তের রাণী
শুধু প্রেম
একটি প্রেমের কাহিনী

কিশোর উপন্যাস

বাড়ি-পালিয়ে

বিজ্ঞান

চাঁদ আমায় ডাক দিয়েছে

সঙ্গীত

বিপ্লবী কবি সুব্বারাও
পাণিগ্রাহীর সঙ্গীত সংগ্রহ

ভূমিকার পরিবর্তে

প্রচলিত রীতি অনুসারে এত বড় একটি সংকলনে অনেক পাতা জুড়ে ভূমিকা থাকে। কিন্তু বাঙলা দেশে নাটকের বই মূলত অভিনয় করার জন্যই কেনা হয়, শুধু পড়ার জন্য নয়। দর্শকরা অভিনয় দেখে নাটকের বিচার করেন। বাংলা নাটক পরিচালকদের ভূমিকা পড়িয়ে প্রভাবিত করা যায় না। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নাটক পরিচালনা করে থাকেন। প্রধানত এই দুটি কারণে সংকলনের প্রত্যেকটি একাংকের আলোচনা করা থেকে বিরত রইলাম।

ছ জন বিখ্যাত ও অখ্যাত নাট্যকারদের রচিত একাংক সংকলন 'প্রতিবাদের একাংক' গত বছর আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংকলনের সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। কয়েক মাসের মধ্যেই 'প্রতিবাদের একাংক' সংকলনটি বিক্রি হয়ে যাওয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে 'সত্তর দশকের একাংক' সংকলনটি প্রকাশ করার ভরসা পেয়েছি। এর প্রত্যেকটি একাংকই জীবনধর্মী।

'সত্তর দশকের একাংক' সংকলনে স্থান পেয়েছে চোদ্দো জন দক্ষ নাট্যকারের চোদ্দোটি পরিণত একাংক নাটক। এর মধ্যে বারোটি একাংক এই প্রথম ছাপা হল। সংকলন প্রকাশের কাজ ত্বরান্বিত করতে সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক নাট্যকারের যে সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা একাংক নাটকের পাণ্ডুলিপি, বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে যদি সাহায্য না করতেন তাহলে সংকলনটি প্রকাশিত হতে আরও সময় লাগত।

এই সংকলন প্রকাশের কাজে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করেছেন বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীমনোজ

বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া শ্রীসুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র আদক ও শ্রীমলয় পালের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য পেয়েছি। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালে এঁরা আমার উপর রেগে যাবেন।

পরিশেষে, এই বিরাট আয়তনের একাংক সংকলনটি প্রকাশ করে নির্মল বুক এজেন্সীর কর্ণধার শ্রীনির্মলকুমার সাহা নাট্য-কর্মীদের যে উপকার করেছেন তার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই।

৫৫ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচী

এক ০ ঊনপঞ্চাশের সেল / রবীন্দ্র ভট্টাচার্য / ৯

দুই ০ উত্তর মেলে না / বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় / ৩৩

তিন ০ হারানের নাতজামাই / অরুণ মুখোপাধ্যায় / ৫৮

চার ০ রাত্রির তপস্যা / অমল রায় / ৯০

পাঁচ ০ দেশটা যখন কারাগার / অমলেন্দু চক্রবর্তী / ১১৮

ছয় ০ ঢাকের বাদ্যি / অসীম মৈত্র / ১৪১

সাত ০ পুরুষানুক্রম / অনুপম দত্ত / ১৭৮

আট ০ কার্জন পার্ক সাক্ষী / বোম্মানা বিশ্বনাথম্ / ২০৯

নয় ০ যে হাওয়া বয়ে গেছে / পাঁচু স্বর্ণকার / ২৩৭

দশ ০ নিহত শতাব্দী / গৌতম রায় / ২৫৬

এগারো ০ ক্রান্তি পদযাত্রা / শ্যামলতনু দাশগুপ্ত / ২৭৯

বারো ০ অন্ধ তামস / সঞ্জয় গুহঠাকুরতা / ৩০৫

তেরো ০ ভাঁড় / স্মরজিৎ দত্ত / ৩৩২

চোদ্দো ০ ব্ল্যাক মার্কেট / সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য / ৩৬৪

উনপঞ্চাশের সেল
রবীন্দ্র ভট্টাচার্য

●

অনামী নাট্যসংস্থার যারা এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছে—

উনপঞ্চাশের এ—	তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
উনপঞ্চাশের স—	গোরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ঢ় রাজা—	আলোক মুখোপাধ্যায়
„ ল মন্ত্রী—	দেবব্রত রায়
„ ণ মন্ত্রী—	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
„ রক্ষী—	মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায়
„ হাবিলদার পুলিশ—	সুশান্ত হালদার
„ জেলর—	অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

●

[পর্দা তখনও ওঠেনি। দর্শকের আলো নিভে গেছে। দর্শকের পেছনে একটা গোলমাল। "চোর চোর" চিৎকার শোনা যায়। একটা স্পট দর্শকের সামনে রাখা আছে, সেই স্পটের দ্বারা পেছনদিক আলোকিত হয়। দেখা যায় একজন পুলিশ তাড়া করছে দুজন কয়েদীকে। একজনের হাতে একটা পুঁটলী। সে ঐ পুঁটলীটা নিয়ে পর্দার ভেতর চালান করে দেয়। দুজনে মঞ্চে উঠে পর্দার সামনে দাঁড়ায়। পুলিশ গালাগাল করতে করতে মঞ্চের তলায় দাঁড়িয়ে কথা বলে।]

পুলিশ॥ শালা বদমাস কাঁহেকা। ভিতরমে ভি চোরী করনে লগা। শালা তুমকো হাম মার ডালেগা। এই শালা তুমহারা ক্যা নাম আছে?

কয়েদী॥ আজ্ঞে হাবিলদার সাহেব উনপঞ্চাশের—

পুলিশ ॥ তোমকো সবকোইকা নামমে তো উনপঞ্চাশ হ্যায়। উ ছোড়কে আসলী নাম বাতাও।

কয়েদী ॥ আজ্ঞে উনপঞ্চাশের এ।

পুলিশ ॥ আওর তুমহারা?

কয়েদী ॥ উনপঞ্চাশের—

পুলিশ ॥ ফিন উনপঞ্চাশ লাগা দিয়া। মার শালেকো—মার শালে চোরকো।

[পুলিশ মঞ্চের ওপর লাঠি ঠুকতে থাকে। এরা দুজন লাফাতে থাকে। লাঠি একটাও গায়ে না পড়লেও দুজনে চিৎকার করতে থাকে—ওগো বাবাগো, গেলাম গো, ওগো বাবাগো, শেষ হলাম গো। ওগো, কে কোথায় আছ, বাঁচাও গো।]

হ্যাঁ আভি বাতা শালা তোম লোগ কেয়া চুরী করকে লে আয়া! নেহি-নেহি, আভি বাতা তুহার নাম কেয়া।

কয়েদী ॥ আমার নাম উন—

পুলিশ ॥ ফিন!

কয়েদী ॥ আর বলেগা নাই বাবা। আমার নাম দন্ত স।

পুলিশ ॥ দন্ত—অ—নেহি স বলনেসে হোগা।

এ ॥ কেমন করে হবে হাবিলদার জী। স যে তিনটে আছে।

পুলিশ ॥ একই নামমে তিনটো আদমী? কেয়া জুয়াচুরী কিয়া বোল!

স ॥ মা কালীর দিব্যি। জোচ্চুরী নয় হাবিলদারজী! একটা তালেবর শ, একটা দন্ত স আর একটা পেটকাটা ষ। তা আমি পেটকাটা হতে পারবনা।

এ ॥ হ্যাঁ ও পেটকাটা ষ হতে চায় না। মানে ষ এ তো ষাঁড়।

পুলিশ ॥ ষাঁড়।

স ॥ হ্যাঁগো তোমার মত।

পুলিশ ॥ ক্যোয়া?

এ ॥ মানে আমাদের বাংলায় ঐ রকম করেই বোঝান হয়। কিরে উনপঞ্চাশের দন্ত স বল না ছড়াগুলো।

স॥ (লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে নাচতে ছড়া বলে) অ অজগর আসছে তেড়ে।

ঐ॥ (নাচতে নাচতে) আ এ আমটি খাব পেড়ে।

পুলিশ॥ বাহবা! বাহবা!!

স॥ ইঁদুরছানা ভয়ে মরে!

পুলিশ॥ চুহা?

ঐ॥ ঈগলছানা পাছে ধরে!

পুলিশ॥ এ্যাই—এ্যাই—শালা পাকড়নে কো বাত ক্যা কহা!

স॥ এই দেখ, পাকড়ানোর কথা কেন বলব?

লুলিশ॥ চোরী কো মাল কাঁহা গয়া?

ঐ॥ চুরী আমরা করিনি হাবিলদার জী।

পুলিশ॥ তো কামিজকে নীচে কেয়া থা।

স॥ কিছু নয়—কিছু নয়! আমরা কি কিছু রাখতে পারি জী?

পুলিশ॥ তু লোগকো সার্চ করনে হোগা।

[পুলিশ এগিয়ে গিয়ে মঞ্চে উঠতে থাকে।]

ঐ॥ এই মরেছে। আবার বুঝি ল্যাংটো করাবে।

স॥ দেখ হাবিলদারজী সব সময় কাপড় জামা খুলকে হামলোগকো কাহে বেইজ্জত করতা ভাই।

ঐ॥ একবার ভেবে দেখুন দাদা। মানে হাবিলদারজী।

পুলিশ॥ বেইজ্জত। তুহার কো। (উচ্চহাসি) শালে চোরোকো শরম লগ গয়া। ক্যা তাজ্জব! ক্যা তাজ্জব কী বাত! ইধার আ—জলদী আ—তুরন্ত আ।

[দুজনে আসে। পুলিশ সার্চ করে।]

লেকিন মৈঁ তো আপনে আঁখোসে দেখা কুছ লে আতে থে।

ঐ॥ বোধহয় ক, খ, গ, ঘ কেউ হবে।

পুলিশ॥ আঁ!

স॥ কিংবা চ, ছ, জ, ঝ কেউ হতে পারে।

পুলিশ॥ শালা হুজ্জৎ চালাবে চোরী করবে। আওর ঝুটা ভি বলবে।

শালা বদমাস! শালা চোর—পাগলা কাঁহিকা! ইধার আকে ভি চোরী করনে লগা, শালা বদমাস!

[পুলিশ এলোপাথাড়ি আঘাত করে চলে যায়। ঞ এবং স ওঠে। দুজনে পাগলের মত হাসে। ঞ হাসে, স তার সঙ্গে হাসতে থাকে।]

ঞ ॥ আসল ব্যাপার কি জানেন!

স ॥ আমরা সত্যিই চুরি করেছি।

ঞ ॥ তাত আপনারা দেখেইছেন।

স ॥ ঐ যে পুঁটলিটা সমীর—।

ঞ। (স'র মুখ চেপে ধরে) আমাদের নাম এখন 'ঞ' আর 'স'। কেন জানেন? সত্যিকারের নামটা মারের চোটে ভুলে গেছি। বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছেন ভদ্দরলোকের ছেলেরা বলে কি? এই দেখুন—দেখা নারে দন্ত স।

[দুজনে পিঠের জামা তুলে দেখায়। ক্ষতবিক্ষত পিঠ।]

স ॥ আরও আছে। দেখাতে পারব না। সেন্সর আটকে দেবে।

ঞ। তাছাড়া আপনারা সবাই জানেন। কি অত্যাচার হয়! কেমন হয়—! কেমন করে আমাদের শেষ হতে হয় সবই আপনারা জানেন।

স ॥ তা এই মারের চোটে আমাদের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে।

ঞ ॥ বাপের নামও।

স ॥ হ্যাঁ!

ঞ ॥ এখন আমরা উনপঞ্চাশের দলে। মানে পাগলা গারদে। জেলের পাগলদের দলে। আমরা সবাই এখন পাগল।

স ॥ কেউ বলে উনপঞ্চাশের নাম বলতেই হবে।

ঞ ॥ আবার কেউ বলে উনপঞ্চাশ নেহি বোলনা হোগা।

স ॥ দেখলেন তো হাবিলদারজীর মতামত।

ঞ ॥ হাবিলদারজী কিন্তু আমাদের মারে নি।

স ॥ মানে ওরা আমাদের মারতে ভয় পায়।

এ ॥ আমরা কামড়ে আঁচড়ে দিই তো!

স ॥ অনেক সময় শেষ করবার জন্তে গলা টিপেও ধরি।

দুজনে ॥ আমরা যে উনপঞ্চাশের শিবিরে।

এ ॥ তবে ঐরকম বাবাগো মাগো করতেই হবে।

স ॥ যখন সত্যি মার খেতাম তখন কোন কথা মুখ দিয়ে বেরোত না।

এ ॥ ওরা কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারত না।

স ॥ যখন কিছুতেই বশে আনতে পারল না বা মরেও গেলাম না তখন—

এ ॥ আমাদের এই শিবিরে পুরল। আমরা হলাম পাগল।

দুজনে ॥ এখন আমরা উনপঞ্চাশ।

স ॥ আমরা ঐ পুঁটলিটার মধ্যে পোষাক নিয়ে এসেছি।

এ ॥ হাবিলদারজীদের রামলীলা হয় রাতে। পোষাক চুরী করে নিয়ে এসেছি।

স ॥ কি করব বলুন। আমাদের রাজার পোষাক নেই।

এ ॥ আমরা রাজা নির্বাচন করেছি। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক মতে।

স ॥ সিক্রেট ব্যালটে।

এ ॥ অবশ্য কেউ কেউ বলছে আমরা নাকি রিগিং করে রাজা করেছি।

স ॥ কু-লোকের কু-অভ্যাস। জনগণের ভোটে রাজা করলাম তাও নাকি জাল।

এ ॥ যে যা বলে বলুক। আমরা বলেছি সমাজতন্ত্র আনবই। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করবই।

স। তার জন্তেই রিগিংই বলুন আর গুণ্ডামীই বলুন যাহোক করে রাজা নির্বাচিত করেছি। একেবারে modern secret ব্যালটে।

এ ॥ এতক্ষণে রাজা নিশ্চয়ই পোষাক পরে ফেলেছে।

স ॥ তিনি বোধহয় রাজসভায় আসছেন।

এ ॥ কেন?

দুজন ॥ সমাজতন্ত্র আনতে।

স ॥ কেন?

দুজন ॥ গণতন্ত্রের গ্যাড়াকল সরাতে।

[একটা শিঙার আওয়াজ বা ব্যাণ্ডের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।]

এ ॥ ঐ বাঁশি বেজেছে।

স ॥ রাজা আসছেন।

এ ॥ এখনই বিচার হবে।

দুজনে ॥ সমাজতন্ত্রের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে মানুষের ভোটে নির্বাচিত উনপঞ্চাশের মুলুকে রাজা ঢ-এশূন্য র (ঢ়) বিচার সভা অলংকৃত করতে আসছেন।

[নকীব যেমন করে হাঁকে তেমনি করে দুজনে সুর করে বলে যায়। এই সময় পর্দা খোলে। একটা মোটামুটি সিংহাসন। পেছনের পর্দায় একটা জেলের দরজা আঁকা। সেখানে দুটো রাইফেলের Symbol এবং রাইফেল দুটোতে মালা দেওয়া। রাজা মারাত্মক রকমের বিনয়ী। সব সময় হাসি মুখে কথা বলে। প্রত্যেককে নমস্কার জানায়। একটা বিদঘুটে হাসি হাসে। রাজার সঙ্গে প্রবেশ করে উনপঞ্চাশের ল। ল সব সময় কথার মধ্যে ল-এর যোগ রাখে। অর্থাৎ কথা বলে বাচ্চা ছেলের মত আধো আধো। রাজা প্রবেশ করল। রাজার হাতে একটা আরতি করার ঘণ্টা। সেটা বাজাতে বাজাতে ঢুকল মন্ত্রী অর্থাৎ ল-এর হাতে একটা কাল রঙএর চামর। সেটা দিয়ে রাজার গায়ে বাতাস দিতে দিতে প্রবেশ করে। সকলেরই কয়েদীর পোশাক। রাজার মাথায় মুকুট, কোমরে জরীর কোমরবন্ধ, হাতে বাজুবন্ধ ইত্যাদি। মন্ত্রী লএর পোশাকও কয়েদীর, তার ওপর যতটা পারবে জরীর পোশাক ইত্যাদি থাকবে। রাজার দাড়ি থাকবে।]

রাজা ॥ কি সৌভাগ্য আমার! আমার বাপ রাজা ছিল। আমিও রাজা হলাম। আমার বাপকে আপনারা ভোট দিয়ে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, আমাকেও আবার সেই সিংহাসনে বসালেন। এখনও (সিংহাসন শুঁকে নেয়) এখনও বাবার পাছার গন্ধ রয়েছে সিংহাসনে। জনগণ আমার ভালবাসার ধন, আমার ভাললাগার লগি। আপনাদের আমি সবসময়ে সেবা করতে চাই। সেবা পরম ধর্ম।

ঞ ॥ তাই বুঝি গুণ্ডামী করে রাজা হলেন?

রাজা ॥ ঠ্যাঙ ধরে চিরে ফেলব।

মন্ত্রী ॥ লাজামশাই ওলা বিলোধী পক্ষ। ওদেল বলতে দিন। এটা লিয়ম।

রাজা ॥ আঁতুরঘরের নিয়ম ফলাতে এসেছ। ওসব আমাকে দেখিও না। ঠ্যাঙারেদের খবর দাও। তুলে নিয়ে যাক ব্যাটাদের।

মন্ত্রী ॥ লাজা ঢ়। সারা পৃথিবীল মানুষেল কাছে মানইজ্জত লাখতে হলে কটা বিলোধী দলকাল। তা না হলে মান থাকে না।

রাজা ॥ ওরে ব্যাটা মন্ত্রী ল ঐ কটা সিট ঠেঙিয়ে নিয়ে নিতে পারলি না?

মন্ত্রী ॥ লাজা ঢ়। ওই কটা তো ইচ্ছে কলেই ছেলে দেওয়া হয়েছে। অন্য দেশে মানইজ্জত লাখতে হবে তো।

রাজা ॥ বুঝলাম। তাই বলে মুখের ওপর গুণ্ডা ফুণ্ডা বলবে! আমি কি গুণ্ডা! আমি কি—

স ॥ সিংহাসনের গন্ধ শুঁকছিস কি রিগিং না করেই।

রাজা ॥ মন্ত্রী ঊনপঞ্চাশের ল। ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আমার Power এর কথা ভুলে না যায়।

মন্ত্রী ॥ ওলা মুখে আগুলে যাবে। কালকেল সংবাদ পত্রে এ সব খবল চাপাও কলে দেওয়া হবে।

রাজা ॥ মুখের কথা যদি কাজে করতে চায়।

মন্ত্রী ॥ ধল থেকে মুণ্ডু আলাদা হবে। ঠ্যাঙ ধরে চিলে ফেলবে। সে কাজ তো শুলু হয়ে গেছে রাজা ঢ়।

ঞ ॥ অনাভিকে কথা না বলে ঢ় ট্যাড়সটাকে জোরে মলের মুখে কথা বলতে বলবে শালা মন্ত্রী ল।

রাজা ॥ আমাকে চ্যাড়স বলছে। কাগজে এটা ফলাও করে ছাপবে। আমার এত ক্ষমতা তবু ওদের টিপে মেরে ফেলবনা বলতে চাও মন্ত্রী ল।

মন্ত্রী ॥ গণতন্ত্র দেখাতে হবে না। ছমাজতন্ত্র পতিষ্ঠা কলতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

রাজা ॥ বিরোধী যেন মনে রাখে আমি দেশ থেকে গরীব উচ্ছেদ করে দেশের সম্পদে সকলকে সমান অধিকার দেব।

স ॥ রাজা ঢ! এসব বুলি কপচে আর কি কোন লাভ হচ্ছে! দেশের কোটি কোটি মানুষেরা এখন এসব বুলি মুখস্থ করে ফেলেছে।

ঞ ॥ নতুন কিছু ছাড়ুন। নতুন ধারাপাত তৈরি হক।

রাজা। এই শালা উনপঞ্চাশের স। আরে ব্যাটা উনপঞ্চাশের ঞ বেরিয়ে যা—দূর হ রাজসভা থেকে।

মন্ত্রী ॥ লাজামশাই! বিলোধীদেল অমল কলে বললে বদলাম হবে। অমল কলে বলবেল না।

রাজা। এই ব্যাটা লএর বাচ্ছা! মুখ বুঁজে চুপটি করে বসে যা করতে বলব করবি। ফ্যাচর ফ্যাচর করলে তোকেই গারদে পুরব।

ঞ ॥ ক্ষমতার দম্ভে নিজের হাত পা কাটতে শুরু করেছে আহম্মকটা।

রাজা ॥ দয়া করে তোদের কটাকে নিয়েছি জানবি। বেশী বাড়াবাড়ি করলে—।

স ॥ বিরোধীদের ঠেঙ্গিয়ে নিকেশ করবে রাজা?

রাজা। ফুঁ দিলে উড়ে যাবি জানবি।

ঞ। বেশ আমরা বাইরে সংগঠিত করব জনশক্তিকে। এ স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাবই।

রাজা। কটা বুলি দিয়ে আমার বুড়ো আঙুল করবি। চাই টাকা—! বুঝলি ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ।

স। টাকা দিয়ে মন কেনা যায় না ঢ ঢ্যাড়স।

ঞ ॥ টাকা দিয়ে বিবেক কেনা যায় না রে মর্কট।

স ॥ চল, উনপঞ্চাশের ঞ। আমরা এ সভা পরিত্যাগ করি।

১ম ॥ চল উনপঞ্চাশের স। আমরা বাইরে থেকেই কাজ চালাবো। চ্যাঁড়স রাজা চুলোয় যাক।

[স্লোগান দিতে দিতে দুজনে চলে যায়। রাজা উঠে দ্রুত পায়চারি করতে থাকে। তার পেছনে মন্ত্রী ল ঘুরতে থাকে।]

রাজা ॥ আমি চ্যাঁড়স। আমি অপদার্থ। কচুকাটা করব। মন্ত্রী।

মন্ত্রী ॥ মহালাজ!

রাজা ॥ উপায়—উপায় বল!

মন্ত্রী ॥ ওদের ফিলিয়ে এনে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—

রাজা ॥ (চিৎকার করে) মাটি নাও—এখুনি মাটি নাও।

মন্ত্রী ॥ ভুল বলেছি।

রাজা ॥ মাটি নিতে বলছি না।

মন্ত্রী ॥ কষ্ট হবে লাজা। লাগবে লাজা ঢ়।

রাজা ॥ তখন থেকে বলছি মাটি নিতে।

[রাজা গলাধাক্কা দিয়ে মন্ত্রীকে মাটিতে ফেলে। পা দিয়ে মাটি মাখার মত তাকে মাখতে থাকে। মন্ত্রী চিৎকার করে চলে।]

মন্ত্রী ॥ মলে গেলাম—মলে গেলাম। লাজা মেলে ফেলল। বাঁচাও—বাঁচাও।

রাজা ॥ এবার উপায় বল মন্ত্রী!

মন্ত্রী ॥ হিটলাল হতে হবে!

রাজা ॥ হিটলার আবার কেডা?

মন্ত্রী ॥ হিতলাল একা সমস্ত পৃথিবীল ইহুদী শেষ কলতে ইহুদী নিধন যজ্ঞ কলেছিল। সালা পৃথিবী ধ্বংস কলতে—।

রাজা ॥ মনে পড়েছে—মনে পড়েছে। হিটলার হচ্ছে সেই মহান পণ্ডিত লোকটা যে বন্ধুদের চেষ্টায় জর্মানীর সর্বেসর্বা হল। সে সবচেয়ে আগে বন্ধুদের গোপন ভাবে হত্যা করল।

মন্ত্রী ॥ আমরা আপনার আদেশ শুনব রাজা মশাই। আমরা আপনার গোলাম হয়ে থাকব রাজা।

রাজা ॥ বেগড়বাই করেছ কি—

[আবার পা দিয়ে মাড়াতে থাকে।]

মন্ত্রী ॥ মলে গেলাম—মলে গেলাম। রাজামশাই আমাকে মেরে ফেলল।

রাজা ॥ মনে পড়েছে। হিটলার মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলে সবচেয়ে বেশী দলাইমলাই।

মন্ত্রী ॥ আমাদের রাজার কি বুদ্ধি!

রাজা ॥ হিটলার তৈরি করেছিল গেষ্টাপো বাহিনী। রাজ্যের মধ্যে খুন করিয়ে দোষ দিত বিরোধীগুলোকে। ওঠ মন্ত্রী তড়াক করে লাফিয়ে ওঠ।

[মন্ত্রী তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে।]

মন্ত্রী ॥ (নাচতে নাচতে) রাইকষ্টাগে আগুন দিল হিতলার। দোষ পরল কমুনিষ্টদের।

রাজা ॥ মন্ত্রী চারদিকে বলে দাও সমাজতন্ত্র চাই—আমাদের রাজা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর।

মন্ত্রী ॥ (চিৎকার করে দর্শকের সামনে বলতে থাকে) ছমাজতন্ত্র চাই। আমাদের রাজা ছমাজতন্ত্রের ছেবক।

[নেপথ্যে মাইকে কোরাস শোনা যায়—"রাজা চ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন। সমাজতন্ত্র চাই-ই-চাই। বিরোধীরা হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার!"]

রাজা ॥ মন্ত্রী, দেশে কটা দল ?

মন্ত্রী ॥ বড় কম্যুনিষ্ট, মেজ কম্যুনিষ্ট, ছোট কম্যুনিষ্ট, বড় বিপ্লবী, আধা বিপ্লবী, ছোট বিপ্লবী। মানুষদল, অমানুষদল, বনমানুষদল। জনমানব পন্থী, লোকমানবপন্থী, হিংসাতন্ত্রী, অহিংসাপন্থী, বুদ্ধপন্থী।

রাজা ॥ আরও আছে ?

মন্ত্রী ॥ হমকীপন্থী অহিংস দল, লেঠেলপন্থী অহিংস দল আর—

রাজা ॥ ছোটদের ফুঁ দিলেই চলবে। তাহলে চোদ্দটি রাজনৈতিক দল।

এর মধ্যে একটা ঘাটের মড়াকে বেছে নিয়ে গেষ্টাপো দিয়ে, খুড়ি ঠেঙারে বাহিনী দিয়ে খুন করাও।

মন্ত্রী ॥ কাকে বলব লাজা ঢ়?

রাজা ॥ যাকে সব দল ভালবাসে। যে আমার বাপকে সিংহাসনে বসাতে সাহায্য করেছিল। যে শালা পরে উলটো গাওনা গাইছে।

মন্ত্রী ॥ একাত্তলেল অবন্তী বোস আছে।

রাজা ॥ নেতাজী দলের বোস বুড়ো।

মন্ত্রী ॥ ঠিক তাই লাজা।

রাজা ॥ সাবড়ে দাও ব্যাটাকে। প্রচার করে দাও বিরোধীরা খুন করেছে অশীতি-পর বৃদ্ধকে। ধরে নিয়ে এস ঞ টাকে। দেখবে দেশের জনগণ হাততালি দিচ্ছে। কটা কাগজওলাকে কয়েক কোটি দিয়ে উলটো পুরাণ চালাও।

মন্ত্রী ॥ সব কাগজে তো সংবাদটা—।

রাজা ॥ যে কাগজ মানবে না তাদের প্রেস লুঠ করে দাও। আমাদের অনুগত কাগজকে দিয়ে বলাও জনগণ খেপচুরিয়াস হয়ে কাগজলুঠ করেছে।

মন্ত্রী ॥ কাগজ বাঁচাতে সব কাগজওলা আমাদের কথা বলবেই বলবে।

রজা ॥ তবু যদি কোন শালা বিটলেমী করে!

মন্ত্রী ॥ তাহলে তো গণ্ডগোল হবে লাজা?

রাজা ॥ কাজ সারগে যাও। অহিংসমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দাও!

মন্ত্রী ॥ লাজা আমাদেল মহান। লাজার জয় হক। লাজা দীর্ঘজীবি হন। শালা খচ্চল লাজা মালিয়ে দিয়েছে। শালা কোথাকার।

[মন্ত্রী সেলাম করতে করতে চলে যায়।]

রাজা ॥ দেশশাসন দেখাচ্ছে। আমার পিতৃপুরুষেরা রাজা। আমরা বংশপরম্পরায় রাজত্ব চালিয়ে এসেছি। বিরোধীদল করবে কাবু। আমার বাপঠাকুর্দা বিদেশীদের সাহায্য করতে একটার পর একটা আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরি চালিয়ে শেষ করেছে। আমাকে এসেছে বুদ্ধির জোরে কাবু করতে। কত ঞ কত স দেখলাম আর আমার রাজত্বে দেখাবে বুড়ো আঙুল।

[প্রবেশ করল অহিংসমন্ত্রী উনপঞ্চাশের প]

উনপঞ্চাশের ৭॥ তুমি হয়েছো অহিংসমন্ত্রী। তোমার হবিষ্যি করে দিন কাটানর কথা। এদিকে তুমি—।

অ-মন্ত্রী॥ রাজা ঢ়। আমি আজও মাটির মালসায় দেরাদুন রাইসের ভাত, মুরগীর রোষ্ট, শুওরের কিমা, ইটালীর হুইস্কী দিয়ে অন্ন ভক্ষণ করেছি। সংবাদে আমার হবিষ্যির কথা ফলাও করে বার হয়েছে।

রাজা॥ সেখানে তো কাঁচকলা, ডাল ভাতে, রাঙা আলুর কথা লেখা হচ্ছে হারামজাদা!

অ-মন্ত্রী॥ সেটাই তো আমার কৃতিত্ব। অহিংসমন্ত্রী হয়ে হিংসার মোকাবিলা করতে হলে যেমন হেঁ—হেঁ—হেঁ।

রাজা॥ এদিকে রাজ্যের অবস্থা শুনেছ?

অ-মন্ত্রী॥ ঠাঙাড়ে পাঠিয়েছি। কয়েক হাজার পুলিশের ইউনিফর্ম হরণ করে সাধারণ বস্ত্র দিয়ে ঠাঙারে বাহিনী গড়ে দিয়েছি। তাছাড়া কয়েক'শ মাস্তানকে একশ টাকা করে মাইনে দিয়ে ঐ দলের সহযোগিতা করতে পাঠিয়েছি। এতক্ষণে অবন্তী বোস বোধহয়—

[বাইরে আর্তনাদ।

নেপথ্যে: আমি তোমাদের কি করেছি? আমাকে তোমরা হত্যা করছ কেন? যদি কোন অন্যায় আমি করে থাকি তাহলে মৃত্যুর আগে আমাকে তা জেনে যেতে দাও।

একটা হল্লা, চিৎকার হুল্লোড়, সেই সঙ্গে বৃদ্ধের আর্তনাদ।]

অ-মন্ত্রী॥ অবন্তী বোসের লাস পড়ল। রাজা ঢ় এবার বিবৃতি দিন।

রাজা॥ (দর্শকের দিকে এগিয়ে যায়) আজ আমাদের বড়ই দুঃখের দিন। আজ সমগ্র দেশে শোকের ছায়া। অশীতিপর বৃদ্ধ অবন্তী বোসকে খুন করা হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে তার দেহে বার বার ছোরার আঘাত করা হয়েছে। উনি মৃত্যুর আগেও বলেছিলেন—আমি তোমাদের কি করেছি। (চোখের জল মুছে এদিক ওদিক তাকিয়ে) কে একাজ করেছে? কারা হিংসায় মদত দিচ্ছে? হিংসার রাজনীতিতে

মেতে উঠেছে কারা। দেশে কমিউনিষ্টরা খুনের খেলায় মেতে উঠেছে। ওরা চীনের দালাল ছাড়া কিছুই নয়। সব বিদেশের ধার করা। নিজের দেশকে ওরা ভালবাসতে পারেনি। ওরা ধর্ম মানে না, এমনকি মা বাপকেও মানেনা। এদের ক্ষমা নয়। এদেরকে কোন ভালবাসা নয়।

অ-মন্ত্রী ॥ রাজা ঢ়! আদেশ পেলে এদের প্রত্যেকটাকে ধরে ধরে মেরে মেরে কবরে দিই।

রাজা ॥ বুদ্ধ, চৈতন্যের দেশ ভারতবর্ষ। এখানে চীনের তেলেপোকা চচ্চড়ি চলবে না। ব্যাঙের ছেঁচকী যাদের ভাল লাগবে তারা এখান থেকে বিদায় নিক।

অ-মন্ত্রী ॥ আমাদের উনপঞ্চাশ রাজ্যে হিংসার রাজনীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের ধরে ধরে—ধরে ধরে—! রাজা—রাজা ধরে ধরে—!

রাজা ॥ কি হল আটকাচ্ছে কিসে?

অ-মন্ত্রী ॥ ধরে ধরে কি করব? আইন কই!

রাজা ॥ কি আইন চাই? কালাকানুন তো আছে।

অ-মন্ত্রী ॥ অনেক ক্ষমতা শাসনবিভাগকে দিতে হবে। পুলিশ ধরবে মারবে, দরকার হলে লাশ করবে। কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না পুলিশকে। এমন আইন দিতে হবে।

রাজা ॥ সেরকম কিছু হাতের সামনে কই?

অ-মন্ত্রী ॥ মিসা! মিসা দিন! মেরে পটকে ফেলব। ছেলেমেয়েগুলোকে ধরে চটকে দেব।

রাজা ॥ বেশ মিসাই রইল। আইনসভায় একটু তুলতে হবে। সে পরে দেখা যাবে।

অ-মন্ত্রী ॥ লে আও শালা উনপঞ্চাশের এককে। খুব বাত মেরেছিল সেদিন। আমায় চোর বলেছিল। সাতখানা বাড়ী তুলেছি নাকি চুরীর পয়সায়। এবার বলাব শালাকে ওর বাপের টাকায় তুলেছি। এককে হাজির করছিস না কেন?

রাজা ॥ আমার হাই উঠছে। একটু বিশ্রামের—

অ-মন্ত্রী ॥ আমি হাওয়াই দিচ্ছি। তুদিনে ঠাণ্ডা করে দেব দেশ। আপনি ঘুমোনগে যান।

রাজা ॥ সেই ভাল। সব জুড়িয়ে গেলে আমায় ডেক। আঃ-হাঃ-আঃ (হাই তুলতে তুলতে অন্তপুরে চলে গেল রাজা)

অ-মন্ত্রী ॥ আইনসভায় লাথি মেরে চলে গেল। বলে কিনা রিগিং রাজার রাজত্বকে আমরা বয়কট করছি। কইরে শালা ঞ—এদিক এদিকে।

[একজন রক্ষী পোশাক খাকী অথবা অন্য যে কোন রকমের—প্রবেশ করে ঞ-কে নিয়ে। ঞ'র ওপর অত্যাচার হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।]

অ-মন্ত্রী ॥ বাবা রক্ষী তুমি কি দেখেছ ?

রক্ষী ॥ অ—অ—অ !

অ-মন্ত্রী ॥ হ্যাঁ বোবা বনে যাবে। টুঁ শব্দটি করেছ কি গুম খুন হয়েছ।

ঞ ॥ খুন হতে সময় লাগবে না। সাদা পোষাকের পুলিশ মারবে রাস্তার মোড়ে। বাজারী সংবাদ বলবে হিংসার রাজনীতির বলি।

অ-মন্ত্রী ॥ বাবা রক্ষী কি শুনলে ?

রক্ষী ॥ (কানে হাত দিয়ে দেখায়) অঁা—অঁা—অঁা।

অ-মন্ত্রী ॥ কোন কথা শুনতে পাও না। মানে কালা। মনে রেখ বাবা। নইলে হেঁ—হেঁ—হেঁ। কিরে শালা বিরোধী নেতার বাচ্ছা ঠিক বলেছি না!

ঞ ॥ কেই বা তার যাচাই করছে। শিয়ালদহের ফড়েদের সর্দার হয়েছে পুলিশ মন্ত্রী। আমাদের কপালে কি আছে তাত জানাই যাচ্ছে।

অ-মন্ত্রী ॥ বাবা রক্ষী আমাকে তোমার চাবুকটা দাও তো! কি হল আমার আদেশ মানবার সময় একটু শুনে ফেল। নয়ত আদেশ পালন করবে কি করে বাবা!

রক্ষী ॥ (চট্ করে কোমরে জড়ান চাবুক মন্ত্রীকে দেয়) আঁা—আঁা—আঁা!

অ-মন্ত্রী ॥ সময়ে শুনতে না পেলে কি চলে বাবা। জান, কালাদের শালা বললে ঠিক শুনতে পায়। (চাবুক মেরে ঞ-কে) তাই না বিরোধী নেতা উনপঞ্চাশের ঞ।

ঞ। কতদিন দেশের লোককে বোবা কালা সাজিয়ে রাখবে কড়ে সর্দার প।

অ-মন্ত্রী। বাবা রক্ষী জননেতাকে বার চারেক কষাও তো।

রক্ষী। আঁ—আঁ—আঁ।

অ-মন্ত্রী। শুনতে না পেলে তো চলবে না বাবা রক্ষী। এটি যে আমার আদেশ।

রক্ষী। আঁ—আঁ—আঁ।

[চারবার চাবুক মারে ঞ-কে।]

অ-মন্ত্রী। একটু করুণা করে মালে মনে হল রক্ষী।

রক্ষী। আঁ—আঁ—আঁ!

অ-মন্ত্রী। বাইরে অপেক্ষা কর। তোমার ওপর নজর রইল। ভবিষ্যতে ঠিকমত পা ফেলবার চেষ্টা করবে।

রক্ষী। আঁ—আঁ! [সেলাম করতে করতে প্রস্থান।]

অ-মন্ত্রী। দেখলে খুনীভায়া! তোমাদের আস্কারায় পাহারাদাররা কি রকম বেয়াদপ হয়ে উঠেছে।

ঞ। ভয় দেখিয়ে সুস্থ মানুষকে কতকাল বোবা কালা করে রাখা যায় বলতে পারেন?

অ-মন্ত্রী। আমাদের ক্ষমতা যতদিন থাকবে ততদিন এইভাবে চলতে হবে। যদি না চলে খেতে পাবে না। বৌছেলে নিয়ে উপোষ করে মরতে হবে। নয়ত ফলিডল খেয়ে এক সঙ্গে ধড়ফড়িয়ে মরতে হবে।

ঞ। তাতে মেরে অনেককে কাবু করেছেন। সকলকে তো পারলেন না।

অ-মন্ত্রী। মিসা! এবার যে মিসার ক্ষমতা পেয়েছি।

ঞ। বেশ প্রয়োগ করে দেখুন আরও কতকাল টেঁকতে পারেন।

অ-মন্ত্রী। ধৈর্যের বাঁধটা ভেঙ্গে গেল। হেঁ—হেঁ—হেঁ।

ঞ। বাঁচলাম!

অ মন্ত্রী। মরলে!

ঞ। যতশীঘ্র হয় ততই ভাল।

অ-মন্ত্রী। তা হতে দেব না। একটু একটু করে। একবারে শেষ করলে

তো সব ল্যাটা চুকে যাবে। অত বড় একটি লোককে খুন করলে। তার শাস্তি কি ছুট বলতে শেষ হয়।

এ॥ একদিন কিন্তু জানাজানি হবেই। তখন আপনাকে এর চেয়ে কঠিন শাস্তি—।

অ-মন্ত্রী॥ এ্যাই চুপ!

এ॥ ভয় লাগছে!

অ-মন্ত্রী॥ ভয় পাবে অহিংসা মন্ত্রী!

এ॥ ভয় পেয়েছেন বলেই তো নিজেরা খুন করে দেশের লোকের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন!

অ-মন্ত্রী॥ তাহলে সাক্ষীদের ডাকতে হল।

এ॥ মানে?

অ-মন্ত্রী॥ আদালতের সামনে সাক্ষীদের হাজির করছি। এরাই বলবে সত্য ঘটনা।

এ॥ আদালত কোথায়?

অ-মন্ত্রী॥ খাতায় নথিবদ্ধ হচ্ছে ঠিক। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। কাল সংবাদপত্রে দেখতে পাবে উনপঞ্চাশের এ-কে আদালতে হাজির করা হয়। দোষী সাব্যস্ত হয়ে—। এই শালা সাক্ষী—।

[দেখা যায় রক্ষী হাতে একটি লোটা, মুখে দাঁতন নিয়ে, মালকোঁচা করে ধুতি পরে কাওয়ালী গাইতে গাইতে চলেছে।]

রক্ষী॥ সবসে বড়া রাম ভাইয়া,
উসসে বড়া কোই নেই।
রাবণ যবসে পিছে পড়া,
লক্ষ্মণ উসে গোলী মারা।
রামসে বড়া কোই নেই ভাইয়া,
রামসে বড়া কোই নাই।

অ-মন্ত্রী॥ হ্যাগো তোমার নামই তো রামগির।

রক্ষী॥ জী বাবু। রাম ভি কহনে সকতা আওরগির ভি কহনে সকতা।

অ-মন্ত্রী ॥ আমি রামু বলেই ডাকব।

রক্ষী ॥ আপকে মর্জি বড়া পুলিশ ভাইয়া মুঝে পেয়ার করকে বোল্‌নে সে—।

অ-মন্ত্রী ॥ ওহে রামু দেখত এ লোকটাকে চিনতে পার কিনা!

রক্ষী ॥ কোন আদ্‌মীকো বাবু!

অ-মন্ত্রী ॥ এই তো এই মিচকে পটাশটিকে।

রক্ষী ॥ (তাকিয়েই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফাতে থাকে) রাম—রাম—রাম। হেই রামজী মুঝে বাঁচা লোও বাবু। হেই বাবা মহাদেও, হেই রামজী।

অ-মন্ত্রী ॥ কি গো কি হল রামু? অমন কাঁপছ কেন?

রক্ষী ॥ মুঝে ছোড় দেও বাবু। মৈঁ কভি এত্‌না সাবেরে গঙ্গা সিনান মেঁ নহি জায়েগা।

অ-মন্ত্রী ॥ উস্‌কো ঠিক্‌সে দেখত। পহলে দেখা।

রক্ষী ॥ বহুত দেখ্‌চুকা। হায় বাপ। রাম্‌সে বড়া কোই নহিয়ে ভাই। মুঝে বাঁচা লেও রে ভাই।

অ-মন্ত্রী ॥ ওকে কোথায় দেখেছ আগে?

রক্ষী ॥ ওহিদিন। ম্যাঁয় গাতে গাতে সেনান করনে যাতে থে। তো পাঁচ আদ্‌মী একসাথ হোকে, আই বাপ ওহি তো লীডর থে। দো হাত মে দো ছোরা।

এ ॥ আমার হাতে ছোরা দেখলে?

রক্ষী ॥ বাবুজী মৈঁ চলে।

অ-মন্ত্রী ॥ কাউকে মারছিল নাকি?

রক্ষী ॥ এক বুড্ডা আদ্‌মী বাবু। বহ কহতে কি। মুঝে কেঁও মারতে বাবা। মৈঁ তো তুম্‌হারা কুছ্‌ বিগাড়া নেহি।

অ-মন্ত্রী ॥ আরও কিছু শুনতে ইচ্ছে হয় খুনী নেতা।

রক্ষী ॥ বাবুজী মুঝে মাফ্‌ কিজিয়ে। খুন গির্‌তা থা—বুড্ডে আদ্‌মী কো পশিনা একদম—(কেঁদে ফেলে) মুঝে মাফ্‌ কিজিয়ে বাবুজী। মৈঁ আওর কভি সবেরে সেনান করনে নহী যায়েগা। মুঝে বাঁচা লেও ভগওয়ান।

রক্ষী ॥ সব্‌সে বড়া রাম ভাইয়া।
উস্‌সে বড়া কোই নেহী।

রাম ভাইয়া রে—

(কেঁদে কেঁদে) রাম ভাইয়া তু কাঁহা গেইলা রে!

[রক্ষী চলে যায়।]

অ-মন্ত্রী ॥ আর পাঁচটা কে ছিল উনপঞ্চাশের ঞ।

ঞ ॥ সেটা আমার মুখ থেকে শোনার অপেক্ষায় বসে আছে সরকার!

অ-মন্ত্রী ॥ হ্যাঁ আমরা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করি। আমরা চেষ্টা করি যাতে নির্দোষ ব্যক্তির কোন সাজা না হয়।

ঞ ॥ আমি খুন করিনি। আমি খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। সন্ত্রাসের রাজনীতি অত্যাচারী শাসকের সুবিধা করে। তা জানি বলেই আমরা তাকে ঘৃণা করি।

অ-মন্ত্রী ॥ আচ্ছা, আচ্ছা থাক। নিয়ে এস মাঠের আসামী খুনী উনপঞ্চাশের স-কে।

[রক্ষী একটি শাড়ীর আঁচল গায়ে জড়াতে জড়াতে প্রবেশ করে।]

রক্ষী। আমি যে মেয়ে সাক্ষী হচ্ছি। এখন দস্ত স-কে আনব কি করে?

অ-মন্ত্রী। সামনে এসে ন্যাকার মত কাপড় পরতে পরতে একথা বলার কি দরকার ছিল রে হারামজাদী! দূর হ।

রক্ষী ॥ (মেয়েলী ঢংএ) আহা হা সবেতেই দোষ।

অ-মন্ত্রী। এই মাগী দাঁড়া। দস্ত-সকে ফুটবলে মারার মত লাথি মারতে বল্। এখানে সট করে এসে পড়ে যেন।

রক্ষী ॥ লাথি মার সট করে,
এসে পড় ফট করে।

[ঢং করতে করতে চলে যায়।]

অ-মন্ত্রী ॥ শহরের পালা চুকিয়েছি। তোমার দণ্ড পাকা। মজুর খেপানি ধম্মঘটের পালা শেষ। এবার মেঠো কেঁচোকে বধ করি। ব্যাটা জমির ধান তুলবে চাষা। খেপিয়ে বেড়াচ্ছে কাস্তে শানাও।

[আর্তনাদ ও সেই সঙ্গে ছুটে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে দস্ত 'স'। দস্ত 'স'র হাড়গোড় ভেঙেছে মুখো

মানুষের মত। প্যারালিসিস মানুষের মত হাত কাঁপে। কথায় জড়তা। প্রথমে মাটিতে পড়ে থাকে। আমাদের রক্ষীরা ভাল খেলতে পারে তাহলে।]

৩ ॥ সে সন্দেহ আমাদের মধ্যেও নেই।

অ-মন্ত্রী ॥ খেলাটা ভাল করে শিখতে হয়েছে। বুঝলে—হেঁ—হেঁ—হেঁ।

স ॥ (কাঁপতে কাঁপতে) আমাকে একেবারে মেরে ফেল !

অ-মন্ত্রী ॥ কোন্ শালা ধান কাটল বল্? কোন্ শালা জোতদারকে দা দিয়ে কুপোল বল্? এখুনি ছেড়ে দেব।

স ॥ ধান কেটেছি আমরা—সমস্ত চাষী ভাইরা। জোতদারকে মেরেছে সাদা পোষাকের পুলিশ। গাঁ উজাড় করে মিসা প্রয়োগ করতে ওরা এ ব্যবস্থা করেছে।

অ-মন্ত্রী ॥ (লাথি মারে মাঝে মাঝে। স মাটিতে গড়াতে থাকে) তবু ব্যাটা মিথ্যে বলবে। এখুনি দোব খোঁচা। ফুস করে ব্লাডারের হাওয়া বেরিয়ে যাবে।

স ॥ তাই দাও। এভাবে যন্ত্রণা দিয়ে মিথ্যে বলাতে পারবে না।

অ-মন্ত্রী ॥ দূর শালা। আমাদের মনোমত কথা না বেরুলে তোকে দগ্ধে দগ্ধে মারবই।

৩ ॥ ছেড়ে দিন ওকে। এভাবে কোন কুকুর বেড়ালকে মানুষ মারতে পারে না।

অ-মন্ত্রী ॥ গাঁয়ের বধূ সাক্ষী দিয়ে যা। জনতার সামনে প্রমাণ হয়ে যাক ও ব্যাটা সত্যিকারের খুনী কিনা !

[প্রবেশ করে রক্ষী। শাড়ী পরে এক গলা ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়ায়।]

মাগো তোমার ঘর কোথায় ?

রক্ষী ॥ তেপান্তরের পারে, বাবলাবোনের ধারে, গোবিন্দপুর নগরে।

অ-মন্ত্রী ॥ তুমি এই শয়তানটাকে চেন ?

রক্ষী ॥ (নানা ঢং-এ স এর কাছে আসে। ঘোমটা ফাঁক করে) ওমা এ যে সেই দস্যুটাগো।

অ-মন্ত্রী ॥ কোন্ দস্যুটা একটু খেলিয়ে বল মা। দেখছ না দেশবিদেশের লোকেরা শুনছে।

রক্ষী ॥ গোবিন্দনগরে বাবলা তলায় এল। হাতে খাঁড়া মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কানে বোধহয় ছিল জবার ফুল।

অ-মন্ত্রী ॥ তারপর—তারপর।

রক্ষী ॥ আমার সোয়ামীকে বললে—এ্যাই ব্যাটা হাতে কাস্তে নে। বর্শা নে আর হাতে। ধান কাটবি। তিনভাগ মোর একভাগ তোর।

অ-মন্ত্রী ॥ আহা-হা! কি আন্দোলনই না হচ্ছে। বিপ্লবের বান ডাকছে যেন। তা তোমার সোয়ামী গেল?

রক্ষী ॥ যেতে চায়নি। দমাদম দমাদম। ফটাফট ফটাফট। আমার সোয়ামী—

অ-মন্ত্রী ॥ কি হল কাঁদছ কেন?

রক্ষী ॥ আমার সোয়ামীকে মারল। আমি মূর্চ্ছা গেলাম।

অ-মন্ত্রী ॥ তারপর?

রক্ষী ॥ জ্ঞান হতে দেখলুম, এই দস্যিটার হাতে জোতদার মশায়ের মুণ্ডু, হাতের ডগায় রক্ত। গাঁয়ের লোকেদের মাথায় ধানের আঁটি। আবার মূর্চ্ছা গেলাম।

অ-মন্ত্রী ॥ থাক্-থাক্ মা আর মূর্চ্ছা যেতে হবে না। আর কেঁদোনা মা এদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করেছি। দেখছ না কুমড়ো গড়াগড়ি দিতে লেগেছে ব্যাটা।

রক্ষী ॥ দুঃখু হচ্ছে দেখে।

অ-মন্ত্রী ॥ কিছু বললে?

ঞ। তোমার এই মিথ্যের জন্তে মনে অনুতাপ হচ্ছে না মেয়ে?

রক্ষী ॥ আপনাদের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়।

(এগিয়ে দর্শকদের কাছে) হে মা কালী, হে বাবা তারকেশ্বর,। হে মা-বাবা তেত্রিশ কোটি দেবতা। আমাকে মাফ করো বাবা-মা। মিথ্যে না সাজ্‌লে মিথ্যে না বল্‌লে চাকরী যাবে, প্রাণটা যাবে। বউ ছেলেকে মেরে ফেলবে নইলে উপোষ করিয়ে মারবে।

অ-মন্ত্রী ॥ কি বিড় বিড় করছ গো মা।

রক্ষী ॥ তেত্রিশ কোটি বাবা-মার দয়া চাইছিলাম। দোষী যেন শাস্তি পায়। আমি যাব অহিংস মন্ত্রীমশাই ?

অ-মন্ত্রী ॥ যাও মা! সারাজীবন পূণ্য করে এয়োস্ত্রী থেকে শাখা সিঁদুর নিয়ে স্বামীর কোলে মাথা রেখে বড় শ্মশানের পথ ধর সতীমা।

রক্ষী ॥ আশীর্বাদ যেন মিথ্যে না হয় মন্ত্রীমশাই। সেলাম—খুড়ী পেন্নাম—পেন্নাম।

[রক্ষী ঘোমটা ঢাকা অবস্থায় চলে যায়।]

অ-মন্ত্রী ॥ এসব যারা করে তাদের হাত পা খণ্ড খণ্ড করে—

স ॥ ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলিয়ে রাখা উচিত তাই না উনপঞ্চাশের মর্ধণ ?

অ-মন্ত্রী ॥ ওরে ব্যাটা আরো দুটো স্যুট মারব না কিরে।

স ॥ যখন উল্টো লাথি আরম্ভ হবে তখন সহ্য করতে পারবি শালা !

অ-মন্ত্রী ॥ আই বাপ। ব্যাটা কথা বলতে পারছে না। প্যাঁদানীর চোটে থর থর করে কাঁপছে তবু ব্যাটা বলছে, শালা।

ঞ ॥ মরবার ভয়ে কি পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইব মনে করিস্ ?

অ-মন্ত্রী ॥ এ ব্যাটা আপনি-আঁজ্ঞে করছিল এখন তুই-তোকারী।

স ॥ তোদের আবার মান অপমান কিরে ? ভোট বাক্স লুঠে গদিতে বসেছিস। দেশের মধ্যে অরাজকতার বন্যা বইয়ে দিয়েছিস। তোদের সমালোচনা করলে সাদা পোষাকের পুলিশ দিয়ে খুন করছিস। গুণ্ডা লেলিয়ে বলছিস এরা নিজেরা মারপিঠ করে মরেছে।

অ-মন্ত্রী ॥ ওরে বাবা এরা শতনাম বেঁধেছে

ঞ ॥ এ নাম থামবে না উনপঞ্চাশের মর্ধণ।

অ-মন্ত্রী ॥ ব্যাটা নাম ধরে ডাকা! মেরে তুব্‌ড়ে দেব—থেঁত্‌লে দেব জানিস !

[দুটো হাত জোড়া করে ঘুসি মারে। ঞ পড়ে যায়।
এই সময় নেপথ্য ঘোষণায় শোনা যায় :
"মহামহিম বংশ মুখ রক্ষা কর্তা, জগদ্বরেণ্য দয়ার্দ্র হৃদয় বিশ্বশান্তি প্রচারক রাজা উনপঞ্চাশের ঢ় আসছেন।

পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী উনপঞ্চাশের জ মশাই।"

মন্ত্রী রাজাকে পথ দেখিয়ে 'আসুন' করে নিয়ে আসে। রাজা প্রবেশ করে দুজনকে দেখে।]

রাজা ॥ এদের কি ব্যবস্থা করেছ অহিংস মন্ত্রী ?

অ-মন্ত্রী ॥ এরা বিটকেল হিংসায় বিশ্বাসী। মানুষ হত্যা, পশুপ্রাণী হত্যা, ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ, কর্ষণ সব দোষেই দুষ্ট।

মন্ত্রী ॥ বোমা, পিস্তল, বন্দুক, ষ্টেনগান, ব্রেনগান, কামান, ট্যাঙ্ক এদের কাছে পাওয়া গেছে।

অ-মন্ত্রী ॥ এদের কাছ থেকে দেড় লক্ষ সোনার বাঁট।

মন্ত্রী ॥ পাঁচ লক্ষ রুপোর বাঁট—

অ-মন্ত্রী ॥ এক কুইন্টল আফিম—

মন্ত্রী ॥ চার কুইন্টল গাঁজা—

অ-মন্ত্রী ॥ দশ লক্ষ ব্রান্ডির শুদ্ধ চোলাই—

মন্ত্রী ॥ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি—

অ-মন্ত্রী ॥ পাওয়া গেছে।

রাজা ॥ আমার রাজ্যে খাদ্য বস্তু সব এদের কাছে জমা হয়েছিল।

মন্ত্রী ॥ রাজামশাই বিচার করুন।

রাজা ॥ তোদের কি ব্যবস্থা করবো রে খুনী রকবাজ ডাকাত—চোরাকারবারী ছিনতাই এর দল।

এ ॥ আমরা মরলেও কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্তের লড়াই থামবে না।

রাজা ॥ ভুল বকছে। সেই বরফে ঢাকা দেশটার কথা বলছে।

স ॥ সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত দেশের কোটি কোটি লোক লড়াই করে যাবে।

রাজা ॥ ভুল বকছে। চণ্ডু চরস খাওয়া দেশের [illegible] এরা পাগল।

অ-মন্ত্রী ॥ রাজা ঢ়।

রাজা ॥ উনপঞ্চাশের সেলে ঢুকিয়ে দাও। পাগল কামড়ে নেয়, আঁচড়ে দেয়,

খাবার আশায় মলমূত্র ত্যাগ করে সেটাই ভক্ষণ করে। তাদের ঘরে এদের ঢুকিয়ে দাও।

মন্ত্রী ॥ লাজামশাইএর কি বুদ্ধি!

রাজা ॥ কিছুদিন বাদে রাজ্যের পণ্ডিতদের এনে দেখাবে এরা সত্যি পাগল কিনা! এরা পাগল বলে এসব করেছে কিনা প্রমাণ হয়ে যাবে।

অ-মন্ত্রী ॥ রাজা উনপঞ্চাশের ঢ় এর জয় হোক।

রাজা ॥ এরা পাগল। এরা পাগল।

[রাজা হো হো করে হাসে আর দুজনের মুখে মাঝে মাঝে আদরের ঠোক্না মারে। রাজার হাসির সঙ্গে যোগ দেয় মন্ত্রী ও অহিংস মন্ত্রী। কিছুক্ষণ হাসি চলতে থাকার পর দর্শকের পেছনে "চোর-চোর পাকড়া গয়া—চোরকো পাকড়ো" আওয়াজ শোনা যায়। প্রথমের হাবিলদার ও পরে জেলর প্রবেশ করে। নীচের স্পটে ওদের দেখান হয়। দুজন মঞ্চে ওঠে। হাবিলদারের হাতে একটি লাঠির ওপর বোর্ডে লাগান একটি পোষ্টার।]

জেলর ॥ এ পোষ্টার কে লাগিয়েছে? এই শালা রাজা বল্ এ পোষ্টার কে লাগিয়েছে?

হাবিল ॥ আবে শালা মন্ত্রী।

রাজা ॥ আমরা লাগিয়েছি।

জেলর ॥ বাস্তবধর্মী নাটক—উনপঞ্চাশের সেল—ব্যাটা সরকারের নামে খিস্তি চালাচ্ছ।

স ॥ কোথায় খিস্তি দিলাম?

জেলর ॥ ব্যাটারা জেলের বাইরে সরকারকে উৎখাত করতে চেয়েছিল। এখন জেলের ভেতরে—

এ ॥ আমাদের তো পাগলের সেলে রেখেছেন, আমরা তো পাগলামি করছি।

জেলর ॥ শালারা আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে। রাম যাত্রার ড্রেস চুরি করেছিস?

এ ॥ জেলের মধ্যে চুরি করিস শালা পাগ্‌লা কাঁহেকা।

মন্ত্রী ॥ খবরদার পাগল বলবেনা বলে দিচ্ছি।

রাজা ॥ তুই যে শালা আমাদের প্রাণটা চুরি করছিস।

জেলর ॥ তুই? শালা? হাবিলদার ডাণ্ডা।

[হাবিলদার ডাণ্ডা দেয় জেলরকে। জেলর এলোপাথাড়ি ওদের মারতে থাকে। এই সময় রাজা মন্ত্রী সবাই ছড়া বলে ও জেলরকে ঘিরতে থাকে।]

রাজা ॥ প এ পাগল
আমরা সবাই

সকলে ॥ ছাগল—ছাগল।

ঐ ॥ জেলরের ডাণ্ডা।

সকলে ॥ কেড়ে কর ঠাণ্ডা।

হাবিল ॥ এ লোক সব খেপিয়ে গেল।

[ডাণ্ডা কেড়ে নেয় জেলরের হাত থেকে।]

জেলর ॥ খবরদার! খুব খারাপ কাজ হবে। ইট দিয়ে মাথা থেঁতো করব জানবি।

[জেলর ও পুলিশ পালাতে যায়। সকলে গোল করে ধরে। জেলর ও পুলিশ মধ্যিখানে মাথায় হাত দিয়ে ডাণ্ডা বাঁচাতে চেষ্টা করে।]

স ॥ হা-রে-রে-রে-রে!

সকলে ॥ ডাণ্ডা মারার মজারে।

ঐ ॥ তেড়েমেড়ে ডাণ্ডা

সকলে ॥ করে দাও ঠাণ্ডা
গোল গোল মণ্ডা
পুলিশ খাবে ডাণ্ডা।

[ক্রমশ আস্তে থেকে জোরে, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলতে থাকে—ডাণ্ডা-ঠাণ্ডা, মণ্ডা, ডাণ্ডা। জেলর ও পুলিশের চিৎকার_ সকলের হাসি। পর্দা পড়ে।]

অভিনয়ের জন্ত অনুমতি নেবেন।
১২ ঠাকুর পাড়া রোড, নৈহাটী, ২৪ পরগনা।

উত্তর মেলে না

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

●

মা	রজত
খোকা	১ম প্রৌঢ়
বাবা	২য় প্রৌঢ়
লোকটা	বৃদ্ধ
খুকু	নন্তে

●

[একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘর। দেওয়ালের পেছন ঘেঁষে একটা তক্তাপোষ, তার ওপর প্রায় ময়লা বিছানা। তক্তাপোষের সামনে একটা ইজিচেয়ার, একটা চেয়ার ও আমকাঠের টেবিল। টেবিলে অনেক বই। এই ঘরটার পাশেই একটা ছোট ঘর। এখানেও টুকিটাকি কয়েকটা আসবাবপত্র। দুই ঘরের মাঝখানে একটা দরজা, যেটা দিয়ে দুই ঘরে যাতায়াত করা যায়। পর্দা যখন উঠল তখন আমরা দেখলাম এই বাড়ির গিন্নী বয়স প্রায় ৪২-৪৩। তিনি, এই ঘরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান একটি বেডকভার পাতছেন খাটের ওপর। এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বছর ২০-২১-এর একটি যুবক। এই বাড়ির ছেলে, নাম—খোকা।]

খোকা ॥ কি ব্যাপার! এটা আবার কবে কেনা হল?

মা ॥ কিনব কেন, পুঁটুদের বাড়ি থেকে চেয়ে এনেছি।

খোকা ॥ তা হঠাৎ পুঁটুদের বাড়ি থেকে বেডকভার চেয়ে আনতে হল কেন?

মা ॥ ও মা! খুকুকে যে আজ দেখতে আসবে।

খোকা ॥ তেত্রিশ নম্বর।

মা ॥ কি তেত্রিশ নম্বর?

খোকা ॥ তোমার মেয়ের এই নিয়ে তেত্রিশ নম্বর সিটিং হল। আর বাবাও জোগাড় করে কোথা থেকে সব লোকজন, কে জানে!

মা ॥ তা কি করবে বল? বিয়েটা ত দিতে হবে। নিয়ে আয়না একটা ভাল পাত্তরের খোঁজ।

খোকা॥ নিয়ে কি আর আসতে পারিনা। তবে তোমার মেয়ে যেমন রূপের ধুচুনী—হতো সায়রাবানুর মতন একটা মেয়ে, দেখতে, একেবারে ধর্মেন্দর একখানা জোগাড় করে এনে দিতাম।

মা॥ তা নিজের বোন যেমন, তেমন দেখেই একটা পাত্তর নিয়ে আয় না।

খোকা॥ বেকার ছেলে চলবে? বলত কালই এনে দিচ্ছি!

মা॥ বেকার ছেলে?

খোকা॥ হ্যাঁ বেকার ছেলে। আমার যে-কটা বন্ধু আছে সব কটার বিয়ে করার সখ আছে। কিন্তু কেউ মেয়ে দিচ্ছে না বলে বিয়ে করতে পারছে না। তোমরা কিন্তু মা এ ব্যাপারে একটা রেকর্ড করতে পার।

মা॥ রেকর্ড?

খোকা॥ হ্যাঁ—ধর তুমি যদি নন্তের সঙ্গে খুকুর বিয়ে দাও।

মা॥ নন্তে। ওই বিশ্ববকাটে ছোঁড়াটা—

খোকা॥ আহা হা বিশ্ববকাটে হলে কি হবে! আসল কোয়ালিফিকেশনটা তো রয়ে গেছে—বেকার।

মা॥ দূর মুখপোড়া!

খোকা॥ অবশ্য, তোমার মেয়ের বিয়ের প্রব্লেম সল্ভ্ করার আরও একটা উপায় আছে, যদি তুমি সাহস করে করতে পার।

মা॥ কি?

খোকা॥ গোটা দু-তিন জম্পেশ শালা আছে এমনি একটা বাড়ি দেখে আমার একটা বিয়ে দিয়ে দাও।

মা॥ আ মর মুখপোড়া—এক পয়সা রোজগার করবার মুরোদ নেই আবার বিয়ে করার সখ হয়েছে।

খোকা॥ আহা, আমার সখটা দেখলে কোথায়—তোমার গুণবতী মেয়েকে স্রেফ্ পার করার জন্যেই তো আমার এই দধীচি-Like আত্মত্যাগ!

[এমন সময় বাইরে এই বাড়ির কর্তার গলা শোনা যায়।—ব্যাস্ ব্যাস্ ব্যাস্—এই কোঠী, ইহা রাখো। একটু পরে প্রবেশ করেন বাবা। বয়স ৫২-৫৩। সঙ্গে একজন মজুরের মাথায় ও হাতে তিনটি বেতের চেয়ার ও একটা টেবিল।]

বাবা॥ হিঁয়া রাখো—ব্যাস্ ব্যাস্ ইধর ইধর। লোকটি চেয়ার টেবিলগুলো নামিয়ে রাখে। ভদ্রলোক পকেট থেকে পয়সা বার করে ওকে দেন)

লোকটি॥ আঠ্ আনা! আঠ্ আনা কেয়া দেতে হ্যায় বাবু?

বাবা॥ তবে কেত্‌না দিতে হবে? পাঁচ টাকা? যত্তোসব!

লোকটি॥ কম্‌সে কম্ এক রূপেয়াত দেনেই পড়েগা।

বাবা॥ এক রূপিয়া! টাকা কি গাছ্‌মে জাম্‌কা মাফিক ফল্‌তা হ্যায়? নাড়া মারনেসেই গিরেগা?

লোকটি॥ লেকিন অব্ সোচিয়ে! ওই ইষ্টিশনসে লে আতে হ্যায়—

বাবা॥ আরে বাবা ইষ্টিশন কি বিলাত মে হ্যায়—ইষ্টিশনত যাদবপুরমেই হ্যায়।

খোকা॥ দাঁড়াও দাঁড়াও ব্যাপারটায় আমাকে একটু মধ্যস্থতা করতে দাও।

বাবা॥ তুই আবার এর মধ্যে কি মধ্যস্থতা করবি?

খোকা॥ না ব্যাপারটা হচ্ছে, ও এই তিনটে চেয়ার আর একটা টেবিল ষ্টেশান থেকে মাথায় করে এনেছে। তাই'ত?

লোকটি॥ হঁ বাবু।

খোকা॥ তুমি ওকে দেড় টাকা দিয়ে দাও।

বাবা॥ কি দেড় টাকা!

খোকা॥ হ্যাঁ। কারণ, হিসেব অনুযায়ী প্রত্যেকটা মালের ভাড়া হওয়া উচিত আট আনা, চারটে মাল—দু' টাকা আসল ভাড়া—তবে তোমার থাক ওর থাক্ করে দেড় টাকায় রফা করা যেতে পারে। আমার কাছে ন্যায্য বিচার।

বাবা॥ (লোকটিকে পয়সা দিতে দিতে) এ্যাঃ ন্যায্য বিচার! ব্যাটাচ্ছেলে হাইকোর্টের উকিল এসেছেন। (লোকটা চলে যায়)

খোকা॥ ওই, আবার ভুল হয়ে গেল—হাইকোর্টের উকিল হয়না। ব্যারিষ্টার!

মা॥ চুপ কর বাঁদর। বুড়ো বাপ সারাদিন খেটেখুটে ওই বড় বড় ভুষো ঘাড়ে করে নিয়ে বাড়ি ফিরলো, কোথায় একটু ইয়ে করবে তা না চ্যাটাঙ্ চ্যাটাঙ্ কথা।

খোকা॥ আবার গণ্ডগোল করলে। প্রথমত সারাদিন খাটাখাটির আজ কোন প্রশ্নই উঠছে না কারণ আজ শনিবার—হাফ্ ডে। দ্বিতীয়ত বাবা নিজে ওই জিনিষগুলো ঘাড়ে করে আনেনি, এনেছে ওই লোকটা আর তৃতীয়ত—বাড়িতে এই অবাঞ্ছিত জিনিষের কোন প্রয়োজন ছিল না।

বাবা॥ অবাঞ্ছিত জিনিষ—একটা বাইরের লোক আসলে বসবার একটা জায়গা দিতে পারি না—শেয়ালদা থেকে সস্তায় কিনে নিয়ে এলুম, ওটা হল অবাঞ্ছিত জিনিষ!

খোকা॥ এখানেও আবার দুটো গণ্ডগোল হয়ে গেল। থাক তো যাদবপুরে তোমার বাড়িতে কোন লোক আসবে ভাবো?

মা॥ কেন, লোক আসবে না?

খোকা॥ এক নম্বর কারণ এটা বর্ষাকাল।

মা॥ বর্ষাকালত কি?

খোকা॥ তাহলে তোমাদের একটা গল্প বলতে হয়—তিন নম্বর প্লটের রমেশবাবু গড়িয়াহাটার বাটার দোকানে গত সপ্তাহে জুতো কিনতে গিয়েছিলেন। উনি ত দোকানে ঢুকে চেয়ারে বসেই বল্লেন, একটা জুতা আন ত। সেলসম্যান ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল—কোথায় থাকেন? রমেশবাবু বল্লেন—যাদবপুরে। ছেলেটি খানিক পরে একটা ফিতে নিয়ে এসে রমেশবাবুকে বললেন—হাতটা ওপরে তুলুন। রমেশবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন—হাত তুলুম্ ক্যান্ মশায়, জুতা কিনুম্ ত! ছেলেটা বললে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, শুনেছি—তা মাপটা নিতে হবে না? রমেশ-বাবু বললেন, জুতা কিনুম্ ত হাত তুইল্যা, কিয়ের মাপ দিমু? ছেলেটা বললে—বগলের! রমেশবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, বগলের মাপ! ছেলেটা বললে হ্যাঁ, আপনি থাকেন ত যাদবপুরে—তা ওখানে ত জল আর কাদার জন্তে কোন লোক জুতো পায়ে পরে হাঁটে না—সব বগলে নিয়ে হাঁটে। তাই এখন থেকে আমরা যাদবপুরের লোককে বগলের মাপে জুতো দিই। (বাবা এবং মা দুজনেই হেসে ফেলেন)

মা॥ হতচ্ছাড়া ছেলে।

খোকা ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও এত গেল যাদবপুরে লোক না আসার এক নম্বর কারণ। এরপর দুনম্বর কারণটা শোন। এটা ১৯৭৪ সাল তো? শৈলেন মহান্তি এখন যাদবপুর থানার ও. সি.? বেটার প্রতিদিন একটা করে তাজা ছেলের রক্ত হাতে না মাখলে নাকি ঘুম হয় না। মত্ত অবস্থায় হঠাৎ যদি কোন বৃদ্ধকে দেখেই মোহান্তির মনে হয়—এ ব্যাটা তাজা—তবে-?

বাবা ॥ এই চুপ—ওসব কথা একদম বলতে বারণ করেছি না!

খোকা ॥ ও সরি! কথাটা একটু সিরিয়াস ধরনের হয়ে গেল—উইথড্র করে নিচ্ছি। হ্যাঁ—আগে যা বলছিলাম—অবাঞ্ছিত জিনিষ, অবাঞ্ছিত জিনিষ বলতে আমি কি বুঝিয়েছি বলত মা?

বাবা ॥ ওই চেয়ার টেবিলগুলো আবার কি।

খোকা ॥ না-না—ব্যাকরণে ভুল হল—ওটার সম্বন্ধে বললে বলতুম—অপ্রয়োজনীয়—কিন্তু আমি বলেছি অবাঞ্ছিত। বল কি অবাঞ্ছিত?

মা ॥ থাম্ বাপু! তোর কথা আমরা বুঝতে পারি না।

খোকা ॥ তুমি পারলে নাতো মা? বাবা একবার চেষ্টা করবে নাকি?

বাবা ॥ আমাকে কি এখন তোমার কাছে পরীক্ষায় বসতে হবে নাকি?

খোকা ॥ না-না—ওরকম ভাবে ভাবছ কেন? সোজা একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছি—উত্তরটা দিতে পারবে কিনা বল?

বাবা ॥ পারব না।

খোকা ॥ আমি জানতাম পারবে না। উত্তর হল ছারপোকা।

মা ॥ ছারপোকা!

খোকা ॥ হ্যাঁগো—ছারপোকা—ইংরেজীতে বলে বাগ, রাষ্ট্রভাষায় বলে খট্‌মল্। শেয়ালদায় রথের মেলায় এতোদিন পড়েছিল ওগুলো—তিন জেনারেশন ওর মধ্যে সংসার পেতে বসে আছে।

মা ॥ হতচ্ছাড়া তোর অন্য কাজ থাকে ত যা, আজে বাজে সময় নষ্ট করিস না। (বাবাকে) তা হ্যাঁগো ওরা কটার সময় আসবে বলেছে?

বাবা ॥ সাড়ে তিনটে চারটে নাগাদ আসতে বলেছি। সন্ধ্যের আগেই ভালয় ভালয় যাতে ফিরে যেতে পারেন।

মা॥ তিনটে সাড়ে তিনটে? ওমা—তা হলে ত আর সময় নেই। খুকু-
টাও ত এখনো ফিরল না—

বাবা॥ খুকু গেছে কোথায়?

মা॥ কলেজে।

বাবা॥ আজ কলেজে না গেলেই হ'ত। বাড়িতে শুয়ে-বসে একটু রেষ্ট
নিলেও ত পারত? (খাটের ওপর বসেন)

খোকা॥ হ্যাঁ চেহারাটা একটু ভাল দেখাত। তবে ওর জন্মে তুমি ভেব না
বাবা। তোমার খুকু sitting দিতে দিতে expert হয়ে গেছে।

বাবা॥ (ম্লান হাসি হেসে) তুই যেন আবার কোথাও এখন চলে যাস্‌নি।
ওরা এলে একটু মিষ্টি-টিষ্টি আনতে টানতে হবে।

খোকা॥ Unnecessary investment গুলো যে কেন কর বুঝতে পারি
না। তার চেয়ে এক কাজ করলেই হয়। এখন মিষ্টি ফিষ্টি খাওয়াবার
কোন দরকার নেই। একটা Due Slip লিখে হাতে ধরিয়ে দেবে। যদি
পছন্দ হয়ে যায়, বিয়েটা যদি হয় তবে বিয়ের দিন যে খাওয়ান হবে তার
সংগে Due Slipটা দেখালে ছুটো করে extra মিষ্টি দিয়ে দেওয়া হবে।

বাবা॥ এই idiot তুই চুপ করবি?

খোকা॥ আচ্ছা বেশ চুপ করলাম। না চুপ কেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে
যাচ্ছি। তুমি একটু ওঠো।

বাবা॥ কেন, উঠ্‌বো কেন?

খোকা॥ বললাম না বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।

বাবা॥ তার সঙ্গে আমার ওঠার কি সম্পর্ক?

খোকা॥ আরে দেখই না। (বাবা উঠে দাঁড়ান, খোকা খাটে পাতা
বিছানাটা উল্টে ফেলে এবং তার তলা থেকে টেনে বার করে একটা
প্যাণ্ট)

বাবা॥ ওটা ওখানে কেন?

খোকা॥ ইস্তিরি হচ্ছিল্‌।

মা॥ বাঁদর! (খোকা প্যাণ্টটা নিয়ে ভেতরে চলে যায়।) হ্যাঁগো—
এবার যারা আসছে তারা কোথাকার লোক?

বাবা॥ আগে বোধহয় বাড়ি ছিল বিক্রমপুর এখন অশোকনগরে বাড়ি করেছে।

মা॥ পছন্দ হবে ত?

বাবা॥ তা আমি কি করে বলব। সবই ভগবানের ইচ্ছে! (বাবা ভেতরে চলে যান। বাইরে থেকে প্রবেশ করে খুকু)

মা॥ কি আক্কেল রে তোর খুকু? জানিস আজ তোকে দেখতে আসবে আর এত বেলা করে বাড়ি ফিরলি?

খুকু॥ আচ্ছা মা, তোমাদের এই পাগলামী আর কতদিন চালাবে বলত?

মা॥ পাগলামী মানে?

খুকু॥ পাগলামী নয়? প্রতি মাসে তোমাদের বাড়িতে পাঁচ জন করে লোক আসবে। তোমরা তাদের প্লেট ভরে মিষ্টি ঘুষ দেবে। তারপর আমাকে গিয়ে বসতে হবে সঙের মতন তাদের সামনে। সেই এক ব্যাপার বার বার ভাল লাগে? (ইতিমধ্যে প্যান্ট পাল্টে খোকা প্রবেশ করেছে)

খোকা॥ কোন ভয় নেই Sister, তুমিও একটুকরো সুখী গৃহকোণের সন্ধানে সমানে ইণ্টারভিউ দিয়ে যাও আমিও একটা নিজস্ব ছারপোকা কণ্টকিত চেয়ার আর টেবিলের এক চিলতে কোণের জন্যে সমানে ইণ্টারভিউ দিয়ে যাই—যারটা লাগে। অবশ্য আমারটা লাগলে বাবা মার আনন্দ, তোমারটা লাগলে মাথায় হাত!

মা॥ কেন মাথায় হাত কেন? তুই কি ভেবেছিস আমাদের ব্যবস্থা করা নেই?

খোকা॥ না—তা থাকবে না কেন? ব্যবস্থা মানে ত Provident fund-এর loan. আর তোমার মেয়ে যতই কেন না এখন—কেন মা তোমরা এইসব ব্যবস্থা করছ—বলে চেঁচামেচি করুক বিয়েটা ঠিক হয়ে গেলেই দেখবে, প্যাঁচ কষে কষে যতটা পারবে আদায় করে নিয়ে যাবে শ্বশুর বাড়ি।

খুকু॥ ভাখ্ দাদা—আমি মোটেই তোর মতন ছোটলোক নই, বুঝলি? বাবা মার কষ্টটা আমি বুঝি।

খোকা॥ বা-বা-ভা যদি বুঝতিস্ তাহলে নির্ঘাৎ এতদিনে পাড়ায় পঞ্চা মঞ্চা

কাউকে একটা ম্যানেজ করে নিয়ে বাবা মার কাছে এসে পেন্নাম করে বলতিস চললুম, তোমরা আমায় আশীর্বাদ কর যেন সুখী হই।

মা ॥ হতচ্ছাড়া ছেলে ওরকম করলে বংশের মুখে চুনকালি পড়ত না?

খোকা ॥ তা হয়তো পড়ত কিন্তু তাতে দুটো লাভ হত। এক নম্বর বাবার কিছু টাকা বেঁচে যেত। আর দুনম্বর বিনে পয়সায় খানিক চুন আর কালি পেতে। চুনটা তুমি পানে লাগাতে, আর কালিটা বাবার জুতোয়।

খুকু ॥ অসভ্য।

খোকা ॥ এই কথাটাই যদি একটু কায়দা করে পাড়ার কোন ছেলেকে বলতে পারতিস ত এতদিনে তোর একটা হিল্লে হয়ে যেত রে নেড়ি।

খুকু ॥ আবার তুই আমায় নেড়ি বলছিস্? (মারতে যায়। খোকা সরে যায় এবং একটু দূরে গিয়ে বলে)

খোকা ॥ আরে বাবা আমি কি আর যারা দেখতে আসে তাদের সামনে বলছি যে মহাশয়গণ, আপনাদের রূপসী ভাবী পুত্রবধূর নাম নেড়ি? তাদের সামনে ত তোকে অনিন্দিতা I mean, অতিনিন্দিতা বলে ডাকব। (খুকু আবার মারতে যায়)

মা ॥ তোমায় কিছু বলে ডাকতে হবে না বাবা—তুমি একটু চুপ করে থেক।

খোকা ॥ ঠিক আছে বাবা আমি এই বেরিয়ে যাচ্ছি।

মা ॥ বেরিয়ে যাবি মানে? বাড়িতে অতিথ্ আসবে—খাবার টাবার আনতে হবে না তাদের জন্যে?

খোকা ॥ আচ্ছা বেশ পয়সা দিয়ে দাও—আমি ঠিক সময়ে খাবার এনে হাজির করব।

খুকু ॥ হ্যাঁ, তারপর তুমি কোথাও আড্ডায় জমে যাও ব্যস্—

খোকা আরে নারে বাবা না—তোর May be শ্বশুর বাড়ির লোকেরা খেতে পাবে, তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? দাও মা পয়সা দাও।

মা ॥ দাঁড়া পয়সা আনি। (মা ভেতরে চলে যান)

খোকা ॥ হ্যাঁরে খুকু, রাস্তাঘাটের অবস্থা কি রকম দেখলি?

খুকু॥ এমনি সব ঠিকই আছে। তিনমাথার মোড়ে দেখলাম সি.পি.এম.-এর ছেলেরা সব বসে আছে।

খোকা॥ কে-কে আছে ওর মধ্যে?

খুকু॥ ঐত তোর বন্ধু-বান্ধব সব।

খোকা॥ এ্যাই অমন কথাও মুখে আনবি না—ওরা কেউ আমার বন্ধু-বান্ধব নয়।

খুকু॥ সে কিরে বন্ধু-বান্ধব নয়! ঐ খোকাদা গণেশদা তোর বন্ধু-বান্ধব নয়?

খোকা॥ আগে গলায় গলায় ভাব ছিল। যেদিন থেকে পার্টির খাতায় নাম লিখিয়েছে সেই দিন থেকেই আমি অফ্।

খুকু॥ আচ্ছা, তুই এমন স্বার্থপর কেনরে দাদা? ওরা তোর একদিন সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল—যেই ওরা পার্টি করতে আরম্ভ করেছে অমনি ওরা তোর শত্রু হয়ে গেল?

খোকা॥ শত্রু কেন হবে? ওরা আমার শত্রু একথা ত আমি একবারও বলিনি। আমি বাপু Non-political Man. কি দরকার বাবা ঝামেলায়। তারপর আমার একটা কিছু হয়ে যাক্, তখন আমার বুড়ো বাপ মা অকুল পাথারে ভাসবে—

খুকু॥ ওরা এতগুলো ছেলে. ওদের কারোর কিছু হবার ভয় নেই, যত ভয় তোর?

খোকা॥ হবে যেদিন বুঝবে। মোহান্তিকে চেনে না তো—সেদিন তিন-মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে বলে গেছে—আই অ্যাম এ ব্যাস্টার্ড অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু কিল্ অল্ দি সি. পি. এম. বাস্টার্ডস্।

খুকু॥ হ্যাঁ, মারাটা অত সোজা কিনা!

খোকা॥ হাঁরে নেড়ি একটা কথার জবাব দেত? তুই কি ঐ সি. পি. এম.-এর কোন ক্যাডারের সঙ্গে প্রেম-টেম করছিস নাকি?

খুকু॥ কেন?

খোকা॥ না মানে যে রেটে ওদের সমর্থন করছিস তাইতে আমার সন্দেহ হচ্ছে। (মা ভেতর থেকে টাকা ও একটা র‍্যাশনের ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করেন।)

মা ॥ শোন খোকা, ওরা বোধহয় তিনজন কি চারজন আসবে। তুই এক কাজ কর, পাঁচটা ডিম নিবি আর দশটা রাজভোগ নিবি, দশটা বড় দেখে সন্দেশ নিবি আর নোনতা কিছু খাবার।

খোকা ॥ ইস্ এইগুলো তোমরা যদি আগে থেকে ঠিক করতে তাহলে অন্তত নোন্‌তা খাবারের দামটা বেঁচে যেত।

খুকু ॥ কেন, তোর হবু শ্বশুরের কি নোন্‌তা খাবারের দোকান আছে নাকি?

খোকা ॥ না, তা কেন, নোনতার কথাটা যদি কালকে বলতে তবে বসে যেতে পারতাম।

মা ॥ কি বসে যেতিস? কোথায় বসে যেতিস? তোর কথার আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না।

খুকু ॥ বুঝবে কি করে? ওর কথার মাথামুণ্ডু থাকলে ত বুঝবে!

খোকা ॥ ভ্যাট্, যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলিস না। বুঝলে মা, ভবানী-পুরে একটা মিষ্টির দোকান আছে—ওরা রাত দশটার পর যা নোন্‌তা খাবার থাকে সব ভিখিরীদের বিলিয়ে দ্যায়। কাল রাতে আমি ওখানে বসে গেলে আজকের নোন্‌তার খরচাটা বেঁচে যেত।

খুকু ॥ ওঃ খরচের কথা ভেবে বাবুর ঘুম হচ্ছে না!

খোকা ॥ তবু দ্যাখ, মা আমার বিয়ে দিচ্ছে না। (খুকু হাসে)

মা। (হেসে) হ্যাঁরে মুখপোড়া, তোর কি লজ্জাও করে না?

খোকা ॥ সত্যি কথা বলব এতে আর লজ্জার কি আছে! যাক্‌গে আমি চলি।

মা ॥ এই বাঁদর, শোন, তাড়াতাড়ি আসিস ওরা এখুনি হয়ত এসে পড়বে।

খোকা ॥ কটার সময় টাইম দিয়েছে?

মা ॥ এইত তিনটে সাড়ে তিনটে—

খোকা ॥ ঠিক আছে—ঠিক তিনটে বত্রিশ মিনিটে তোমার খাবার হাজির হয়ে যাবে। (খুকুকে) best of luck লেড়ি—

খুকু ॥ অসভ্য! (খোকা হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।)

মা ॥ খুকু যা মা, এবার গা ধুয়ে নে। ওদের আসবার সময় হয়ে গেল।

খুকু ॥ যাচ্ছি—হ্যাঁ মা এই চেয়ার টেবিল কোথা থেকে এল?

মা ॥ ওগুলো তোর বাবা শিয়ালদা থেকে কিনে এনেছে।

খুকু ॥ শিয়ালদা থেকে বাবা এগুলো ঘাড়ে করে নিয়ে এল ?

মা ॥ না, ঘাড়ে করে আনবে কেন ? কুলি নিয়ে এসেছে। (এমন সময় বাইরে থেকে একটা ছেলে, রজত, প্রবেশ করে। উস্কোখুস্কো চুল একটা ময়লা প্যাণ্ট আর পাঞ্জাবী পরা)

রজত ॥ মাসীমা, কেমন আছেন ?

মা ॥ এই চলছে—তা তোমার খবর কি ?

রজত ॥ আর খবর। দেখছেন ত অবস্থা। বাড়ির ধারে কাছে ঘেঁষতে পারছি না। খোকা কোথায় ?

মা ॥ ও একটু বেরিয়েছে। এই খুকু, নে তুই যা, দেরি করিস নি।

খুকু ॥ যাচ্ছি—তুমি যাও না ! (মা ব্যাজার মুখে বেরিয়ে যান)

রজত ॥ কি ব্যাপার, তোমরা কোথাও যাচ্ছ নাকি খুকু ?

খুকু ॥ না-না—এমনি বাড়িতে কজন লোক আসবে তাই।

রজত ॥ লোক ? কি ব্যাপার ?

খুকু ॥ কিছু নয় এমনি। তা তোমার খবর কি ?

রজত ॥ খবর ভালই। মার শরীরটা খুব খারাপ। খবর পেয়ে অনেকদিন পরে সাহস করে বাড়ীতে এসেছিলুম—কিন্তু যাওয়া হল না।

খুকু ॥ কেন ?

রজত ॥ পাড়ার মুখটাতে ঢুকতে গিয়েই দেখি পুরো গ্যাং বসে আছে। একবার সামনে পড়ে গেলে আর রক্ষে আছে ! তাই টুক্ করে তোমাদের বাড়ী ঢুকে পড়লাম। তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে খুকু।

খুকু ॥ কি কাজ ?

রজত ॥ একবার আমার বাড়ী গিয়ে মার খবরটা জেনে আসতে হবে।

খুকু ॥ কিন্তু এখন ত আমি যেতে পারব না রজতদা। বিকেলে যেতে পারি।

রজত ॥ বিকেলে ! তাহলে আমি খবরটা পাব কি করে ?

খুকু ॥ কেন তুমি রাতের দিকে একবার এস না হয়।

রজত ॥ রাতের দিকে ? রাতের দিকে আবার আসাটা খুব রিস্কি হয়ে

যাবে। মোহান্তি একেবারে আমাদের ক'জনের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুকুরের মতন।

খুকু ॥ আমি তোমাদের ব্যাপারটা বুঝতে পারি না রজতদা। এত বিপদ জেনেও কেন যে তোমরা এইসব করছ।

রজত ॥ অন্যায় কিছু করছি কি?

খুকু ॥ না, তা বলিনি। তবে বলছিলাম এখন কিছুদিন না হয় চুপচাপ থাক।

রজত ॥ চুপচাপ থাকলেও ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে ভেবেছ? এক উপায়, জামা পাল্টানো...তাতো আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যাক্‌গে ওসব কথা ছেড়ে দাও। খোকার খবর কি বল—কি করছে আজকাল?

খুকু ॥ application. রোজ চারটে করে application করছে আর সারাদিন একবার মার পেছনে আর একবার আমার পেছনে লাগছে। এইত এ্যাতক্ষণ এখানে বদমাইসী করছিল। খাবার আনতে গেছে।

রজত ॥ খাবার! মানে?

খুকু ॥ মানে আমাদের বাড়ীতে লোকজন আসবে বললাম না, তাদের জন্যে খাবার আনতে গেছে।

রজত ॥ আচ্ছা, তখন থেকে লোকজন আসবে লোকজন আসবে শুনছি—কারা আসছে বল দেখি?

খুকু ॥ নিতান্তই শুনবে? তবে দাদার ভাষায় বলি—আমার May be শ্বশুরবাড়ীর লোকজনরা আজ আমাকে দেখতে আসবে।

রজত ॥ Very good—তাহলে একটা খাওয়া পাওনা হচ্ছে বল?

খুকু ॥ না—

রজত ॥ না মানে খাওয়াবে না?

খুকু ॥ না।

রজত ॥ কেন?

খুকু ॥ দুটো কারণে—প্রথমতঃ তোমার এখন কোন ঠিকানা নেই অতএব নেমন্তন্ন করা যাবে না—আর দ্বিতীয়তঃ তোমাকে নেমন্তন্ন করে বিয়ে বাড়ীতে সি. আর. পি-র হাঙ্গামা বাবা পোয়াতে পারবে না।

রজত ।। তুমি আমায় নেমন্তন্ন কর আর নাই কর দেখবে বিয়ের দিন তোমার নন্দাই সেজে বরযাত্রীদের সঙ্গে খেয়ে যাব (হেসে ওঠে) ।

খুকু ॥ তুমি হাসছ ? হাসতে তোমার লজ্জা করছে না ?

রজত ॥ ভুল বুঝোনা খুকু—এ হাসি অক্ষমতার হাসি । (মা ভেতর থেকে ডাক দেন—খুকু আর গল্প করিস না—তাড়াতাড়ি নে) ।

রজত ॥ আমি চলি । তুমি একবার চট্ করে উঁকি মেরে দেখে এস ত । (খুকু বাইরের থেকে একবার ঘুরে আসে)

খুকু ॥ কেউ কোথাও নেই, রাস্তা একদম ফাঁকা ।

রজত ॥ চলি তাহলে । (প্রস্থানোদ্যত)

খুকু ॥ দাঁড়াও ! (রজত দাঁড়ায়) এই রকম করে কতদিন চলবে বলতে পার ?

রজত ॥ উপায় নেই—যতদিন না দিন বদল হচ্ছে । চলি ।

খুকু ॥ সাবধানে যেও । (রজত বেরিয়ে যায় । খুকু ওর যাওয়ার পথের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থাকে । মা প্রবেশ করেন)

মা ॥ হ্যাঁরে, কখন থেকে বলছি গাটা ধুয়ে নে, কথা কানে নিচ্ছিস না ; তারপর ওরা এসে পড়লে মুশ্‌কিলে পড়ে যাবি । রজত কি বলছিল ?

খুকু ॥ কি আবার বলবে, এমনি অনেকদিন বাদে পাড়ায় ঢুকেছে—তাই এসেছিল দাদার খোঁজ নিতে ।

মা ॥ থাক্, আর দাদার খোঁজ নিয়ে কাজ নেই । যত্তসব বকাটে বাউণ্ডুলে ছোকরা !

খুকু ॥ কেন মা তুমি অমন কথা বলছ—না জেনে শুনে । রজতদার মতন ছেলে এ পাড়ায় কটা আছে ?

মা ॥ হ্যাঁ, খুব ভাল ছেলে । চোরের মতন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে । বাড়ীতে ঢুকতে পাচ্ছে না ।

খুকু ॥ মা !! ওসব কথা থাক মা ! অন্যের কথা নিয়ে শুধুমুধু আমরা মাথা ঘামাই কেন ?

মা ॥ মাথা কি আর সাধে ঘামাই বাপু । মাঝে মধ্যে হুট্‌হাট্ বাড়ীতে এসে ওঠে যে—ভয় করে না, আমার ঘরে জোয়ান ছেলে রয়েছে । ওর ওপর

থেকে পুলিশের নজর আমার খোকার ওপর পড়তে পারে যে কোন সময়ে।

খুকু ॥ আচ্ছা মা, এই কিছুদিন আগে যখন রজতদা পাড়ার ছেলেদের নিয়ে এখানকার লোকদের বিপদে আপদে বুক পেতে দাঁড়াত তখন তুমিই কত প্রশংসা করতে। দাদাকে যখন বকতে তখন রজতদার উপমা দিতে। আর আজ রজতদা তোমার কাছে খারাপ হয়ে গেল !

মা ॥ থাক্, তোকে আর যুক্তিতর্ক ঘাঁটতে হবে না। যা তৈরী হয়ে নিগে যা। (খুকু, বাড়ীর ভেতরে চলে যায়। মা ঘরটা একটু গোছ-গাছ করতে থাকেন। বাবা প্রবেশ করেন। তিনি ইতিমধ্যে অফিসের জামাকাপড় বদল করে ধুতি পরেছেন, গায়ে গেঞ্জী)

বাবা ॥ কই গো, সময় হয়ে এল। নাও নাও—

মা ॥ নেব আবার কি ? ওরা আসুক। তবে ত।

বাবা ॥ আসুক মানে ? আসার সময় হয়ে গেছে। এই এল বলে। তুমি এই কাপড়টা ছেড়ে একটা পরিষ্কার কাপড় পরে নাও।

মা ॥ ওমা, আমার আবার পরিষ্কার কাপড় পরার কি দরকার পড়ল ? আমি কি ওদের সামনে বেরোব নাকি ?

বাবা ॥ বেরোবে না ! যদি ও বাড়ীর মেয়েরা কেউ আসে তখন ? তখন ত আসতে হবে ; তার চেয়ে আগে ভাগে তৈরী থাকা ভাল নয় ?

মা ॥ আচ্ছা যাচ্ছি, আগে তোমার মেয়ের হোক। (এমন সময় বাইরে কড়া নড়ে ওঠে)

বাবা ॥ ঐ এসে গেছে—যাও-যাও—তাড়াতাড়ি ভেতরে যাও। (মা দ্রুত ভেতরে চলে যান। বাবা বাইরে যান এবং একটু বাদেই তিনজন ভদ্রলোককে নিয়ে প্রবেশ করেন। একজন বৃদ্ধ ও দুজন প্রৌঢ়)

বাবা ॥ আসুন—আসুন। বসুন—বসুন। (ওঁরা তিনজন তিনটে চেয়ারে বসেন)

১ম প্রৌঢ় ॥ পরিচয়ের পাটটা হয়ে যাক্ নগেনবাবু। ইনি হচ্ছেন পাত্রের কাকা (প্রৌঢ়কে দেখান) আর ইনি হচ্ছেন পাত্রের দাদু, মানে বাবার কাকা (বৃদ্ধকে দেখান) আর ইনি হচ্ছেন নগেনবাবু মানে কন্যার পিতা

বৃদ্ধ॥ মেয়ের বয়স কত হল ?

বাবা॥ আজ্ঞে তা প্রায় কুড়ি বছর।

বৃদ্ধ॥ তিরিশ ? তা একটু বেশী হয়ে গেল যে—

বাবা॥ আজ্ঞে তিরিশ বছর নয়, কুড়ি বছর।

২য় প্রৌঢ়॥ একটু জোরে কথা বলবেন—কাকা কানে একটু কম শোনেন।

বাবা॥ আচ্ছা, আচ্ছা—(বৃদ্ধের প্রতি বেশ জোরে) আজ্ঞে মেয়ের বয়স কুড়ি বছর।

বৃদ্ধ॥ ওঃ, কুড়ি বছর—তা বেশ তা বেশ। লেখাপড়া ?

বাবা॥ আজ্ঞে বি. এ. ফার্স্ট পার্ট পাশ করেছে, এইবার পার্ট টু দেবে।

বৃদ্ধ॥ খুব ভাল, খুব ভাল, ম্যাট্রিক পাশই মেয়েছেলের পক্ষে যথেষ্ট। আমার পরিবার ক্লাস টু পর্যন্ত পড়েছে। পাকা গৃহিণী! তা ধরুন আমার সাতটি সন্তানকে মানুষ করেছে। তা আপনি কি করেন ?

বাবা॥ আজ্ঞে—আমি একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরী করি।

বৃদ্ধ॥ গবরমেণ্ট সার্ভিস, খুব ভাল খুব ভাল—উপরি আছে।

২য় প্রৌঢ়॥ না কাকা উনি গবরমেণ্ট সার্ভিস করেন না। একটা প্রাইভেট কনসার্ণে কাজ করেন।

বৃদ্ধ॥ ও প্রাইভেট কনসার্ণ—মাইনে ভাল। বোনাসও ভাল। উপরির কি দরকার ?

বাবা॥ আজ্ঞে না—বোনাস আগে ভালই পেতাম—এখন ওই নতুন অর্ডিনান্স হয়ে বোনাস বন্ধ হয়ে গেছে।

১ম প্রৌঢ়॥ তা বুঝলেন কিনা নগেনবাবু আগের সেই সব দিন নেই। আমার বড়মামার নাম ছিল হরিদাস—তা একবার বড়মামারা চার বন্ধু মিলে দুর্গাপুজো করলেন। পাড়ার ছেলেরা ছড়া বাঁধলে—ছমাস বোনাস পেয়ে এবার, মায়ের পুজো করবে হরি। আর তখন জিনিসপত্রও ছিল সস্তা—বুঝলেন কিনা।

২য় প্রৌঢ়॥ তা এবার মেয়েটিকে একবার ডাকুন—

বাবা॥ আজ্ঞে, এই যে ডাকি। (বাবা ভেতরে চলে যান)

২য় প্রৌঢ়॥ (বৃদ্ধকে কাকা আপনি বেশি প্রশ্ন করবেন না—

বৃদ্ধ ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমরা চুপচাপ বস না, যা জিজ্ঞেস করবার আমিই জিজ্ঞেস করছি।

২য় প্রৌঢ় ॥ না-না, আমি বলছিলাম যে আপনি বেশী কথা বলবেন না, আপনার শরীর খারাপ ত।

বৃদ্ধ ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। (এমন সময় বাবার খুকুকে নিয়ে প্রবেশ। ১ম প্রৌঢ় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মাকে দেখা যায় ছোট ঘরে এসে দরজার পাশে দাঁড়াতে।)

১ম প্রৌঢ় ॥ বস মা বস, তুমি ঐ চেয়ারটায় বস। (খুকু চেয়ারে বসে। ১ম প্রৌঢ় গিয়ে খাটের ওপর বসেন।)

বৃদ্ধ ॥ তোমার নাম কি দিদিভাই ?

খুকু ॥ অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়।

বৃদ্ধ ॥ অনিমা ! তা বেশ তা বেশ—বুঝলে হে, আমার ছোট শালার ছোট ভগ্নীপতির বড় মেয়ের নামও অনিমা—

২য় প্রৌঢ় ॥ অনিমা নয় কাকা অনিন্দিতা।

বৃদ্ধ ॥ অ, তা রান্নাটান্না শিখেছ ত দিদিভাই ?

খুকু ॥ অল্প সল্প পারি।

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ, গল্প ত করবই, আমার বুঝলে কিনা গল্প করার জন্তে একটি সঙ্গীর খুব দরকার—তোমার দিদিভাই যখন বেশ ডাগর-ডোগরটি ছিল তখন আমরা ছুটিতে চিলেকোঠায় বসে খুব গল্প করতুম—তুমিও করবেখন ...হেঁ-হেঁ-হেঁ (বাবা ব্যস্ত হয়ে ছোট ঘরটায় আসেন, সেখানে মা দাঁড়িয়ে। এইবার বড় ঘরের কথা আস্তে হয়ে যায়। ছোটঘরে বাবা এবং মার কথা শোনা যায়।)

বাবা ॥ হ্যাঁগো, খোকা ত এখনও এসে পৌঁছল না।

মা ॥ কি জানি, বললে ত এক্ষুণি আসছি।

বাবা ॥ যা বাঁদর ছেলে তোমার, ভাখ গে যাও—কোথায় বসে আড্ডা মারছে।

মা ॥ না-না—ও এক্ষুনি এসে পড়বে। (বাবা আবার এই ঘরে আসেন। এ ঘরে কথাবার্তা আবার শোনা যায়)

২য় প্রৌঢ়। শোন মা, আমার বাড়ীতে যদি তুমি যাও, মানে ভগবানের যদি সেই রকম অভিপ্রায় হয় তবে কিন্তু তোমায় অনেক দায়িত্ব নিতে হবে মা।

বাবা॥ আজ্ঞে নিজের মেয়ে বলে বলছি না, সে সব দিক থেকে ও আপনাদের মনের মতন হবে।

বৃদ্ধ। না-না-না রাগ করবো কেন? রাগ করবো কেন? রাগ করেছিলুম একবার তোমার বুড়ী দিদিভাই-এর ওপর, সে অনেককালের কথা...

২য় প্রৌঢ়॥ না কাকা, অন্য কথা হচ্ছে।

বৃদ্ধ॥ গান? গান আমার খুব ভাল লাগে। একটা গান শোনাও না মা। তোমার বুড়ী দিদিভাই আমাদের বাসর ঘরে গেয়েছিলো—'শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী'—শ্যামা সঙ্গীত! আহাহা, কানে এখনও লেগে আছে।

খুকু। আজ্ঞে আমি ত গান জানি না।

বৃদ্ধ॥ যা জানো তাই শোনাও।

খুকু॥ আজ্ঞে আমি একদমই গান জানি না।

১ম প্রৌঢ়॥ অ চাটুয্যে মশাই—ও গান জানে না বলছে।

বৃদ্ধ। অ, তা আমার ছোটশালীর নাতনিও তো জানে না—

বাবা॥ আজ্ঞে দেখুন ঐ একটা ব্যাপারে আমি একটু পিছিয়ে পড়েছি। মেয়েকে গান বাজনা শেখাতে পারিনি।

২য় প্রৌঢ়। না-না তার জন্যে কি আছে? আর গান টানের ব্যাপারে বংশের একটা ট্রাডিশান থাকে। সব পরিবারে গান বাজনা হয় না।

বাবা॥ তাত বটেই—তাত বটেই। (বাবা এই কথা বলে আবার ছোট ঘরটায় আসেন। এ ঘরের কথাবার্তা আস্তে হয়ে যায়। বাবা ও মার কথা শোনা যায়) হ্যাঁগো এখনও খোকাতে এলো না।

মা। তাইত দেখছি। কিন্তু ওবে আমাকে বলে গেল এক্ষুণি আসবে!

বাবা। ইরেসপনসিবল্-ইডিয়েট—জানে বাড়ীতে লোকজন আসবে—মাত্র একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেটাও ঠিক মতন পালন করতে পারে না।

মা। আমি ত বুঝতে পারছি না—ভুলে গেল নাকি!

বাবা ॥ ভুলে যাবে কেন ? কোথায় দেখ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা মারতে বসে গেছে, খেয়াল আছে তার বাড়ীর কথা !

মা ॥ কি হবে তাহলে ? তুমি একটু বেরিয়ে দেখবে ?

বাবা ॥ আমি ? আমি বেরুলে কি করে চলবে ?

মা ॥ তাহলে তুমি একটু গল্প টল্প করে ওদের বসিয়ে রাখ। মনে হয় এখুনি এসে পড়বে।

বাবা ॥ (রেগে) আসুক আজ ও বাড়ি—(বাবা আবার এ ঘরে আসেন।)

২য় প্রৌঢ় ॥ ঠিক আছে তোমাকে আর কষ্ট করে বসে থাকতে হবে না মা—তুমি যাও।

বৃদ্ধ ॥ না না রমেন, যাবে কি—আসল কাজটাইত এখনও হয়নি। দেখি দিদি তোমার বাঁ হাতটা একবার দেখাওত। (খুকু বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয়—বৃদ্ধ মনোযোগ দিয়ে দেখেন) বাঃ বেশ ভাল হাত, খুব লক্ষীমন্ত মেয়ে তুমি দিদিভাই।

বাবা ॥ আজ্ঞে ওর'ত মিথুন রাশি কর্কট লগ্ন।

বৃদ্ধ ॥ বলতে হবে না-বলতে হবে না। আমি হাত দেখেই বুঝে ফেলেছি। ঠিক আছে তুমি যাও দিদিভাই—(খুকু আস্তে আস্তে উঠে পাশের ঘরে মায়ের কাছে যায়। এ ঘরের কথা আস্তে হয়ে যায়।)

মা ॥ তোর দাদা ত এখনও এলো না।

খুকু ॥ দাঁড়াও, সময় হলে ত আসবে। এখনও তিনটে পঁয়ত্রিশ হয়নি।

মা ॥ কিন্তু ওদের আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে ? কাজতো মিটে গেছে—ওরা যে এবার চলে যাবে।

খুকু ॥ তুমি দেখনা, দাদা এখুনি এসে পড়ল বলে—(এদিকে বড় ঘরে)

২য় প্রৌঢ় ॥ তাহলে নগেনবাবু—আজ আমরা উঠ্‌ব। মোটামুটি আমাদের ত পছন্দ হয়েছে—এইবার একদিন বাড়ীর মেয়েদের আসতে বলি—ওঁরাও দেখে যান। আর ইতিমধ্যে আপনিও আমার ভাইপো সম্বন্ধে খোঁজখবর নিন।

বাবা ॥ দেখুন খোঁজখবর আর কি নেব। মোটামুটি যা জানবার তা আমি নন্দবাবুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। আর তা ছাড়া আমি মশাই

ভাগ্যে একটু বিশ্বাস করি। আমার মায়ের যদি আপনাদের হাঁড়িতে চাল দেওয়া থাকে, তা কি কেউ আটকাতে পারবে ?

১ম প্রৌঢ় ॥ সেত বটেই—সেত বটেই। আমি ত আপনাকে বলেছি নগেনবাবু। ছেলেটি অত্যন্ত ভাল—M.Sc. পাশ, রাইটার্সে চাকরী করে। কোন বাজে নেশা নেই।

২য় প্রৌঢ় ॥ আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন মশাই—এই আজকালকার ছেলেদের মতন রাজনীতির নেশা টেশা নেই।

বাবা ॥ আজ্ঞে ওটা আমারও অত্যন্ত অপছন্দ। আমার ছেলেকেও আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি, ছাখ বাপু—ওইসব রাজনীতিটিতি করতে হয় বাড়ীর বাইরে—। আর দিনকাল যা পড়েছে। এই আমাদের পাড়ায় দেখুন না, রাতদিন গণ্ডগোল, মারামারি। আমার ছেলের প্রায় সবকটা বন্ধু-বান্ধব এই সব করছে—আমি বলে দিয়েছি—ছাখ বাপু ওদের সঙ্গে মিশবে না।

২য় প্রৌঢ় ॥ আমাদের সময়ে মশাই রাজনীতির একটা সম্মান ছিল। তখন আমাদের সকল ভারতবাসীর কমন এনিমি—ইংরেজ। আর আজ ধরুন প্রত্যেকটা লোক প্রত্যেকের এনিমি !

বৃদ্ধ ॥ অনেক বেলা হল, এবার ওঠা যাক্।

বাবা ॥ আজ্ঞে একটু বসুন—একটু মিষ্টিমুখ করে যান।

২য় প্রৌঢ় ॥ না-না—ওসব পরে একদিন হবে'খন। আজ আমরা উঠি।

বাবা ॥ না-না—তা কি হয়। আজ প্রথম দিন আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিলেন, মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়তে পারি না। (বাবা দ্রুত ছোট ঘরে আসেন)

বাবা ॥ হ্যাঁগো, এখনও আসেনি ?

মা ॥ এলে'ত তোমার চোখের সামনে দিয়েই আসত।

বাবা ॥ কি আতান্তরে পড়লাম বল দিকিনি। এখন কি করি ?

মা ॥ একটু কথায়-কথায় ওঁদের আটকে রাখনা।

বাবা ॥ আরে কি কথা বলব। কথা যা বলার তাত সব শেষ হয়ে গেছে, এখন কি বসে বসে সিনেমার গল্প করব ? ইডিয়েট ছেলে কোথাকার।

খুকু ॥ আমি বাইরে গিয়ে দেখব ?

বাবা॥ তুই ওদের সামনে দিয়ে কোথায় বাইরে যাবি। (মাকে) এই তুমি, তুমিই, আস্কারা দিয়ে দিয়ে ওকে একেবারে মাথায় তুলেছ।

মা॥ বাজে বকো না—আমি আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছি, না তুমি তুলেছ!

বাবা॥ আজ আসুক বাড়ী—চাব্‌কে সোজা করবো ওকে—হারামজাদা! শোন খুকি একটু চা কর—অন্তত এককাপ করে চা বিস্কুট দিয়ে মান সম্মান বাঁচাই।

মা॥ তুমি ওঘরে যাও। আমি এখুনি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। খুকু চট্ করে একটু রান্নাঘরে আয় তো। (মা ও খুকু মঞ্চের বাইরে চলে যায়। বাবা বড় ঘরে)

বৃদ্ধ॥ বুঝলেন নন্দবাবু—সে সব এক দিন ছিল—এত বড় বড় লেংড়া আম, আম তখন টাকায় দু ঝুড়ি। ভাল খাঁটি ঘি তখন—

১ম প্রৌঢ়॥ সে সব কথা আর মনে করিয়ে দেন কেন কাকাবাবু। আপনাদের সময় ত অনেক দূরের কথা, আমরা যা খেয়েছি তাই আমাদের ছেলেপিলেরা কণামাত্র খেতে পারল না। (হঠাৎ বাইরে দূরে কোথাও শাঁখ বাজছে শোনা গেল—এক সংগে অনেক বাড়ীতে শাঁখের আওয়াজ। সেই সঙ্গে রাইফেল ছোঁড়ার আওয়াজ। এ ঘরের সবাই কান খাড়া করে শোনেন।)

২য় প্রৌঢ়॥ ভূমিকম্প হল বোধ হয়।

বাবা॥ কেন, মনে হল নাকি আপনার?

২য় প্রৌঢ়॥ না, এই যে শাঁখ বাজছে।

বাবা॥ ওঃ না-না—ওটা ভূমিকম্পের জন্ম বাজছে না।

১ম প্রৌঢ়॥ তবে?

বাবা॥ পাড়ায় পুলিশ ঢুকেছে সি. আর. পি—

২য় প্রৌঢ়॥ পুলিশ ঢুকলে শাঁখ বাজে নাকি?

বাবা॥ হ্যাঁ, এখানে অনেক ছেলেকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে' ত। তাই পাড়ায় পুলিশ ঢুকলেই পাড়ার মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে ছেলেদের সাবধান করে দেয়।

২য় প্রৌঢ় ॥ সে কি! তা হঠাৎ পাড়ায় পুলিশই বা ঢুকবে কেন?

বাবা ॥ ওই সব সি. পি. এম-এর ছেলেগুলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যখন তখন আসে—যে বাড়ীতে ইচ্ছে ঢোকে আর যা ইচ্ছে করে। আর বাড়ীতে যদি ইয়ং ছেলে থাকে তা হলে ত কোন কথাই নেই।

১ম প্রৌঢ় ॥ তা হলে ত মশাই আপনারও খুব বিপদ—আপনারও ত ইয়ং ছেলে আছে।

বাবা ॥ না-না সে দিক থেকে আমার ছেলে খুব ভাল—ওকে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন।

১ম প্রৌঢ় ॥ তবে ব্যাপারটা কি জানেন? দেশের মানুষ চারদিক থেকে এমন চাপ খেতে শুরু করেছে যে মানুষের মনে বিক্ষোভ আপনা থেকেই দানা বেঁধে ওঠে।

২য় প্রৌঢ় ॥ বিক্ষোভ দেখালেই ত শুধু চলবে না নন্দবাবু—দেশের জন্যে কিছু Sacrifice করব না শুধু দেশের সরকারের কাছে অনবরত দাও দাও বলে হাত পেতে থাকব—তা ত চলে না।

১ম প্রৌঢ় ॥ Sacrifice-! ভারতবর্ষের মানুষ দেশের জন্যে যে পরিমাণ Sacrifice করেছে অন্য কোন দেশের মানুষ তা করেছে? আর Sacrifice এর কথা যদি বলেন তবে জিজ্ঞেস করি ভারতবর্ষের একজন সাধারণ মানুষ তার দেশের জন্যে যে পরিমাণ Sacrifice করেছে ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর তার কণামাত্র Sacrifice আছে?

বাবা ॥ না-না—এ আপনি কি বলছেন নন্দবাবু। নেহেরু Family দেশের জন্যে Sacrifice করেনি?

১ম প্রৌঢ় ॥ কি জানি মশাই—প্যারিসে কাচা কোট প্যান্ট পরে ইংরেজ হয়ে থেকে ইংরেজের দেশে লেখাপড়া শিখে ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীন দেশের কর্তৃত্ব পাওয়াটা হল দেশের জন্যে Sacrifice! এদের নাম সযত্নে লেখা থাকবে লালকেল্লার মাটিতে পোঁতা কালাধারে আর ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সূর্য সেনের মতন যেসব হাজার হাজার প্রাণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের লড়াইতে শেষ হয়ে গেল তাদের নাম মুছে যাবে ক্লাস সেভেনের ইতিহাসের বই-এর পাতা

থেকে। কোনও সভ্য দেশে এমন ইতিহাস বিকৃতির নজীর খুঁজে পাবেন আপনি?

২য় প্রৌঢ় ॥ না, মানে ব্যাপারটা হলো—

১ম প্রৌঢ় ॥ বলতে পারেন পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে এইভাবে সাধারণ মানুষের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছে? কোন দেশের প্রত্যেকটি খবরের কাগজ দীর্ঘ উনিশ মাস ধরে সেনসার করা হয়েছে, বলতে পারেন পৃথিবীর কোন দেশে শুধুমাত্র একজনের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার জন্যে দেশের বিচার ব্যবস্থার গলা টিপে মারা হয়েছে?

বাবা ॥ দেখুন নন্দবাবু—এ কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি বর্তমানের So called leftist পার্টিরা দেশকে যে অরাজকতার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল তাতে করে ইন্দিরা গান্ধী ঠিক কাজ করেছেন।

১ম প্রৌঢ় ॥ কি জানি মশাই—আমার ত মাঝে মাঝে রুখে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। আমি ভাবতে পারিনা যে কোন গুণ না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রধান মন্ত্রীর ছেলে বলে একটা ২৭-২৮ বছরের অকালপক্ক ছেলের আঙুলের ইশারায় ভারতবর্ষের ৬০ কোটী মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করা যেতে পারে; আমি ভাবতে পারিনা যে ভারতবর্ষের আর পাঁচটা সাধারণ নাগরিকের মতন একজন নাগরিক যার একমাত্র Qualification সে শুধুমাত্র প্রধান মন্ত্রীর ছেলে আর গুণ্ডাবাহিনীর নেতা, শুধু তার একটা খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে হাজার হাজার গরীব মানুষের ঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে—

বাবা ॥ আরে, একটা কথাত মানতে হবে নন্দবাবু—আমাদের দেশের স্বাধীনতার বয়েস মোটে তিরিশ বছর। এই তিরিশ বছরের মধ্যেই দেশকে সোনায় মুড়িয়ে দেবে এমন আশা করাটা অন্যায়। আস্তে আস্তে এগুতে হবে। তা নয়, দেশের লেফ্‌ট পার্টিগুলো চাইছে রাতারাতি দেশটাকে স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলতে হবে। তাকি কখনও সম্ভব?

১ম প্রৌঢ় ॥ তা যদি বলেন ত বলি নগেনবাবু—ঐ একটা ছোট্ট দেশ ভিয়েৎনাম—

বৃদ্ধ ॥ মামত বলেছে অনিমা—না-না অনিন্দিতা।

২য় প্রৌঢ় ॥ না কাকা—অন্য কথা হচ্ছে—দেশের কথা।

বৃদ্ধা ॥ অ—তা আমাদের আদি দেশ হচ্ছে ঢাকা বিক্রমপুর—ওখানকার কোন লোককে জিজ্ঞেস করলেই বলবে—নন্দপুরের চাটুয্যে পরিবার।

২য় প্রৌঢ় ॥ না কাকা অন্য কথা হচ্ছে। আপনি একটু চুপ করে বসুন।

বৃদ্ধা ॥ না না—আর বলব না—চল—এবার আমায় আবার গিয়ে আহ্নিক করতে হবে।

বাবা ॥ একটু বসুন. আমি এখুনি চায়ের ব্যবস্থা দেখছি। আসলে আজ আমাদের এখানে একটু অসুবিধে হয়ে গেছে—মানে কিছু কিছু দোকানপাট বন্ধ—তাই আমার ছেলে মিষ্টি আনতে গেছে—তাই—মানে একটু দেরি হচ্ছে।

২য় প্রৌঢ় ॥ আরে তার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? অতো ফর্মাল হবার কোন কারণ নেই? ভগবানের ইচ্ছায় যদি আপনাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হয় তখন বহুবার আসতে হবে, মিষ্টি না হয় তখন এক সঙ্গে খাইয়ে দেবেন।

বাবা ॥ আ-হা-হা, সেত বটেই সেত বটেই। তবু—তবু আপনারা একটু বসুন, আমি এখুনি আসছি—আসছি। (বাবা এইঘর ছেড়ে পাশের ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়ান। এমন সময় একটা ছেলে এসে ঢোকে। তার হাতে র‍্যাশনের থলে)

ছেলেটি ॥ মেসোমশাই।

বাবা ॥ কে?

ছেলেটি ॥ আমি নন্তে।

বাবা ॥ কি ব্যাপার?

ছেলেটি ॥ খাবারটা! (পাশের ঘরে মা ও খুকুকে দেখা যায়। মার হাতে একটা ট্রের ওপর তিনচার কাপ চা সাজান। উনি ওটা খুকুর হাতে তুলে দিলেন। এ ঘরে ছেলেটিকে আসতে বলেন।)

বাবা ॥ এ ঘরে এস। (ছেলেটি ব্যাগটা নিয়ে বাবার পেছন পেছন ও ঘরে ঢোকে)

বাবা ॥ (খুকুকে) দাঁড়া দাঁড়া—চাটা এখন দিসনি, খাবার এসে গেছে। খোকা

পাঠিয়ে দিয়েছে। (ছেলেটিকে) খোকা কোথায়? (ছেলেটার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে মায় হাতে দেন)

নন্তে ॥ খোকা একটু আটকে গেছে। তাই আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।

মা ॥ (খুকুকে) খুকু তিনটে বড় ডিস নিয়ে আয়না মা রান্নাঘর থেকে।

বাবা ॥ খোকা আটকে গেছে! বাবুর আড্ডাটাই এত বড় হল যে সে বাড়ীতে অতিথি এসেছে জেনেও অন্য কাজে আটকে গিয়ে খাবারটা তোমায় দিয়ে পাঠিয়ে দিলে? (খুকু ইতিমধ্যে চারটে প্লেট নিয়ে এসেছে —মা হঠাৎ ব্যাগটা খোলে)

মা ॥ ওমা! ইস, সব যে একাকার হয়ে গেছে, একি! রক্ত লেগে আছে যে —একি পাঠিয়েছে খোকা—!!

বাবা ॥ রক্ত! কার রক্ত, কিসের রক্ত?

মা ॥ এই ছাখ, সারা ব্যাগ রক্তে মাখামাখি।

বাবা ॥ সে কি? নন্তে, খোকা কোথায়? এ কিসের রক্ত?

নন্তে ॥ মেসোমশাই—

খুকু ॥ কি হয়েছে নন্তেদা-?

মা ॥ (আকুল) অ নন্তে, সত্যি করে বল বাবা—আমার খোকার কিছু হয়নি ত?

বাবা ॥ নন্তে, কি হয়েছে বাবা বল। (ইতিমধ্যে দেখা যায়—দু-একজন করে লোক—এ বাড়ীতে আসতে শুরু করেছে। তার মধ্যে রঞ্জতও আছে।)

নন্তে ॥ মেসোমশাই খোকাকে গুলি করে মেরেছে পুলিশ।

মা ॥ (চিৎকার করে ওঠেন) না-আ-আ—!!! (মা লুটিয়ে পড়েন মেঝেতে, খুকু মার পাশে বসে পড়ে। বাবা ছুটে এ ঘরে আসতে আসতে বলেন)

বাবা ॥ না-না—আমার খোকাকে কেন ওরা মারবে—আমার খোকাত এ সবের মধ্যে নেই—তোমরা ভুল করছ—ভুল দেখেছ। ও নিশ্চয়ই আমার খোকা নয়! (বাইরে থেকে আসা লোকদের মধ্যে একজন বাবাকে ধরেন।)

নন্তে ॥ কোথায় যাচ্ছেন মেসোমশাই?

বাবা ॥ তোমরা ভুল দেখেছো, আমার খোকাকে কেন মারবে? আমার

খোকা'ত রাজনীতি করেনি কোনদিনও—না, না, এ সত্যি হতে পারে না—

নন্তে ॥ রাজনীতি না করলেও ওরা খোকাকে মেরেছে।

২য় প্রৌঢ় ॥ কিন্তু ওকে কেন মারল?

নন্তে ॥ আসলে খোকাকে মারতে চায়নি। পুলিশ অনেক দিন ধরে খোকা চক্রবর্তী বলে সি. পি. এম-এর একটা ছেলেকে খুঁজছিল। একটু আগে মোহান্তি দলবল নিয়ে পাড়ায় ঢুকেছিল খোকাকে খুঁজতে। সেই সময়ে খোকা খাবার নিয়ে ফিরছিল। এমন সময় ওরই কোন বন্ধুবান্ধব বেখেয়ালে ওকে খোকা বলে ডেকে ফেলে—আর মোহান্তি কাছেই ঘাপটি মেরে ছিল। খোকা নাম শোনামাত্রই রিভলবার বের করে তিনটে গুলি করে—। ও পড়ে যাওয়ার আগে একবার চিৎকার করে বলেছিল—আমায় মারছেন কেন? আমি'ত খাবার নিয়ে যাচ্ছি—আমার বাড়িতে অতিথিরা বসে আছে। তারপরেই ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ওর বডিটাও তুলে মোহান্তি থানায় নিয়ে গেছে।

বাবা ॥ (হা-হা করে কেঁদে ওঠেন) হা ভগবান –এ আমার কি হল! আমি চিরদিন রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম আমার খোকাকে। ওকে কেন পুলিশের গুলি খেয়ে মরতে হল। হা-ভগবান!

রজত ॥ এ প্রশ্নের উত্তর ভগবানের কাছে পাবেন না মেসোমশাই। এ প্রশ্নের উত্তর চান আপনাদের এশিয়ার মুক্তি সূর্যের কাছে। জিজ্ঞাসা করুন তাকে—কেন কোন রাজনীতি না করেও আপনার ছেলেকে পুলিশের গুলিতে মরতে হল? কেন শুধু নাটক ভালবাসার অপরাধে প্রবীর দত্তকে পুলিশের লাঠি খেয়ে মরতে হল? কেন শুধু জর্জ ফার্ণা-ণ্ডেজের পরিচিত বলেই জেলের অন্ধকার ঘরে তিল তিল করে অভিনেত্রী স্নেহলতাকে মরতে হল বিনা চিকিৎসায়? কেন? কেন? কেন?

[সকলেই ফ্রিজ হয়ে যান। মঞ্চের ক্রমশ কমে আসা আলোর মধ্যে থেকে একটা লাল আলো আলাদাভাবে ভূলুণ্ঠিত মায়ের সামনে রাখা কাপড়ের ব্যাগটার ওপর পড়ে। পর্দা নেমে আসে।)

[অভিনয়ের আগে নাট্যকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ঠিকানা: পি-৩০/এ ইন্দ্রানী পার্ক। কলিকাতা—৩৩। অথবা মুক্ত অঙ্গন]

হারানের নাতজামাই

কাহিনী—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যরূপ—অরুণ মুখোপাধ্যায়

●

গফুর—	শ্রীমন্ত
রাখাল—	মন্মথ
হারান—	শ্রীপতি
ময়না—	বৃদ্ধ
ময়নার মা—	কানাই
ভুবন—	মথুর
নিতাই—	জগমোহন

●

[হারান দাসের বাড়ীর দাওয়া। দাওয়ায় হ্যারিকেন জ্বলছে। দাওয়ায় বসে আছে রাখাল ও গফুর। তাদের হাসির মধ্যে পর্দা খুলবে।]

গ। তাই নাকি? তারপর?

রা॥ তারপর আর কি। দারোগাবাবু মুখটি চুন করে ফিরে গেল। পাবে কোথায় মণ্ডলকে—তিনি তো তার আগেই—(আবার হাসে দুজনে)

গ। দারোগাবাবু তাহলে খুব চটেছে বল?

রা। চটেছে মানে, চটে একেবারে আগুন হয়ে আছে। আজ দুমাস হতে চলল মণ্ডলের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। দারোগাবাবু তার লোকজন নিয়ে এ-গাঁ সে-গাঁ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে—কিন্তু সব গাঁয়ের চাষীরাই যে মণ্ডলকে আড়াল করে রাখতে চায়। তাকে ধরা কী অতই সোজা?

গ ॥ আচ্ছা, দারোগাবাবু মণ্ডলকে চেনে না ?

রা ॥ আরে চেনে না বলেই তো সুবিধে। ঐ ভুবন মণ্ডল নামটাই যা শুনেছে। সেদিন তো শালিগঞ্জে মণ্ডল একেবারে পুলিশের মুখোমুখি পড়ে গেল। বেগতিক দেখে মণ্ডল ভালমানুষটির মত পুলিশের নাকের ওপর দিয়েই হেঁটে চলে গেল, যেন গাঁয়েরই কোন চাষী।

গ ॥ কিন্তু চণ্ডী ঘোষ ত সবসময় পেছনে লেগে রয়েছে। ওর আঁতে ঘা পড়েছে—ও কি ছাড়বে ?

রা ॥ ছাড়বে নাই তো। পুলিশের চেয়ে তো ওর গরজই বেশি। শ্রীপতি আর কানাইকে লেলিয়ে দিয়েছে। তারাও মণ্ডলকে চেনে না, তবে যেখান থেকে যখন যা খবর পাচ্ছে থানায় পৌঁছে দিচ্ছে। ঘোষ মশাই তো বেশ বোঝেন, চাষীরা আজ এক জোট হতে পেরেছে ঐ মণ্ডলেরই চেষ্টায়—

গ ॥ সে কথা তো একশোবার সত্যি রাখাল। ঐ একটা মানুষের জোরে—

রা ॥ মণ্ডল কিন্তু অন্য কথা বলেন গফুর।

গ ॥ কি রকম ?

রা ॥ মণ্ডল বলেন, তোমাদের জোরই আসল জোর। তোমরা সকলে হাতে হাত মিলিয়ে না দাঁড়ালে আমি কি আর একা লড়াই চালাতে পারতাম ? ঘোষ মশাই কিন্তু এখনও চেষ্টা করছে, লোভ দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে যে কোন ভাবেই হোক চাষীদের ধান আদায় করতে।

গ ॥ ওসব কোন চালাকিতেই আর আমরা ভুলছি না। আমরা মাঠে কাজ করব, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ফসল ফলাব আর ঐ লোকটা ঘরে বসে লাভের কড়ি গুণবে। জান কবুল করেছি আমরা, ধান এবার কিছুতেই ছাড়ব না।

[হারান ঢুকে পড়ে]

হা ॥ ছাড়ব না।—কিছুতেই ছাড়ব না। আমার রক্তে বোনা ফসল জোতদারের গোলায় ভরতে দোব না। হাত উঠাও। না ! এ আমার ধান—আমি রক্ত দিয়ে বুনেছি এ ফসল—হাত উঠাও। না—সরে যাও, না হলে গুলি চালাব—চালাও গুলি তবু ফসল ছাড়ব না—চ্যাট্-চ্যাট্-

ট্যাচ্‌—আঃ দিলাম—আমার সব রক্ত ঢেলে দিলাম জমির ওপর—রক্তের ঝিলকিতে সোনা ফসল লাল করে দিলাম—তোমরা কেউ ফসল দিও না গো—ফসল দিও না—

[ময়না এসে হারানকে ধরে]

ম ॥ দাদু ভেতরে চল দাদু—ভেতরে চল—

হা ॥ এ্যাঁ! কে! কে!

ম ॥ আমি দাদু!

হা ॥ হ্যাঁরে, নিতাই ফিরেছে মাঠ থেকে? সাঁঝ নেমে এলো—আকাশে মেঘ করেছে। যাই দেখি একবার।

ম ॥ দাদু—দাদা তো ফিরে এসেছে মাঠ থেকে।

হা ॥ ফিরে এসেছে?

ম ॥ হ্যাঁ—ধানের গোছা পিঠে করে ফিরে এলো মাঠ থেকে।

হা ॥ ফিরেছে! আঃ—বড্ড ভয় করছিল রে—ধানগুলো সব লুকিয়ে রাখ—ওরা কেড়ে নিয়ে যাবে—লুকিয়ে রাখ! হ্যাঁরে—ধানের শীষে লাল ফোঁটা দেখলি!

ম ॥ না তো।

হা ॥ আছে আছে—ভাল করে গ্যাখ! অত রক্ত কোথায় গেল? সব শুষে নিলো মাটিতে? সব শুষে নিলো! তবে যে সনাতন বলেছিল মাটিতে যে নতুন ধান উঠবে, তার গায়ে লাল ফোঁটা থাকবে। যখন সব ধান চাষীর গোলায় উঠবে—চাষীর চিতোনো বুকে যখন পুলিশের গুলি ঠিক্‌রে বেরিয়ে যাবে তখন ধানগুলো আবার সোনালী রঙ ফিরে পাবে। তবে কি—তবে কি চাষীরা সব ধান নিজেদের গোলায় তুলেছে? আঃ কী মজা! কী মজা!

ধানের শীষে চুম্‌ দিলাম কচি সোনা ধান
ধানের ঢেউয়ে দুলে ওঠে আমার পরাণ।

কী মজা! কী মজা! (হারান চলে যায়। সঙ্গে ময়না)

রা ॥ আমরা শুধবো গফুর—সনাতনদার রক্তের ঋণ শুধবো আমরা এবার। ধানের সোনা রঙ ফিরিয়ে আনব আমরা। সনাতনদা একা এগিয়ে গিয়ে-

ছিলো বুক চিতিয়ে পুলিশের বন্দুকের মুখে—আমরা সেদিন ভয়ে পিছু হটেছিলাম। কিন্তু আজ? আজ সবাই একজোট—একসঙ্গে রুখে দাঁড়াবো সবাই। রক্ত যদি ঝরে এবার আর একপেশে নয়। সনাতনদার বুকের আগুন সব চাষীর বুকে আজ ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে—সব কিছু ছারখার করে দেবে সে আগুন!

গ॥ মণ্ডলের কথা মত সব ধান এখন চাষীরা নিজেদের ঘরে জমা করে ফেলেছে। এখন তো আর ঘরের ভেতর থেকে ধান কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না জোতদার মশাই।

রা॥ বলা যায় না গফুর, ওরা সব পারে। তাছাড়া পুলিশ ওদের পেছনে। একটু আলগা দিলেই ঘোষমশাই থাবা বসাবে। আমরা, তেমনি যদি থাকতে পারি তাহলে শুধু ঐ ঘোষমশাই কেন সব জোতদারগুলো জোট পাকালেও কিছু করতে পারবে না।

গ॥ আচ্ছা রাখাল, আজ যে মণ্ডল এ গাঁয়ে এসেছে সে খবরও তো ওরা পেতে পারে—

রা॥ হ্যাঁ, তা পারে বই কি—

গ॥ তার মানে, আজ রাতেও হামলা হতে পারে?

রা॥ তা তো পারেই—তবে ভাবনার কিছু নেই গফুর! সব ব্যবস্থা পাকা করা আছে। ওনারা এলে আমরা অনেক আগেই টের পাব। ওনারা এদিক দিয়ে এলেই মণ্ডলকে ওদিক দিয়ে পার করে দোব। আর ওনারা ওদিক দিয়ে এলে মণ্ডলকে সেইদিক দিয়ে পার করে দোব।

[ময়নার মা দাওয়ায় দাঁড়ায়]

মঃ মা॥ কি রে রাখাল, কি হাত পা ছুঁড়ছিস এত?

রা॥ না, এই গফুরকে বোঝাচ্ছিলাম, মহাপ্রভুরা এলে মণ্ডলকে কি ভাবে আড়াল করে সরিয়ে দেবো—তা মাসী মণ্ডলের খাওয়া হয়ে গেছে?

মঃ মা॥ হ্যাঁ, এই মাত্র হোল—তা তোরা সব এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কি করতে? কদিন ধরে তো রাতে ঘুম নেই তোদের, যা, এবার সব শুয়ে পড়গে।

রা ॥ হ্যাঁ. এই যাই, বুঝলে মাসী মণ্ডলও শুনেছে তোমার সেই দুপুর বেলার গল্প !

গ ॥ দুপুরবেলার গল্প !

রা ॥ হ্যাঁরে, সেই যে গত মাসে দুপুরবেলা হঠাৎ গাঁয়ে পুলিশ এসে হামলা করল—যোয়ান মরদরা তখন সব মাঠের কাজে, মাসী আমার আর সব মেয়েদের যোগাড় করে শুধু ঝাঁটার তাড়াতেই ওদের গাঁ ছাড়া করে দিলে—

মঃ মা ॥ হ্যাঁ,—কটা প্যাংলা পুলিশ—তাদের আবার—

রা ॥ প্যাংলাই হোক আর হ্যাংলাই হোক, পুলিশ তো ? একবার ভাব তো মাসী, একবছর দুবছর আগেও পুলিশের নামেই আমরা অনেকে ভিরমি খেতাম কি না ?

মঃ মা ॥ তা পুলিশ হলেও ওরা মানুষ তো ?

গ ॥ হ্যাঁ, মানুষ বটে কিন্তু ঐ ধড়াচূড়ো পরলে অনেকের মধ্যে আবার বনমানুষ ভাব জাগে কি না ? (সকলে হেসে ওঠে)

রা ॥ ও হ্যাঁ তোমাকে বলা হয়নি মাসী, কদিন আগে হাতী নাড়ায় গিয়েছিলাম। ওখানে তোমার জামায়ের সঙ্গে দেখা গো ?

মঃ মা ॥ কি বলে ও ?

রা ॥ মুখে কিছু বলতে চায় না, তবে হাবভাব দেখে মনে হল ভেতরে ভেতরে নরম হয়ে এসেছে। আমি বললাম, এটা কি ঠিক হচ্ছে জগমোহন, মাসী আমার গরীব মানুষ, কিন্তু জোচ্চোর তো নয়। না হয় বিয়ের সময় যা দেবার কথা ছিল তা ঠিক ঠিক দিতে পারে নি, কিন্তু তাই বলে ছমাস ধরে তুমি ময়নাকে বাপের বাড়ী ফেলে রাখবে ?

মঃ মা ॥ তুই আবার অত কথা বলতে গেলি কেন ?

রা ॥ আসলে কি জান মাসী, তোমার জামাই এমনিতে ভালমানুষ। কিন্তু ঐ পাঁচজনে ওর মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে। তার ওপর আছে ওর বাপ, তোমার বেয়াই গো—ভীষণ কঞ্জুষ। ছেলের যদি বা মন চায় বউ আনতে বাপের এক গোঁ, আগে রূপো আসুক তারপর বউ ঘরে আসবে।

মঃ মা ॥ হ্যাঁ, এবারে টাকাটা পাঠিয়ে দোব ভাবছি। তাহলে হয়তো

বেয়াইয়ের মন ভিজবে, বউকে ঘরে তুলবে। এদিকে মেয়েটা আমার মুখ শুকনো করে ঘোরে। মুখে কিছু না বললেও আমি তো বুঝি।

[ভেতর থেকে এসে ভুবন দাওয়ায় দাঁড়ায়]

—এসো মণ্ডল।

[সঙ্গে ময়নাও আসে]

মঃ মা॥ হ্যাঁরে, বাবা চুপ করেছে?

ম॥ হ্যাঁ মা।

ভু॥ তোমার শ্বশুর কি প্রায়ই এমন করে?

মঃ মা॥ মাঝে মাঝে কি যে হয় ছেলেকে খুঁজবে—চিৎকার করবে—আবার আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে আসে। নিতাই মাঠ থেকে ফিরলো কিনা বিকেল থেকে পঞ্চাশবার খোঁজ করবে। ময়নার বাবা পুলিশের গুলিতে জান খোয়ানর দিন থেকে আজ পাঁচ বছর ধরে চলেছে এই রকম!

ভু॥ সনাতনদার কথা আমি অনেক আগেই শুনেছি। আশপাশে সাত গাঁয়ের লোক আজও তার নামে মাথা নোয়ায়। সেদিন যারা পিছিয়ে এসেছিল তারা সে কথা ভেবে আজ লজ্জা পায়। সত্যি! আমি যখন শুনলাম সেই সনাতনদার বাড়ীতেই রাতে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে আমার, তখন কেমন একটা উত্তেজনা হয়েছিল আমার মনে। এ গাঁয়ে এসে চাষীদের সঙ্গে কথা বলে—তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে যেন নতুন একটা উৎসাহ পাচ্ছি। নিতাইকে দেখছি না—

ম॥ দাদা গেছে নিবারণ খুড়োর বাড়ী—ওর ছেলের অসুখ—

ভু॥ কি তোমরা সব এখনো রয়েছ যে—!

রা॥ কাল ভোরেই তাহলে আপনি চলে যাচ্ছেন মণ্ডল?

ভু॥ তাই তো সবাই সিদ্ধান্ত করলো।

মঃ মা॥ মণ্ডলকে বললাম, বুঝলি রাখাল, ধান কাটা তো সব জায়গাতেই প্রায় শেষ, এখন কটা দিন জিরেন দাও—ছুদিন অন্তত এখানে থেকে যাও—

ভু॥ থেকে যাব? বল কি ময়নার মা? চণ্ডী ঘোষ তো আর একটা নয়। জোতদাররা সব হাঁ করে বসে আছে। চাষীদের ধান গিলবে বলে। শালগঞ্জে চাষীদের মধ্যে কি একটা গোলমাল হয়েছে খবর পেলাম।

কাল সকালেই ওখানে যেতে হবে। আর তাছাড়া জানই তো পেছনে সব সময় কেউ লেগে আছে। আমার একদিনের বেশি দুদিন এক জায়গায় থাকতে ভরসা হয় না।

মঃ মা॥ তা সে পুলিশের বিপদ তো সব জায়গাতেই। এখানেই যদি হামলা হয় আমরা কি ওদের হাতে ছেড়ে দোব তোমাকে?

ভু॥ না-না সে কথা বলছি না, বলছি যে ওদের যত এড়িয়ে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। আচ্ছা, এবার তাহলে তোমরা ঘরে যাও, রাত তো হোল অনেক। ময়নার মা আবার যা ভূরি ভোজন করালে—তোমার মেয়েটিও ভারী লক্ষী—কেমন যত্ন করে আসন পেতে—

মঃ মা॥ রান্নাবান্নাও তো সব ঐ করেছে—

ভু॥ আচ্ছা—তুই তো খুব গিন্নী হয়ে উঠেছিস রে মেয়ে?

রা॥ তাহলে আমরা চলি মণ্ডল—

ভু॥ হ্যাঁ—এসো—

মঃ মা॥ ওমা—ময়না, যা মণ্ডলের বিছানাটা ঠিক করে দিগে—(ময়না ডানদিকের ঘরে যায়) যাও মণ্ডল তুমিও এবার শুয়ে পড়—কাল ভোরেই তো আবার—(চারদিকে শাঁখ বেজে ওঠে। ওরা চঞ্চল হয়ে ওঠে)

গ॥ রাখাল—

রা॥ হ্যাঁ এতো সেই আওয়াজ কোনদিক থেকে আসছে—

[ছুটতে ছুটতে নিতাই ঢোকে]

নি॥ উত্তর দিকের সীমানা থেকে শাঁখ বাজছে মণ্ডল, পুলিশ আসছে।

ভু॥ বুঝেছি। এ আওয়াজ তো আমার অচেনা নয়। তাহলে ময়নার মা—তোমার ঘরে আজকে আর বিশ্রাম নেওয়া হোল না আমাকে দক্ষিণ দিকের পথ দেখতে হচ্ছে।

নি॥ চলুন। চড়কডাঙ্গার রাস্তা দিয়ে আপনাকে ও গাঁয়ের সীমানায় পৌঁছে দিয়ে আসছি—পুলিশ আসছে এদিক দিয়ে—ওদিকের পথে কোন বিপদ নেই। চলুন।

[ছুটতে ছুটতে শ্রীমন্ত ঢোকে]

শ্রী॥ যাচ্ছিস কোথায় নিতাই?

নি ॥ ভুবনদাকে নিয়ে চড়কডাঙ্গার রাস্তা দিয়ে—

শ্রী ॥ ও পথ বন্ধ !

রা ॥ তার মানে ?

শ্রী ॥ হ্যাঁ, রথতলায় বেড় ধরে চারদিকে ঘিরে ফেলেছে পুলিশে। দারোগাবাবু এখনও বেশ খানিকটা দূরে। পুলিশের দল আজ খুব ভারী। সব বন্দুক হাতে। সঙ্গে আছে শ্রীপতি, কানাই আর চণ্ডী ঘোষের লেঠেলের দল। কাউকে বেরোতে দেবে না।

রা ॥ তাহলে তো বেরোবার কোন পথই নেই ? কিন্তু রথতলাই বা হঠাৎ ঘিরতে গেল কেন ? মণ্ডল যে আজ হারান খুড়োর বাড়ীতে উঠবে সে খবরও কি ওরা—

গ ॥ নিশ্চয়ই খবর দিয়েছে কেউ ! কোন শালার পিঁপড়ের পাখা উঠেছে—দেখে নেবো।

শ্রী ॥ এখন কি করবে তাহলে ?

রা ॥ মণ্ডলের পালাবার পথ যখন বন্ধ তখন রুখতে হবে ! আমাদের লোকজন সব—

শ্রী ॥ লোকজন সব খবর পেয়ে বেরোতে শুরু করেছে—হাঁসখালি পুকুরের ধারে সব জমায়েত হচ্ছে—

রা ॥ ঠিক আছে— (রাখাল উত্তেজিতভাবে বাইরে বেরোতে যায়। ভুবন আটকায়)

ভু ॥ রাখাল, কি করতে চাও তোমরা ?

রা ॥ রুখব মণ্ডল, আমরা রুখব।

গ ॥ হ্যাঁ, কোন গাঁয়ে ধরা পড়েনি মণ্ডল—আজ আমাদের গাঁ থেকে মণ্ডলকে ধরে নিয়ে যেতে দোব না কিছুতেই—চল শ্রীমন্ত দেখি, সকলকে তৈরী থাকতে বলি—

ভু ॥ দাঁড়াও দাঁড়াও গফুর। মোটেই উত্তেজিত হোয়ো না। রুখতে গেলে হাঙ্গামা হবে। ওদের হাতে বন্দুক আছে, দশ-বিশটা খুন জখম হবে। তুমি বরং যাও, লোকজনকে এখনকার মত শান্ত কর, তারপর দেখছি কি করা যায়—

গ ॥ এখন আর করবেন কি ?

ভু ॥ পুলিশ তো এখনও খানিকটা দূরে আছে—তুমি যাও। শ্রীমন্ত, নিতাই তোমরাও দেখ— (গফুর, শ্রীমন্ত ও নিতাই বেরিয়ে যায়)

রা ॥ কিন্তু হাঙ্গামা আপনি এড়াবেন কি করে মণ্ডল ? রুখতে গেলে—

ভু ॥ না, সে হয় না, আমার জন্যে এতগুলো লোকের জীবন নিয়ে টানা-টানি, সে আমি হতে দেব না।

রা ॥ তাহলে, তাহলে কি আপনি ধরা দেবেন ?

ভু ॥ তাছাড়া তো আর কোন পথ নেই—

মঃ মা ॥ না মণ্ডল, ধরা দেওয়া চলবে না।

ভু ॥ পুলিশ আজ আটঘাট বেঁধে এসেছে—এখানে থাকলে তোমাদেরও জড়াবে—আমি যাই—

মঃ মা ॥ না মণ্ডল—তুমি ধরা দেবে না।

ভু ॥ তাহলে কি চাও—আমার জন্য পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিক ঐ নিরীহ মানুষগুলো ? পুলিশ বলবে—হাঙ্গামা থামাতে আত্মরক্ষার জন্যে তারা গুলি চালিয়েছে।

মঃ মা ॥ না—হাঙ্গামা হবে না, গুলিও চলবে না। তুমি এখানেই থাক—

ভু ॥ কিন্তু তাতে করে তোমরা শুধু শুধু বিপদে জড়িয়ে পড়বে—

মঃ মা ॥ শোন, পুলিশ তোমাকে চেনে না তো ?

ভু ॥ চেনে না বলেই তো মনে হয়—

মঃ মা ॥ পুলিশ আর একজনকে চেনে না—ঐ শ্রীপতি আর কানাইও তাকে কোনদিন দেখেনি—

ভু ॥ কার কথা বলছ তুমি ?

মঃ মা ॥ আমার জামাই !

রা ॥ মাসী তুমি এই সময় কি মস্করা শুরু করলে ?

মঃ মা ॥ আঃ চুপ কর রাখাল ! শোন মণ্ডল, তুমি—তুমি আমার—

ভু ॥ কি বলছ ময়নার মা ?

[শ্রীমন্ত দৌড়ে ঢোকে]

শ্রী॥ পুলিশ নিবারণ কাকার বাড়ীর কাছে এসে পড়েছে। হারান দাসের বাড়ী কোনটা সকলকে জিগ্যেস করছে। কেউ বলছে না, কিন্তু তাতেও মনে হয় দু-তিন মিনিটের মধ্যে এখানে এসে পড়বে। যা করার তাড়াতাড়ি করো।

মঃ মা॥ এখন আর কিছু করবার সময় নেই মণ্ডল—

ভু॥ কিন্তু এ হয় না ময়নার মা—

মঃ মা॥ কেন হয় না?

ভু॥ এতে বিপদ উদ্ধার না হতেও পারে। সকলে মিলে একসঙ্গে ধরা পড়তে পারি—

মঃ মা॥ কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি মণ্ডল?

ভু॥ তুমি পারবে ময়নার মা? কাল সকালে হয়ত সারা গাঁয়ে রটে যাবে ব্যাপারটা, তোমার আত্মীয় কুটুম্ব জানবে। ময়নার শ্বশুর বাড়ীর লোক—তোমার জামাই—

মঃ মা॥ তারা বুঝবে না, কেন আমি এ কাজ করেছি? তাদের সকলকে বোঝাব।

ভু॥ সবচেয়ে বেশি করে ভাবতে হবে তোমার মেয়ের কথা। অতটুকুন মেয়ে। তার মনের ওপর যে চাপটা পড়বে—

মঃ মা॥ মণ্ডল এত কিছু ভাবতে পারছি না আমি—আমি শুধু বুঝি তোমাকে বাঁচাতে হবে—ময়না আর কিছু বুঝুক আর না বুঝুক এটুকু তো বুঝবে মণ্ডলকে বাঁচান দরকার আমাদের নিজেদের জন্যেই—ওকে আমি চিনি, ও ঠিক পারবে—তুমি ওর বাপের মত। কিরে ময়না পারবি না মা? পারবি না? একটু আগে যে তোকে মেয়ে বলেছে—পারবি না? দরকার হলে তার সঙ্গে একঘরে ঢুকতে? পারবে—ও পারবে। আর দেরি নয়—রাখাল শ্রীমন্ত তোরা যা। গফুর, নিতাই আর দুচারজন যাদের দরকার মনে করবি ব্যাপারটা জানিয়ে দিবি। যখন যার ডাক পড়বে সে যেন পুলিশের সামনে বলে ঐ আমার জামাই—তোরা কি বলবি ঠিক করে নে—যা—তৈরী হ।

ম॥ কিন্তু—

মঃ মা॥ আঃ যা বলছি কর—। (রাখাল ও শ্রীমন্ত বেরিয়ে যায়) ময়না,

যা তো মা প্যাটরা থেকে সিল্কের শাড়ীটা বার করে—সিঁথেয় ভাল করে সিঁদুর দে—কপালে টিপ পর—একটু সেজেগুজে নে মা—শোন—লজ্জা দেখাবি, মাথায় ঘোমটা দিবি, জামায়ের সামনে যেমন করিস—যা—(ময়নাকে ঘরের ভেতরে ঠেলে দেয়)

ভু॥ কত বড় ঝুঁকি যে তুমি নিচ্ছ ময়নার মা! ঐ বুড়ো লোকটাকে নিয়ে না টানাটানি করে—

মঃ মা॥ করলেই বা কি? ওর থেকে কিছু বার করতে পারবে না—

নি॥ আসছে—আসছে—

মঃ মা॥ যাও ভিতরে যাও—শোন মণ্ডল তোমার নাম জগমোহন হাঁসদা—বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ী হাতীনাড়া, থানা গৌরপুর। যাও ঘরে যাও। আয় নিতাই। (মা ও নিতাই চলে যায়)।

[মন্মথ, দারোগা, শ্রীপতি ও কানাই ঢোকে, সঙ্গে কনষ্টেবল]

মন্মথ॥ ওঃ—ওই বোবা হাবা চাষীগুলো পর্যন্ত এখন তুখোর হয়ে উঠেছে—

শ্রীপতি॥ তবে আর বলছি কি? বোবা হাবা আর নেই ওরা—আর কিছু দিন বাদে ওরাই আমাদের মাথার ওপর পা দিয়ে হাঁটবে। হারান দাসের বাড়ীটা পর্যন্ত কেউ বলতে চায় না, বলে—কোন হারান দাস? যেন এ গাঁয়ে পঞ্চাশটা হারান দাস ঘুরে বেড়াচ্ছে! বেপরোয়া বুঝলেন—সব বেপরোয়া।

কানাই॥ আর শাঁখের আওয়াজ স্যার—ঘরে ঘরে বাজতে শুরু করল—যেন বেটারা আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে সব বসে ছিল!

ম॥ পেছন দিকটা পাহারাদার রাখা হয়েছে তো? বেড়া ডিঙিয়ে আবার না সটকে পড়ে—

শ্রী॥ কিছু ভাববেন না স্যার, সব দিক একেবারে বাঁধা। মাছিটি পর্যন্ত গলতে পারবে না।

ম॥ (কনষ্টেবলকে) ওদের লোকজন সব ঠেলে সরিয়ে দিয়েছ তো?

কা॥ কেউ নড়েনি স্যার। সব একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে গুজ গুজ ফুস ফুস করছে—

ম॥ হুঁ!

ম ॥ ভুবন মণ্ডল তাহলে এই বাড়ীতেই আছে।

শ্রী ॥ সেই রকমই তো খবর।

ম ॥ অনেকদিন নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছ চাঁদ। আজ কি করে পার পাও দেখি।

[বাঁদিক থেকে নিতাই ঢোকে]

ম ॥ এই যে, এটা কি হারান দাসের বাড়ী ?

নি ॥ কেন ?

ম ॥ যা জিগ্যেস করছি তার উত্তর দাও— এটা কি হারান দাসের বাড়ী ?

নি ॥ হ্যাঁ—

ম ॥ তুমি কে ? তুমি এ বাড়ীতে থাক ?

নি ॥ হ্যাঁ—আমার নাম নিতাই দাস—

ম ॥ অ—ওখানে কি করছিলে ?

নি ॥ আজ্ঞে ইয়ে—

ম ॥ ইয়ে মানে ? কি করছিলে ওখানে ?

নি ॥ আজ্ঞে ইয়ে—

ম ॥ তবু ইয়ে-ইয়ে করে— সন্দেহজনক—কি করছিলে বল ? কোন কিছু লুকোতে চেষ্টা করোনা। তাতে ফল খুব খারাপ হবে। বল ? চুপ করে থেকো না বল ?

নি ॥ আজ্ঞে বলতেই হবে ?

ম ॥ কি সাংঘাতিক ! তুমি মস্করা করছ নাকি ? শ্রীপতিবাবু, একবার দেখুন তো ও দিকটা গিয়ে—

শ্রী ॥ স্যার—কানাই, যাও তো—দেখতো—

নি ॥ এখন যাবেন না—যাবেন না—

ম ॥ তার মানে ?

নি ॥ এই মাত্র জায়গাটা নোংরা করে এলাম, এখনও ভিজে আছে জায়গাটা—

কা ॥ এ-হে-হে-হে—সন্দেহজনক। (নিতাই ভেতরে যাওয়ার জন্ত পা বাড়ায়)

ম ॥ দাঁড়াও—হারান দাসকে ডেকে দাও—

নি ॥ কেন ?

ম ॥ এ বাড়ী খানাতল্লাসী হবে—

নি ॥ কেন ?

শ্রী ॥ কেন ? সব কেনর উত্তর দাও ওকে।

নি ॥ আজ্ঞে দাদু তো খুব বুড়ো—তায় রোগা শরীর—

ম ॥ বাড়ীতে আর কে আছে ?

নি ॥ মা আছেন—

কা ॥ হ্যাঁ স্যার—ময়নার মা, সেই দুপুরবেলা ঝাঁটা হাতে—

ম ॥ তোমার মাকে ডেকে দাও—(নিতাই ভেতরে যায়) ছেলেটা ওদিকে কি করছিল ঠিক বোঝা গেল না। সন্দেহজনক। ওদিকে পাহারাদার—

শ্রী ॥ আছে স্যার আছে—কেউ গলতে পারবে না।

[ময়নার মা ঢোকে। পেছনে নিতাই]

মা ॥ এই যে, তুমিই ময়নার মা!

মঃ মা ॥ হ্যাঁ, দারোগাবাবু, তা অসময়ে আপনি—?

মা ॥ তোমার বাড়ীটা আমরা তল্লাসী করব—

মঃ মা ॥ কেন দারোগাবাবু ?

ম ॥ ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে!

মঃ মা ॥ ভুবন মণ্ডল ? সে আবার কে ? নাম তো শুনিনি কোনকালে—

ম ॥ বাজে চালাকি ছাড়। ঘরে আর কে আছে ?

মঃ ম. ॥ আমার বুড়ো শ্বশুর আছে—

ম ॥ আর ?

মঃ মা ॥ আর আমার মেয়ে জামাই আছে—

ম ॥ জামাই!

মঃ মা ॥ হ্যাঁ গো দারোগাবাবু! মেয়ের বিয়ে দিলাম বৈশাখে—তা দু ভরি রুপো কম দিয়েছি বলে জামাই আমার মেয়ের দিকে ফিরেও তাকায় না। এতদিনে টাকাটা জোগাড় করে পাঠাতে পারলাম, তাই না জামাই পায়ের

ধুলো দিয়েছে। কি বলব দারোগাবাবু—মেয়েটা কেঁদেই মরে—মেয়েটা যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি—আর আমি যত কাঁদি—

শ্রী॥ তা তোমার জামাই এত চুপি চুপি আসে কেন ময়নার মা?

ম: মা॥ চুপি চুপি আসবে কোন দুঃখে? সদর দিয়েই তো এসেছে। আপনার একটা মেয়ের সাতটা জামাই, তারা চুপি চুপি আসবে—

শ্রী॥ তাই না কি? তা সাতটা জামাই করার মুরোদ আছে? এক জামাইকেই ঘরে আনতে পার না—

ম॥ আঃ শ্রীপতিবাবু—শোন ময়নার মা, ঘরগুলো আমাদের একবার দেখতে দাও। ভুবন মণ্ডলকে যদি না পাই আমরা ফিরে যাব—তখন তোমার জামাইকে নিয়ে রাত কাটিও—

নি॥ তল্লাস করতে দেব না—

ম॥ কি বললে? (নেপথ্যে: তল্লাস করতে দেব না। রাখাল লাঠি হাতে ঢোকে। দারোগার একটু ভয় পেয়ে যায়।) আরে শোন শোন ময়নার মা—শোন। ওদের জানিয়ে দাও হাকিমের দস্তখতী পরোয়ানা নিয়ে এসেছি আমি হারানের ঘর তল্লাস করতে। তল্লাস করে আসামী না পেলে ফিরে যাব। এতে বাধা দেওয়া বা হাঙ্গামা করা উচিত নয়—বে-আইনী কাজ হবে সেটা—

রা॥ তাই বলে—মাঝরাত্তিরে—শুধু শুধু

ম: মা॥ এই চুপ কর—চুপ কর। (নেপথ্যের উদ্দেশ্যে) শোন তোমরা, হাঙ্গামা করো না। আমার ঘরে তো আজ আসামী নেই। চোর ডাকাত নাকি যে ঘরে আসামী রাখব? জামাই এসেছে—মেয়ে জামাই ঘরে আছে—দারোগাবাবু তল্লাস করতে চান করুন। ময়না—ওমা ময়না—জামাইকে একবার ডেকে দে তো মা—

রা॥ তোমার জামাই এসেছে, কই আগে বলনিতো মাসী?

ম: মা॥ কেন র্যা? বলতে হবে কেন তোকে? জামাই এসেছে ঢাক পিটোতে যাব নাকি? ভুবন-এর প্রবেশ) এসো বাবা এসো। ঘুম ভেঙে গেল বুঝি?

ম॥ এই কি তোমার নতুন জামাই নাকি?

কা॥ এ কি রকম জামাই দাদা! খোঁচা খোঁচা দাড়ি। এলোমেলো এক মাথা চুল। তোমার আজ বাইশ বছর বিয়ে হয়েছে, তোমাকে তো আজও দেখি শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সময় যেন নিতবরটি সেজে—

দ॥ তোমার নাম কি?

ভু॥ আজ্ঞে জগমোহন হাঁসদা—

দ॥ বাবার নাম—

ভু॥ সাতকড়ি হাঁসদা।

দ॥ বাড়ী কোথায়?

ভু॥ আজ্ঞে হাতীনাড়া, থানা গৌর পুর—

দ॥ হুঁ—আচ্ছা ময়নার মা, এ গাঁয়ে তোমার জামাইকে কেউ কেউ চেনে নিশ্চয় (দারোগা চুপি চুপি কনষ্টেবলকে কিছু বলে, সে বেরিয়ে যায়)

মঃ মা॥ চেনে বই কি! বিয়ের সময় যারা দেখেছে তারা কি আর চিনতে পারবে না? ঐ তো রাখাল রয়েছে—ও ও চেনে—

রা॥ চিনি মানে ভাল রকম চিনি—

দ॥ তোমার নাম কি?

রা॥ রাখাল পাত্র—

দ॥ তুমি একে সনাক্ত করছো—ময়নার মার জামাই বলে?

রা॥ শুধু সনাক্ত করছি? আজ এতদিন বাদে ওকে পেয়েছি—এমনি ছাড়ব নাকি?

দ॥ তার মানে? সন্দেহজনক—

রা॥ জানেন দারোগাবাবু—ওর সঙ্গে আজকের চেনা নয়। বিয়ের আগে আমার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধার করেছিল—শ্বশুরবাড়ীর দেশের লোক ও, দিয়েছিলাম, বলেছিল বিয়ের পর শোধ করে দেব—তা জামাইবাবুর পাত্তাই নেই। কি গো মাসী, তুমি বোধ হয় জানতে, তাই জামাই আসার খবরটা চেপে গিয়েছিলে আমার কাছে—বেশ বাবা—শাউড়ি জামাই ষড় করে আমার টাকা পাঁচটা মেরে দেবার মতলব!

মঃ মা॥ ছাখ্ রাখাল, আমার জামাইকে সবার সামনে—

ম ॥ আঃ চুপ কর তোমরা। সন্দেহজনক (পুলিশ শ্রীমন্তকে নিয়ে আসে) বুড়ো কাউকে পেলি না? যা হোক, তোমার নাম কি?

শ্রীমন্ত ॥ আজ্ঞে শ্রীমন্ত ঘড়ুই—

শ্রীমন্ত ॥ (মন্মথকে নোটবুকে নাম লিখতে দেখে খুব ভয় পেয়েছে—সেরকম ভান করে) আজ্ঞে খাতায় নাম লিখছেন কেন? নাম লিখছেন কেন?

ম ॥ শোন—

শ্রীমন্ত ॥ বলুন—

ম ॥ তুমি ময়নার মার জামাই—অর্থাৎ হারানের নাতজামাইকে চেন?

শ্রীমন্ত ॥ কে-কে-কে—কেন?

ম ॥ চেন?

রা ॥ এই ব্যাটা চিনিস না? বিয়ের সময় বাসর ঘরে জামায়ের গলা জড়িয়ে গান গাইলি—জামাই তোকে নেমন্তন্ন করলে—এখন বলছিস চিনি না—

শ্রীমন্ত ॥ আজ্ঞে চিনলে কি হবে?

রা ॥ হবে আবার কি?

ম ॥ কি—চেন?

শ্রীমন্ত ॥ আজ্ঞে দারোগাবাবু, থানায় নিয়ে যাবেন না তো?

ম ॥ না—না—তুমি শুধু বল—হারান দাসের নাতজামাইকে তুমি চেন কি না?

শ্রীমন্ত ॥ আজ্ঞে কিছু ভয় নেই তো?

শ্রীপতি ॥ ব্যাটা জ্বালালে তো—চিনিস্ কিনা তাই বল না বাবা—

শ্রীমন্ত ॥ আজ্ঞে ভয় না থাকলে চিনি, থাকলে চিনি না—

কা ॥ হা-হা-হা- বেশ বলেছে তো!

ম ॥ তাহলে তুমি চেন? আচ্ছা, ছাখ তো এই সেই লোক তো! ভাল করে দেখে বল।

শ্রীমন্ত ॥ ও আমি অনেক আগেই দেখে নিয়েছি আজ্ঞে, ওকে চিনবো না। ও-ও আমাকে বিলক্ষণ চিনেছে—দেখছেন না কেমন জুল জুল করে তাকাচ্ছে? তুমি তো খুব জামাই হে, তোমার দেশের তাড়ি খাওয়ার নেমন্তন্ন করলে—

ম॥ কি খাবার ?

শ্রীমন্ত॥ তাড়ি। আজ্ঞে ছি-ছি-ছি সে কথা কি আপনার সামনে বলতে আছে দারোগাবাবু ? এমন বাজে কথা বলে সব—বলে ভুবন মণ্ডলকে নাকি হারান খুড়োর উঠোনে বেঁধে রেখেছে—বড় দেখার ইচ্ছে ছিল লোকটাকে।—কোথায় সে ? এতো বাবা জগমোহন—বউকে ফেলে রেখে—আমি তাহলে যাই দারোগাবাবু—

[শ্রীমন্ত চলে যায় ও পুলিশ হারানকে নিয়ে আসে। শ্রীকান্ত বেরিয়ে যায়]

ম॥ এই যা—ভেতরে গিয়ে বুড়োটাকে নিয়ে আয়—

মঃ মা॥ না—না দারোগাবাবু—ওকে আনবেন না—বুড়ো মানুষ ঘুমোচ্ছে—তাছাড়া ওর মাথার ঠিক নেই—আপনাদের দেখলে ও অস্থির হয়ে উঠবে—ওকে সামলানো যাবে না !

ম॥ গুঁতোর চোটে মাথা ঠিক হয়ে যাবে—যা—

মঃ মা॥ না—না ও থাক—আমি যাচ্ছি দারোগাবাবু আমি নিয়ে আসছি তাকে—আপনারা একটু সরে দাঁড়ান—পুলিশ দেখলে—

ম॥ ঠিক আছে—ঠিক আছে—নিয়ে এসো তুমি—(ময়নার মা ভেতরে যায়) কিছু গণ্ডগোল আছে মনে হচ্ছে—

কা॥ বুড়োর মাথাটা কিন্তু সত্যিই খারাপ স্যার—সেই সেবার ময়নার বাবা গুলি খেয়ে মারা গেল—আপনি তখন এ থানায় আসেননি—

ম॥ দেখাই যাক্ না—সুস্থ মানুষেরা যখন কেউ সনাক্ত করছে না তখন—(হারানকে নিয়ে ময়নার মা ঢোকে) তুমি একটু নেমে এসো জামাই।

[ভুবন নেমে আসে। মন্মথ একটু সরে দাঁড়ায়]

হা॥ নিতাইটা ফেরেনি এখনো ? এঁ্যা নিতাইটা— (ভুবনকে দেখে) কে ? ওখানে কে দাঁড়িয়ে ? সনাতন—সনাতন ফিরে এসেছে বউ—সনাতন ফিরে এসেছে—বড্ড খাটুনি গেছে বাবা—সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে তোর—একি—এতো ঘাম নয় রক্ত—সারা গা বেয়ে রক্ত ঝরছে—জল নিয়ে এসো বউ ধুইয়ে দাও— (হঠাৎ মন্মথকে দেখে) সরে যা—সনাতন—সরে যা—গুলি করবে, তোকে গুলি করবে ! ওকে মেরো না—ওর সব রক্ত ঘাম হয়ে ঝরে গেছে—আমাকে মার তোমরা—আমাকে

ও-হো-হো—সনাতন মাটিতে পড়ে গেল বউ—ও ছটফট করছে—ওর বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে—সনাতন—সনাতন— (কান্নায় ভেঙে পড়ে)

মঃ মা ॥ চল বাবা ভেতরে চল—

হারান ॥ এঁ্যা ? নিতাই ফিরেছে মাঠ থেকে ? নিতাই—

মঃ মা ॥ হ্যাঁ বাবা ফিরেছে—ময়না—যা ভেতরে শুইয়ে দিগে যা—(ময়না হারানকে নিয়ে ভেতরে যায়)

ম। কি কাণ্ড ! কানাই তুমি যাও তো—বাইরে থেকে বুড়ো কাউকে ধরে নিয়ে এসো, চাষীগুলো বড় সেয়ানা। যাও দেখো আবার মাথা পাগল না হয় (কানাই চলে যায়)

রা ॥ তোমার জামাইকে ওরা সন্দেহ করছে কেন গো মাসী !

মঃ মা ॥ তা সন্দেহ হয় বৈকি, নতুন জামাই এলো একমুখ দাড়ি, মাথা ভর্তি চুল—

ভু ॥ তাহলে কথাটা বলেই ফেলি—বুঝলেন দারোগাবাবু—ঐ গোরেণের হাটে এসেছিলাম, তা ঠাকরুণ ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠালে মেয়ে নাকি মরমর, এখন যায় তখন যায়—

ম ॥ ও তাই তুমি ছুটে এলে ?

ভু ॥ আসবো না ? বলেন কি দারোগাবাবু ! আমাকে কি এতই বোকা পেয়েছেন ? বিয়ের সময় সোনারুপো যা দেবে বলেছিলো কিছুই তো ঠেকায়নি। মরে গেলে গা থেকে গয়নাক'টা খুলে নিলে আর কিছুর হদিস পাব মনে করেছেন—

ম ॥ বাঃ—হিসেবী লোক বটে তো তুমি !

ভু ॥ কিন্তু এখন দেখছি, এসেই ভুল করেছি। এদিকে পাওনাদার ও দিকে আবার হাঙ্গামার ভয় ? কে এক ভুবন মণ্ডল তার ঠিক নেই, তার জন্যে গাঁশুদ্ধ লোকের এত মাথাব্যথা কিসের বুঝিনা। আমায় আবার এসবের মধ্যে জড়াবেন না যেন দারোগাবাবু—থানা পুলিশে আমার বড় ভয়—ওদিকে বাড়ীতে বলে আসিনি—বাবা মাও হয়তো ভাবছেন—

ম ॥ হুঁ—

[কানাই একজন থুরথুরে বুড়োকে নিয়ে ঢোকে]

কা ॥ একজনকে এনেছি স্যার!

বৃদ্ধ ॥ কি হোল গো! কোথায় নিয়ে যাচ্ছ! কি হোল গো! কে গা তুমি!

মঃ মা ॥ আমি ময়নার মা!

ম ॥ ময়নার মাকে যখন চেনে—ময়নার বরকেও চিনবে নিশ্চয়ই! ও বুড়ো, ময়নার মা'র জামাইকে চেন তুমি?

বৃদ্ধ ॥ তোমার শ্বশুর কেমন আছে?

ম ॥ কথার উত্তরই দেয় না যে! ও বুড়ো—হারান দাসের নাতজামাইকে চিনতে পার!

মঃ মা ॥ কেন মিছিমিছি জিগ্যেস করছেন দারোগাবাবু! ও কিছুই শুনতে পাচ্ছে না!

ম ॥ বদ্ধ-কালা নাকি! (কাছে গিয়ে ঝাঁকানি দেয়) একে চিনতে পারছ? (বৃদ্ধ ঘুরে হাসে)

বৃদ্ধ ॥ হায় ভগবান!

কা ॥ ও দাদা! বুড়ো কাকে দেখে হাসছে বলো তো!

ম ॥ নাঃ—একে দিয়ে কোন আস্থা নেই।

মঃ মা ॥ আপনাকে তো বললাম দারোগাবাবু—ও কানেও শোনে না—আর চোখেও দেখে না, রাতের বেলা মেয়ে কি ছেলে তাই চিনতে পারবে না তো জামাই চিনবে?

বৃদ্ধ ॥ হ্যাগা গাঁয়ের সব লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কেনো? কি হয়েছে? হারামজাদা পুলিশগুলো গাঁয়ে ঢুকে হামলা করেছে বুঝি? আমার সে বয়েস নেই—না হলে এই লাঠির ঘায়ে—

ম ॥ এই যা—যা, নিয়ে যা ওটাকে—খুব লোককে ধরে এনেছো কানাই!

বৃদ্ধ ॥ (যেতে যেতে) যখন তখন এসে হামলা করবে—বদমাশগুলো পেয়েওছে মগের মুল্লুক…(বৃদ্ধ বেরিয়ে যায়)

ম ॥ কি বলছেন শ্রীপতিবাবু—

শ্রীপতি ॥ আমি বলি কি স্যার…

ম ॥ হ্যাঁ—সন্দেহের যুক্তিতে ওকে গ্রেপ্তার করা চলে। কিন্তু তাতে কোন লাভ

হবে না, বুঝলেন শ্রীপতিবাবু। তাছাড়া বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছেন? মাঠ ভর্তি লোক, ভুবন মণ্ডলকেই যখন পেলাম না তখন শুধু শুধু একটা হাঙ্গামার মধ্যে যাওয়া—

কা॥ হ্যাঁ স্যার—চাষীগুলোর কেমন যেন মরিয়া ভাব।—ওরা হয়তো জামাই-টামাই চিনবে না, ভেবে বসবে যে ভুবন মণ্ডলকেই হয়তো গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তখন—

শ্রী॥ এক কাজ করুন স্যার, একবার ঐ মেয়েটাকে ধমকে ধামকে দেখুন তো! যদি কোন চালাকি থাকে তাহলে ও হয়তো ফাঁস করে ফেলতে পারে— (ময়না ফুঁপিয়ে কাঁদে)

ম॥ আরে ও তো এমনিতেই কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে—

কা॥ তা তো কাঁদবেই স্যার—ঐ চাষাড়ে হাতের আদর কি আর ঐ নরম গায়ে—দারোগাবাবুর চোখ দুটো দেখছেন দাদা? একে তো পেট থেকে মালের বুজকুড়ি উঠছে—তার ওপর—(মন্মথ ময়নার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়)

ম॥ এই শোন—যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও—

মঃ মা॥ এ কিন্তু কানে ঠিক শোনে দারোগাবাবু—

ম॥ তার মানে?

মঃ মা॥ মানে এত কাছে এসে কথা বলার দরকার নেই। দূর থেকে বললেও সব কথা ওর কানে যাবে—

ম॥ হুঁ—বুঝলাম তা—

ভু॥ তাছাড়া দারোগাবাবু, ঐ-সব গন্ধ একেবারে সহ্য করতে পারে না—ওর বমি আসে—

ম॥ কি বলছ কি?

ভু॥ আজ্ঞে আপনার মুখ থেকে একটা গন্ধ বেরোচ্ছে—আমাদের অভ্যেস আছে—কিন্তু ও—মানে আর একটু দূর থেকে—

ম॥ হুঁ—(মন্মথ দূরে সরে যায়) হ্যাঁরে ছুঁড়ি—এ তোর ভাতার তো?

কা॥ খালি কাঁদে ছাখ—সোয়ামী এসেছে—হাসবে তা নয়—

মঃ মা ॥ তা কান্না আসে বই কি। অতটুকুন মেয়ে, এত দিন বাদে জামাই এলো, মাঝরাতে পুলিসের হামলা, আমারই বলে বুক ধড়ফড় করছে। ও মা ময়না, যা ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়। শীতের কাঁপুনি ধরেছে, যা—(ময়না ভেতরে যায়) তুমি যাও বাছা এবার শুয়ে পড় গিয়ে! আপনি অনুমতি করুন দারোগাবাবু, জামাই গিয়ে শুয়ে পড়ুক। কত মানত করে, কপাল কুটে এনেছি জামাইকে, আপনাকে কি বলব দারোগাবাবু। দারোগাবাবু—

ম ॥ উঁ—

মঃ মা ॥ জামাই ভেতরে যাক—

ম ॥ হ্যাঁ, তুমি যেতে পার—

মঃ মা ॥ যাও না বাছা, গুরুজনের কথা শোন, শুয়ে পড়। দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে? হ্যাঁ, ঝাঁপটা ভাল করে বন্ধ করে দিও। (ভুবন ভেতরে যায়) এই রাখাল যা—একেই তো জামাই আমার গোঁয়ার, তায় এই সব দেখে আবার বিগড়ে না যায়—আয় নিতাই। (ময়নার মা ও নিতাই ঘরে যায়। রাখাল বাইরে চলে যায়)

কা ॥ ঝাঁপ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল যে দাদা—

শ্রী ॥ তাই তো দেখছি—স্যার—তাহলে—

ম ॥ তাহলে আর কি! এবারেও ফস্কে গেল ভুবন মণ্ডল? আমরা এ দিকটা ঘিরেছি ও হয়তো এ দিকেই আসেনি। কোথা থেকে যে সব খবর আনেন। চলুন। (চলে যায়)

শ্রী ॥ তাহলে কি ব্যাটা শুল দিল? ওঃ এই শীতে মাঝরাতে কি ভোগান্তি বল্ দেখি—

কা ॥ জামাই ব্যাটা তো ঝাঁপ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল, এদিকে আমার বউটা একা একা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে বোধ হয়।

শ্রী ॥ তুই আবার বিয়ে করলি কবে? তুই তো ওই মুড়িউলির ঘরে পড়ে থাকিস!

কা ॥ ওই হোল দাদা, ওই আমার বউ। চল—কি হোল?

শ্রী ॥ আচ্ছা কানাই, ও ঠিক জামাই তো?

কা। তোমার এখনও সন্দেহ আছে, চোখের সামনে মেয়ে-জামাইকে একঘরে ঢুকিয়ে দিল, তবুও—

শ্রী। না রে ওদের কিছু বিশ্বাস নেই, নেতাগুলোর জন্তে ওরা সব পারে—

কা। তার মানে তুমি বলছ, ময়নার যা জামাই নয় জেনেও ওর মেয়ের সঙ্গে আর একজনকে, ধ্যাৎ! সে কখনও হয় নাকি? নেতা হলেও মানুষ তো, ওরা কি ব্রহ্মচারী নাকি! একটা ভয় ডর নেই?

শ্রী। ব্রহ্মচারী না হোক তোর মত আদেখ্‌লে নয়।

কা। তার মানে?

শ্রী। তুই মেয়েটার দিকে অমন দেখছিলি কেন?

কা। সে তো তুমিও দেখছিলে দাদা—

শ্রী। আমি—আমি দেখছিলাম দারোগা দেখছে কিনা—

কা। আমি দেখছিলাম—তুমি দেখছ না?

শ্রী। বড় ফাজিল হয়েছিস তুই—বোতলটা বার কর—

কা। বোতল?

শ্রী। হ্যাঁ—চ্যাপ্টা, যেটা কেনা হোল দারোগাবাবুর জন্তে—

কা। তা সে তো দারোগাবাবুর কাছেই—

শ্রী। বোতল শুদ্ধু ধরে দিয়েছ? ওঃ শালার কাজও হোল না, বাবুর কাছে কথাও শুনতে হবে, আবার এদিকে বোতলের পেসাদও একটু পেলাম না। তুই তো জানিস দারোগাটা একটা পাঁড় মাতাল—বোতলটা ওর হাতে দিলি কেন? সিগারেটের প্যাকেটটা—

কা। ওটা আছে। এই যে—(সিগারেটের প্যাকেট বের করে শ্রীপতিকে দেয়)

শ্রী। তবু যা হোক বুদ্ধি করে এটা কাছে রেখেছ। (দারোগা ঢোকে) কি হোল স্যার? কোন নতুন খবর?

দ। না, সিগারেটের প্যাকেটটা—ও এই তো—(প্যাকেট শুদ্ধ নিয়ে নেয়) আসুন (দারোগা চলে যায়)

শ্রী। কানাই—

কা। দাদা—

শ্রী ॥ একটা বিড়ি দে (কানাই বিড়ি বের করে দেয়)

কা ॥ এই যে—

শ্রী ॥ ধরিয়ে দে—দেশলাইটা কোম্পানীর খরচায় কেনা হয়েছে না ? দে—
(দেশলাইটা কানাইয়ের হাত থেকে নিয়ে চলে যায়)

কা ॥ শালা—(কানাইও ছুটে বেরিয়ে যায়)

[চাষীর দল ঢোকে। ঘরের ভেতর থেকে ভুবন, ময়নার মা, ময়না, নিতাই সকলে ঢোকে। গান]

—গান—

আইলো ঐ আইলো রে দিন সর্বহারার
কাস্তে শাণাও কিষাণ ভাইরে মজুর ধর হাতিয়ার।
আর কতকাল রইবি পড়ে মরণের এই আঁধার ঘরে
এবার লাগতে হবে নতুন করে কোমর বেঁধে হও তৈয়ার ॥

মথুর ॥ (নেপথ্যে) বাঁচাও—মণ্ডল বাঁচাও।

[ছুটে ঢোকে মথুর। পেছনে লাঠি উঁচিয়ে গফুর]

গফুর ॥ শালা চণ্ডী ঘোষের পা-চাটা কুকুর, মণ্ডলকে মারবার ফাঁদ পেতেছিলি না তুই—এখন মণ্ডল বাঁচাবে তোকে ? দালালের বাচ্ছা, লাঠির ঘায়ে মাথা গুঁড়িয়ে দোব তোর।

ভু ॥ গফুর ! কি হয়েছে ?

গ ॥ ওকে জিগ্যেস কর মণ্ডল, ও বলুক কে খবর পৌছে দিয়েছে চণ্ডী ঘোষের ওখানে ? পুলিস কি করে খবর পেলো আজ তুমি রাতে এখানে থাকবে ! ভেবেছিলি কেউ টের পাবে না, না ? এখন কে বাঁচাবে রে তোকে ! ঘোষের পো না থানার দারোগা ?

ভু ॥ থাম গফুর ! মথুর—খবর কি তুমি পৌছে দিয়েছ ?

মা ॥ আমাকে মাপ কর মণ্ডল—আমাকে মাপ কর—আমি ভুল করেছি।

গ ॥ ভুল করেছি—শালা খালি ওৎ পেতে থাকত কোথায় কি খবর পাওয়া যায়, চণ্ডী ঘোষের কাছে পৌছে দেবে। কেনরে শালা তুই কি চণ্ডী ঘোষের কেনা গোলাম ? তুই কি চাকরি করিস্ ঐ শ্রীপতি-কানাইয়ের মত ?

ভু ॥ বল মথুর—কেন এমন কাজ কর তুমি? চাষীরা যেখানে একজোট হয়ে লড়ছে—সেখানে চাষীদের শত্রু ঐ চণ্ডী ঘোষের –

মথুর ॥ তুমি বিশ্বাস কর মণ্ডল—কুঁড়েটাকে বাঁচাবার জন্ম! আমার সব গেছে—দেনার দায়ে সব বিকিয়ে গেছে মহাজনের কাছে। কুঁড়েটা বন্ধক আছে চণ্ডী ঘোষের কাছে—ছাড়াতে পারব না—পথে দাঁড়াতে হবে। চণ্ডী ঘোষ আমাকে লোভ দেখালে। শ্রীপতি-কানাই আমাকে ভুল বোঝালে—

রা ॥ আর তুই মণ্ডলকে পর্যন্ত ধরিয়ে দিতে গেলি? একবারও ভাবলি না—মণ্ডল ধরা পড়লে চাষীদের লড়াইয়ের কি ক্ষতি হবে?

মথুর ॥ আমার মাথার ঠিক ছিল না রাখাল—

রা ॥ শালা দেনার দায়ে বিকিয়ে যায়নি কে? মহাজনের কাছে খৎ কার না আছে?

শ ॥ চণ্ডী ঘোষ ওকে রাজা করে দিত। সব খত ফেরত দিয়ে মাথায় তুলে নাচত। বুদ্ধু কোথাকার।

রা ॥ ফেরত দিলেই বা কি হোত—আবার তো যেত। জোতদারের দয়াতে চাষী বাঁচতে পারে না, চাষীকে বাঁচতে হবে লড়াই করে। তাই সব খুইয়ে লড়াইয়ে নেমেছি—সব হারিয়ে এক জোট হতে পেরেছি—ওই ভাবে বাঁচা যায় নারে মথ্‌রো, ওই ভাবে বাঁচা যায়না।

ভু ॥ কেঁদো না মথুর—রাখাল ঠিক কথাই বলেছে। নিজেকে আলাদা করে ভেবো না—একা বাঁচতে যেও না—তাহলে মুখ থুবড়ে পড়বে। যখন তুমি একা তখন তুমি দুর্বল—অসহায় জোতদারের হাতের পুতুল—যখন তুমি সবার একজন তখন তোমার ভীষণ জোর—

মথুর ॥ চণ্ডী ঘোষ খুন করবে আমাকে, নিশ্চয়ই ভাববে যে আমি মিথ্যে খবর পাঠিয়েছি—আমি—

ভু ॥ ভয় পেয়ো না মথুর—যত ভয় পাবে ততই ওরা কামড় বসাবে। তোমার পেছনে এরা আছে—তোমার ওপর হামলা হলে এরা একসঙ্গে রুখে দাঁড়াবে। কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল। এবার তো আমাকে যেতে হবে।

রা ॥ যাবেন ? আজ খুব মজা হোল যা হোক মণ্ডল—

ভু ॥ মজাই বটে ! তবে এর থেকে একটা জিনিস বুঝলাম রাখাল, আমি ধরা পড়লেও লড়াই ঠিক চলবে। আর সে লড়ায়ে তোমরাই জিতবে। যে ভাবে পুলিসের সঙ্গে মোকাবিলা করলে তোমরা—চলো নিতাই আমাকে চড়কডাঙ্গার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও—

নি ॥ দেখিয়ে দোব মানে, আপনাকে ওই গাঁয়ে পৌছিয়ে দিয়ে আসি চলুন।

ভু ॥ এই নাও ময়নার মা তোমার জামাই সাজবার চাদর—

মঃ মা ॥ ওটা রাখলে পারতেন, ভোরবেলা, শীতের হাওয়াটা—

ভু ॥ আরে না না, শীত কোথায় ? ওসব আমার অভ্যাস আছে। চলি গো রাখাল, শ্রীমন্ত—গফুর। আজকের রাতটার কথা সকলেরই মনে থাকবে, কি বল ? চলি গো মেয়ে—

ম ॥ আবার আসবেন—

ভু ॥ এঁ্যা, বলে কি মেয়ে ? আসব রে আসব তোর যত্ন নিতে আবার আসতে হবে বৈকি। চলি গো ময়নার—না ময়নার মা কেন, তোমাকে শুধু 'মা' বলে ডাকতে ইচ্ছে করে, চলো নিতাই—(নিতাই ও ভুবন বেরিয়ে যায়)

রা ॥ আমরাও চলি গো মাসী—

মঃ মা ॥ আয়—

রা ॥ কি ভাবছ ?

মঃ মা ॥ উঁ ? না। কিছু না—

রা ॥ ভাবছ—বিপদ তো উদ্ধার হোল কিন্তু তোমার জামাই যখন শুনবে—তখন সে আবার কি না কি মনে করে বসে ? এদিকে থানাতেও খবরটা পৌছবে ঠিকই, তখন দারোগাবাবু তোমার ওপরই আবার শোধ তুলতে না আসে। তুমি কিছু ভেবো না মাসী—সমস্ত গাঁ তোমার পিছনে রইলো—

ময়না ॥ মা গো—

মঃ মা ॥ উঁ—

ম ॥ চল।

মঃ মা ॥ হাঁ চল—বাবা শুয়েছে?

ম ॥ হ্যাঁ—

মঃ মা ॥ চল—ভোর হতে তো আর বেশি বাকী নেই, একটু ঘুমিয়ে নিবি।

[ময়নার মা ও ময়না ভেতরে চলে যায়। আস্তে আস্তে ভোর হয়। জগমোহন ঢোকে একটা ছুরি দিয়ে নিমডাল ছুলতে ছুলতে। একটু পরে দাঁতন করতে করতে সে রাগত ভাবে পায়চারি করতে থাকে। সকাল। শ্রীমন্ত ঢোকে]

শ্রীমন্ত ॥ আরে? জগমোহন! কি ব্যাপার—এতদিন বাদে একেবারে ভোরবেলা—অ! খবরটা পেয়ে গেছো তাহলে? সত্যি জগমোহন শাউড়ি পেয়েছিলে বটে একখানা!

জগ ॥ নিজের হলে বুঝতে!

শ্রীমন্ত ॥ বুঝতাম মানে? বর্তে যেতাম গো বর্তে যেতাম! সাত গাঁয়ের লোক একডাকে চেনে—ময়নার মা! কে? না দুপুর বেলা ঝাঁটা মেরে পুলিস তাড়িয়েছিল। ময়নার মা! কে? না রাতদুপুরে পুলিশকে বুদ্ধু বানিয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে দিয়েছে—সত্যি বলছি জগমোহন, অমন একখানা শাউড়ী আমার হলে না—গর্বে আমার বুক ফুলে উঠতো—আর ময়না—! তোমার অমন খাসা বউ—

জগ ॥ মেলা বোকো না—

শ্রীমন্ত ॥ তাহলে—এবারে ময়নাকে ঘরে নিয়ে যাবে বলেই এসেছো? খুব ভাল কথা—তোমার বাপের তাহলে সুমতি হয়েছে—

জগ ॥ কেন ফ্যাচফ্যাচ কোরছো—ভাগো তো—

শ্রীমন্ত ॥ তোমার বাবা জানে তো তুমি এখানে এসেছো—নাকি একটা খবর পাঠিয়ে দোব—ঘরদোর গুছিয়ে রাখ—জগমোহন বউ নিয়ে ঘরে ফিরছে—

জগ ॥ হাট্। (ছুরিটা সামনে ধরে)

শ্রীমন্ত ॥ ও বাবা! ছোরাছুরি কেন? এতো ভাল কথা নয়—তোমার ভাবসাব দেখেও ভাল বলে মনে হচ্ছে না—যাই সকলকে খবরটা জানিয়ে রাখি। এতো ভাল কথা নয়—(শ্রীমন্ত বেরিয়ে যায়।)

ময়না ঢোকে। জগমোহনকে দেখে লজ্জায় ভেতরে যায়। মঃ মা ঢোকে)

মঃ মা ॥ কতক্ষণ এসেছ বাবা তুমি? একটা খবর দিতে হয়—দেখদিকিন বাইরে দাঁড়িয়ে আছ—ও ময়না, চৌকিটা দে-না, তারপর বেয়াই বেয়ান সব ভাল তো বাবা—

জগ ॥ ভাল—

মঃ মা ॥ তার চেয়ে এক কাজ কর, ময়না জল এনে দে—আগে বরং হাত মুখ ধুয়ে নাও—

জগ ॥ না বসব না, এখুনি চলে যাব—

মঃ মা ॥ চলে যাবে?

জগ ॥ হ্যাঁ, একটা কথা শুনলাম—সেটা মিছে কি সত্যি তাই জানতে এলাম—

মঃ মা ॥ কি কথা বাবা—?

জগ ॥ কাল রাতে ময়না নাকি কার সঙ্গে শুয়েছিল?

মঃ মা ॥ ও মা, সে কি কথা! কার সঙ্গে আবার শোবে? আমার সঙ্গে শোয় ময়না, কাল রাতেও তাই শুয়েছিল—

জগ ॥ পৃথিবীশুদ্ধু লোক জানে আপনার মেয়ে আর একজনের সঙ্গে শুয়েছিল। আর আপনি জানেন না? সকলে চোখে দেখে গেছে—ঝাঁপ দিয়ে মেয়ে আর একজনের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছে—

মঃ মা ॥ ও সে তুমি জানো না বুঝি বাবা—

জগ ॥ কি জানব? এতে জানাজানির কি আছে?

মঃ মা কাল রাতে হঠাৎ পুলিশ এসে হাজির—হাটতলাটা একেবারে ঘিরে ফেলল, মণ্ডল ছিল এখানে। পালাবার পথ নেই, পুলিশের কাছে লুকোতে মণ্ডলকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম—

রা ॥ মেয়ের ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। বাঃ—

মঃ মা ॥ আহা, আগে শোনই না আমার কথাটা! মেয়ের ঘরে ঢুকতেই তো পুলিশের সন্দেহ ঘুচল!

জগ ॥ কি রকম?

মঃ মা ॥ পুলিশকে বোঝালাম, মণ্ডল আমার জামাই—

জগ ॥ ও—তাকে জামাই বানিয়ে ফেললেন? তা বেশ তো ভাল কথা, সুবিধে মত যাকে তাকে যখন জামাই বানিয়ে ফেললেন, তখন আমাকে আর দরকার নেই বলুন!

মঃ মা ॥ ও মা, সে আবার কি কথা! সে একটা মিথ্যে করে—

জগ ॥ মিথ্যে করে! জামাই সাজালেন মিথ্যে করে, ঘরে ঢোকালেন মিথ্যে করে, মেয়ে তার সঙ্গে একঘরে রাত কাটাল মিথ্যে করে—

মঃ মা ॥ রাত কাটালে আবার কখন? পুলিশ চলে যেতেই তো—

জগ ॥ কিন্তু ঝাঁপ বন্ধ করে শুয়েছিল তো?

[ময়না এসে খুঁটি ধরে দাঁড়ায়]

মঃ মা ॥ তুমি অত অবুঝ কেন বলতো? বলছি না—

জগ ॥ আপনি নিজেই তো বললেন—

মঃ মা ॥ তাতে দোষের কি হোল?

জগ ॥ দোষের নয়?

মঃ মা ॥ তুমি নিজে মন্দ তাই অপরকেও মন্দ ভাব—

জগ ॥ তার মানে?

মঃ মা ॥ উঠোন ভর্তি লোক—আমি সেখানে দাঁড়িয়ে, একদণ্ড ঝাঁপটা দিয়েছে কি না দিয়েছে অমনি দোষ ধরলে? কই অন্যেরা কেউ তো কিছু বলে নি?

জগ ॥ অন্যের আর কি? তারা তো মজা লুটবে—নিজের বৌ হলে বুঝতো!

মঃ মা ॥ বড় ছোট মন তোমার। আজকে মণ্ডলের সম্বন্ধে এমন কথা ভাবতে পারছ—কালতো জোয়ান ভাইটার সম্বন্ধেও ঐ কথা বলবে—

জগ ॥ ভাই আর মণ্ডল এক হোল? (ময়না ফুঁপিয়ে কাঁদে)

মঃ মা ॥ তুই শুধুশুধু কাঁদছিস কেন ময়না? বাপকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলি, বেশ করেছিস—তাতে কাঁদার কি আছে?

জগ ॥ বাপ নাকি?

মঃ মা ॥ বাপ নয়? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্ম দিলেই বাপ

হয় না; বুঝেছ, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাদের অন্ন দিয়েছে, সাহস জুটিয়েছে, একজোট বাঁধতে শিখিয়েছে, ধান কাটিয়েছে—না হলে চণ্ডী ঘোষ তো বেবাক ধান তার গোলায় তুলত! মণ্ডলকে বাঁচাতে গাঁ ভেঙে লোক ছুটে এল লাঠি দা হাতে নিয়ে মণ্ডলের জন্যে জীবন দেবে—আর আমি এইটুকুন করেছি তার জন্যে—এটা তুমি বুঝবে না?

জগ ॥ পাঁচজনে কানাকানি করবে, রসিকতা করবে—আমার বাবা মা-ই বা কি মনে করবে—যে ঘরের বৌ!

মঃ মা ॥ তুমি তাদের বোঝাবে! তুমি যদি বোঝ তাহলে শত্তুরে কি বলে—ওকি, তুমি চললে নাকি? এত দিন বাদে এলে—অন্তত একটা দিন থেকে যাও। জামাই এলো আবার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল. লোকে ভাববে কি?

জগ ॥ লোকে কি ভাববে সে কথা মনে থাকলে আপনি কি আর—

[ছুটতে ছুটতে শ্রীমন্ত ঢোকে]

শ্রীমন্ত ॥ মাসী—মাসী—এই যে মাসী—নিতাই ধরা পড়েছে—

মঃ মা ॥ সে কি! মণ্ডল—

শ্রীমন্ত ॥ না মণ্ডল ঠিক পৌঁছে গেছে—ফিরতি পথে একলা পেয়ে নিতাইকে ধরেছে পুলিশ, সব জেনে গেছে ওরা—আমি চলি—খবর পেলাম ওরা আসতে পারে—সকলকে খবরটা পৌঁছে দেওয়া দরকার—(শ্রীমন্ত ছুটে চলে যায়)

মঃ মা ॥ ছেলেটা ধরা পড়ল? এদিকে মেয়েটা কাঁদে। ওদিকে বুড়ো শ্বশুর খবরটা শুনলে—আমি যে কি করি—পুলিশের সঙ্গে, জোতদারের সঙ্গে লড়াই চলে—কিন্তু অবুঝ জামাইকে কি করে বোঝাই—(মঃ মা ঘরের ভেতরে যায়)

ময়না ॥ ঘরে আসবে না?

জগ ॥ আমার আর ঘরে যাবার দরকার কি? বেশ তো সুখেই আছ—সাজগোজেরও তো কমতি নেই—শুয়েছিলে তো?

ম ॥ মা কালীর দিব্যি শুই নি—মা বললেন বলে শুধু ঝাঁপটা ফেলেছিলাম বাঁশটা পর্যন্ত লাগাইনি—

জগ ॥ আ-হা-হা-ঝাঁপ ফেলেছিলে, আর ওতে বাকি রইলো? বেহুলা সতী—

ম ॥ তুমি বিশ্বাস করো মণ্ডল খুড়ো আমাকে মেয়ের মত—

জগ ॥ বাড়ীতে এত লোকজন আসে কেন?

ম ॥ কাল যে মিটিন ছিল। গাঁয়ের লোক সব একজোট হয়েছে চণ্ডী ঘোষের বিরুদ্ধে লড়বে বলে। মণ্ডল তো দশটা গাঁয়েই ঘুরে বেড়ায়। কাল আমাদের এখানে এয়েছেন, চলে যাওয়ার কথা ছিল—কিন্তু হঠাৎ দারোগা এসে পড়ল বলে—

জগ ॥ হুঁ—

ম ॥ তোমাদের ওখানে কোন গোলমাল হয়নি?

জগ ॥ হবে না কেন? জোতদার তো শালা সব জায়গাতেই আছে—

ম ॥ তোমরা লড়াই করছ না?

জগ ॥ করব না কেন? আমিও তো চাষার বাচ্চা, না কি?

ম ॥ আচ্ছা লাউগাছ যেটা পুঁতে ছিলাম সেটা এখন মাচায় ছড়িয়ে পড়েছে—লাউ হচ্ছে?

জগ ॥ হুঁ।

ম ॥ কালো গাইটা দুধ দেয় এখনো? (জগমোহন নীরব) নেই?

জগ ॥ বেচে দিয়েছি—শালী খেত যেন জলহস্তী—

ম ॥ আমাকেও বুঝি ঘরে নাও না তাই—তবে কেন আমাকে ফেলে রেখেছো এখানে? বিয়ে হোল—সোয়ামীর ঘর করতে পারি না। সবাই হাসে ঠাট্টা করে। দু ভরি রূপোর কি এতই—দাম! ওই রূপো কার গায়ে গয়না করে প্বরাবে?

জগ ॥ বাপের জন্যেই তো, বাপটা গোঁ ধরলে—সবাই হাসাহাসি করল—আমার মাথাতেও রক্ত চড়ে গেল—

ম ॥ কিন্তু তারপর? কতদিন কেটে গেল। একবারও কি মনে হোল না আমার কথা? বলো—কেন ঘরে নেবার কথা মনে হয়নি বলো।

জগ ॥ আমাদের ভাতে ভাগ বসাবে বলে, একদিন যাকে শ্বশুর ঘর থেকে দু ভরি রূপোর জন্যে বের করে দিয়েছি তাকে দুমুঠো ভাত দেবার ক্ষমতা নেই—একথা কেমন করে বোঝাতাম তোমাদের?

ম ॥ আজ যেই শুনেছ—বউ কার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে—অমনি বুঝি ছুটে এসেছ, বীরপুরুষ? এখন যদি কেউ খেতে দেবে বলে আর আমি তার সঙ্গে চলে যাই—তাহলে?

জগ ॥ খুন করে ফেলব।

ম ॥ বারে—যার সোয়ামী দুটো ভাতের জন্তে ঘরে-নেয় না সে কি উপোস করে থাকবে না কি—

জগ ॥ তুই আমার সঙ্গে যাবি কিনা?

ম ॥ এক্ষুণি—?

জগ ॥ হ্যাঁ, এক্ষুণি—শালা উপোস করে মরি তো দুজনে মরব—(চারদিকে শাঁখ বেজে ওঠে ও মঃ মা আসে) একি শাঁখ বাজছে কেন?

মঃ মা ॥ আবার আসছে ওরা।

জগ ॥ কারা আসছে?

মঃ মা ॥ পুলিশ। কাল রাতের শোধ তুলতে। তুমি বরং চলেই যাও বাবা—না হলে তোমাকে নিয়ে টানাটানি করবে। তোমার বাবা-মা আমায় দুষবে—

জগ ॥ না—যাব না—আমি আমার শ্বশুর বাড়ীতে এসেছি—তাতে পুলিশের বাপের কি?

[দারোগা, শ্রীপতি ও কানাই প্রবেশ করে]

মন্মথ ॥ কি গো, মণ্ডলের শাশুড়ী! জামাই কোথায়? আহা ভাবনা কিসের? জামাই ভেগেছে বুঝি? তা একরাত্তিরের জামাই, সে তো চলে যাবেই—এটা আবার কে?

মঃ মা ॥ জামাই!

ম ॥ এঁ্যা জামাই—বাঃ তোমার খুব ভাগ্য ভাল দেখছি—এঁ্যা? রোজ রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে। আর—তুই ছুঁড়ি এই বয়সে তো খুব রঙ্গ করছিস—এঁ্যা? শ্রীপতিবাবু—তাহলে আমাদেরও জানা রইলো—ময়নার মা জামাই সাজানোর ব্যবসা করে। তাহলে আমরাও তো দু এক রাত্তির জামাই সেজে আসতে পারি, কি বলুন? এমন খাসা বউটি পেলে (দারোগা ময়নার চিবুক ধরার জন্তে হাত বাড়ায়)

জগ ॥ মুখ সামলে কথা বলবেন—

ম ॥ ও শ্রীপতিবাবু—বেটা বলে কি! সারারাত বউ পরের সঙ্গে রাত কাটাল এখন বেটা স্বামীর অধিকার ফলাতে এসেছে—

জগ ॥ তাতে আপনার কি? রাত কাটিয়েছে ভুবন মণ্ডলের সঙ্গে—সে আমাদের বাপের মতো—আপনার মতো ইয়ের সঙ্গে তো—

ম ॥ (থাবড়া মারে) চোপ্—[হারান ঢোকে]

হা ॥ নিতাই ফিরেছে বউ? নিতাই ফিরেছে?

ম ॥ থানায় গিয়ে নিতায়ের মুখ দেখবে বুড়ো—

হা ॥ ওরা আবার এসেছে—! বউ—নিতাইকে মারবে ওরা—আমার হাতে একটা বন্দুক দাও তো বউ—আমার হাতে একটা বন্দুক দাও—

ম ॥ হুঁ—বুড়োর বন্দুক ধরার সাধ হয়েছে!

হা ॥ বন্দুক না থাকে লাঠি দাও—কাস্তে-কাটারি-কুড়ুল দাও—সনাতন শুধু হাতে লড়তে গিয়েছিল—খোলা বুক এগিয়ে দিয়েছিল—না, না, আজ আর ভুল করবো না। দাও বউ আমায় অস্ত্র দাও—

ম ॥ ময়নার মা মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার অপরাধে তোমাকে গ্রেফতার করা হোল—তোমাকে থানায় যেতে হবে—

হা ॥ (লাঠি নিয়ে) খবরদার—

ম ॥ বুড়ো শয়তান— (ধাক্কা দেয়। পড়ে যায়) চলো—থানায়—এই ধর বুড়োটাকে—চলো (ময়নার মা হাত ধরে)

জগ ॥ (ছুরিটা খুলে লাফিয়ে এগিয়ে আসে) খবরদার!

শ্রীপতি ॥ ছুরি!

ম ॥ ওরে চাষার বাচ্ছা—! সব কটা শয়তান—সকলকে বেঁধে নিয়ে যাব—এই পাকড়ো— (চাষীরা ঢুকে পড়ে)

সকলে ॥ খবরদার! [পর্দা পড়ে]

[অভিনয়ের আগে 'চেতনা'র মাধ্যমে নাট্যকারের অনুমতি নেবেন]

রাত্রির তপস্যা

অমল রায়

●

কুন্তল। পুলিশ অফিসার।

কনস্টেবল। এস. বি.। যুবক।

●

[পর্দা খোলার আগে মুহুর্মুহু পুলিশের হুইশেলের ও সাইরেনের শব্দ এবং যান্ত্রিক স্বরে ঘোষণা : "আজ সন্ধ্যে সাতটা থেকে পুরো এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা ও কারফিউ বলবৎ করা হচ্ছে। প্রত্যেককে বাড়ীর ভেতরে থাকতে বলা হচ্ছে, রাস্তাঘাটে বে-আইনী জনসমাবেশ দেখা গেলে অবিলম্বে ছত্রভঙ্গ করা হবে, গ্রেফতার করা হবে এবং কাউকে হিংসাত্মক এবং ধ্বংসমূলক কাজ করতে দেখলে বিনা হুঁশিয়ারীতে গুলি করা হবে।" এই আবহের মধ্যে পর্দা খুলল। সারা মঞ্চে মায়াময় নীলাভ আলো। কুন্তল পায়চারি করছে অস্থির ভাবে। কুন্তল যুবক, চুল অবিন্যস্ত, ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত চেহারা, রোগাটে গড়ন, পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি। হাতে একটা খাতা। পায়চারি করতে করতে কবিতা পড়ছে—নেপথ্যে সাইরেনের শব্দ।]

কুন্তল ॥ সুদূর স্বপ্নের মত তুমি আসো যাও আমার প্রান্তরে, প্রতিক্ষণ তোমার পদশব্দে কেঁপে ওঠে এ ক্লান্ত প্রহর—তুমি মৃত্যুর মত অনিবার্য স্থির প্রতিকৃতি এই ঘরে দ্রুত হেঁটে পার হও তুমি আমার এ নদনদী অরণ্য নগর।

[কতকগুলি ফায়ারিংয়ের আওয়াজ। কুন্তল খেয়াল করে না। কিন্তু কবিতা পাঠ থামে। অধৈর্যে ফেটে পড়ে সে]

নাঃ, হচ্ছে না। একদম হচ্ছে না। কথাগুলো কেমন এলোমেলো। যা বলতে চাই কিছুতেই বলতে পারি না। কতদিন কবিতা লিখিনি, কতদিন...কবিতা লিখতে ভুলে গেছি যেন—[আত্মগত স্বরে]

আজকাল আর কবিতা লিখতে পারি না
কেননা অসৎ হয়ে গেছি নিজের বোধের দুয়ারে—
মেকী জিনিস ফেরী করে উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ
হৃদয়ের কলঙ্কিত মাঠে ভুল জ্যোৎস্নায়
পড়ে আছে পচাখড়, গলিত মাংসের স্তূপ,
না চিবোনো নীরক্ত হাড়।
এই মোহময় দুর্গন্ধের অবারিত প্রদেশে
এই প্রেমহীন জরাগ্রস্ত রুগ্‌ণ অন্ধকারে
ভুলে গেছি জননীর গর্ভের তপোবনে
উলঙ্গ শিশুর মত আদিম সরলতা
ভুলে গেছি খুলে দিতে আমার সব সাজ, সব আভরণ—
আজকাল তাই কবিতা লিখতে পারি না—
যেহেতু আয়নার সতর্ক চোখের সামনে
ভণ্ডামীর ক্লেদ নিয়ে লজ্জায় বেঁকে যাই,
কুঁজো হয়ে যাই ধনুকের মতো,
নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে বড় ভয়, বড় ভয় করে।

[উল্লিখিত কবিতা পাঠ করার সময় নেপথ্যে কোলাহল, আর্তনাদ, ছোটাছুটির ক্ষীণ আভাষ মিলবে]

[আবার অস্থিরতায়—] নাঃ! কিছু হচ্ছে না! কিছু হচ্ছেনা আমার, এ পৃথিবীতে কারুর কিচ্ছু হয় না আর! সব নষ্ট হয়ে গেছে, সব ধান খেয়ে গেছে ইঁদুরে, সব বেলুন ফেঁসে গেছে স্বপ্নের। একটা লাইনও লিখতে পারছি না। সঠিক শব্দগুলো হারিয়ে যায়—কিচ্ছু ভাল লাগছে না আমার, কিচ্ছু না। [হাহাকার করে ওঠে] জীবনটাই আমার ব্যর্থ, হতাশ—কিছুই হল না আমার, কিছুই পাইনি এই পৃথিবীতে, এই দেশে—তবু একটা সান্ত্বনা ছিল, তবু একটা আশ্বাস ছিল বুকের ভিতর, কবিতা—

কবিতা লিখতে জানি, কবিতার যাতুর কাঠিতে বুকের ভেতর ঘনিয়ে ওঠা না পাওয়ার বেদনা, সব হারানোর যন্ত্রণা উবে যেত নিঃশেষে, কবিতার জগতে আমি সম্রাটের মহিমায় বসে থাকতাম—হায় সেই কবিতাও আজ ছেড়ে চলে গেছে, কি সব বীভৎস দিন, সব কিছু তছ নছ হয়ে যায়, সব তীর ভুলের ধনুক থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় ভুল লক্ষ্যপথে—আমি, আমি কি করব, কবিতা ছাড়া বাঁচব কি করে? গত কয়েক মাস ধরে কিছু লিখতে পারছি না—[খুব কাছেই বোমা ফাটে, কুন্তল চমকে ওঠে। রাগে দাঁত চেপে বলতে থাকে] শালা! যত উটকো ঝামেলা। সেই দুপুর থেকে শুরু হয়েছে। উঃ, পৃথিবীটা একেবারে নরক হয়ে উঠল। দিনরাত শুধু চিৎকার, স্লোগান, বোমাবাজী—একে ওকে খুন-জখম-মারামারি! অসহ্য! বিপ্লব হচ্ছে! বিপ্লব না কচু! এই রাজনীতি করে করেই দেশটার বারোটা বাজাল। আরে বাবা রাজনীতির থেকেও যে মহত্তর কিছু থাকতে পারে জীবনে তা এই মাথামোটা বোকার দল বোঝে না, বুঝতেও চায় না। এদের কাছে শিল্পের কোনো দাম নেই, কবিতার কোনো মর্যাদা নেই—একদল মাথাগরম সংকীর্ণতাবাদী, সংস্কৃতির দুশমন। [গোলমাল বাড়ে] আমি—আমি পাগল হয়ে যাব—একে কবিতাটা শেষ করতে পারছি না—বুকের মধ্যে যন্ত্রণা দানা বেঁধে আছে, তার ওপর এই গণ্ডগোল—উৎপাত। না! জানালাটা বন্ধ করে দিই। [জানলা বন্ধ করে। গোলমাল কমে] যাক্ এখন কিছুটা নির্ঝঞ্ঝাট—এখন আর কারুর ক্ষমতা নেই আমার নিভৃত শান্তির দুর্গে হানা দিতে আসে। সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া চাই, বিচ্ছিন্ন করা চাই, তবেই কবিতা আসবে, শিল্প আসবে। কবিতা তো আর বাজারের ভুষিমাল নয় যে দর হাঁকা-হাঁকির গোলমালে আসন পেতে বসবে। কবিতা রাত্রির মত নিস্তব্ধতা চায়, অমাবস্যার আকাশের মত বিপুল নৈঃশব্দ! যাক! এইবার লিখব সব বাজে ভাবনা সরিয়ে, আবার লিখব। লিখতে আমাকে হবেই। [লিখতে বসে] কতদূর লিখেছিলাম? সুদূর স্বপ্নের মত থেকে দ্রুত হেঁটে পার হও—আচ্ছা—আচ্ছা—মনে আসছে—

[সে লেখায় মগ্ন হয়। নেপথ্যে যান্ত্রিক ঘোষণা]

ঘোষণা ॥ সবাই শুনুন—এই অঞ্চলকে সরকার উপদ্রুত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করায় এখন সমগ্র এলাকা মিলিটারী দিয়ে ঘিরে সি. আর. পি.-র সাথে একযোগে Special Branch-এর সহযোগিতায় লোকাল পুলিশ কুম্বিং অপারেশন শুরু করছে। জনসাধারণকে আমাদের সাহায্য করতে বলা হচ্ছে, আরও বলা হচ্ছে—কেউ যেন কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হাঙ্গামাকারী দাঙ্গাবাজ উগ্রপন্থী সমাজ-বিরোধীদের আশ্রয় না দেন। কুম্বিং অপারেশন চলছে, কোনো বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না।—

[এই ঘোষণার মাঝে এবং শেষে উপর্যুপরি বোমা এবং গুলির আওয়াজ।]

কুন্তল ॥ [স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে] যাক, আর একটা স্ট্যান্‌জা হ'লো। ভালই হয়েছে মনে হচ্ছে। ওঃ, একি কম যন্ত্রণা, সন্তান-প্রসবের সময়ও বোধ হয় মেয়েরা এত কষ্ট পায় না। যতক্ষণ না লিখতে পারি ততক্ষণ মাথার মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটে চলে অবিরাম, মাথার ভেতরটায় যেন একটা বোমা বসান, এই ফাটবে, এই ফাটবে করছে। আঃ! এখন বেশ হাল্কা মনে হচ্ছে। [নেপথ্যে আবার কোলাহল, পায়ের আওয়াজ] একি! মনে হচ্ছে খুব কাছেই লেগেছে! ওঃ কেউ, কেউ একটু সুস্থ থাকতে পারবে না। সবাইকে ওরা উন্মাদ বানিয়ে ছাড়বে! এতদিন বাদে একটা কবিতা লিখতে বসেছি, সেখানেও ঝামেলা। বেশ ভাবটা জমে উঠেছে; এ সময় এ হুজ্জুতি ভাল লাগে? আর একটা স্ট্যান্‌জা লিখতে পারলেই কবিতাটা শেষ হবে—এই সময় এত গণ্ডগোল—আরে মনে হচ্ছে এই বাড়ীর মধ্যেই ঢুকছে! ঢুকুকগে—এত বড় ফ্ল্যাট বাড়ী—কে ঝামেলা বাঁধিয়েছে, কে জানে! আমার কি! আমি দরজা বন্ধ করে রেখেছি, আমার কিসের ভয়। আমি রাজনীতিও করি না—কোনো সাতে-পাঁচে নেই। মনে হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে! যাকৃগে আমার ভয় কি? অন্য ফ্লাটে যাবে বোধ হয়। অন্য ঘরে, আমি নিরাপদ, আমায় কেউ বিরক্ত করবে না, সবাই জানে আমি রাজনীতি করি না—আমি একজন কবি—আচ্ছা কি লিখলাম? স্ট্যান্‌জাটা পড়ে দেখি—কানে কেমন লাগে—কোনো ছন্দের গোলমাল আছে কি না! [নেপথ্যে

দরজায় প্রবল করাঘাত] না! আমি খুলব না! আমি খুলব না দরজা, কি অধিকার আছে ওদের আমাকে উত্যক্ত করার? কিছুতেই খুলব না। আমার গোপন সান্ত্বনার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেব না! কি ভেবেছে ওরা? আমি কি একজন গুণ্ডা, বদমায়েস, ওয়াগন-ব্রেকার, এ্যান্টি সোস্যাল? আমি একজন কবি—একজন পোয়েট এ্যাণ্ড প্রফেট—মানুষের শাশ্বত স্বপ্নের আমি স্রষ্টা। প্রজাপতি ব্রহ্মার মত। আমি ওদের দরজা খুলে দেব না। [দরজায় করাঘাত বাড়ে—সঙ্গে অশ্রাব্য গালি-গালাজ—তার মধ্যে কুন্তল চিৎকার করে ওঠে।] খুলব না! কোন মতেই না। আসতে দেব না কাউকে এই ঘরে। দূর হটো, ভাগো সব। আমি এখন কবিতা পড়ব, আমাকে বিরক্ত কোরো না কেউ!

[কোলাহল বাড়ে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুন্তল কবিতা পড়ে চলে]

"কেননা তোমার চৌহদ্দির বাইরে আমার কোনো অবস্থান নেই—
কতবার ভুল করে ফিরে যাই, পুনর্বার ফিরে আসি তোমার ছায়ায় ;
তুমি প্রকৃতির মত ফুলের গন্ধ আনো—জাগরণক্লান্ত ব্যর্থ সকালেই
সব দুঃস্বপ্নের বিষ মুছে যায় তোমার ঐ কম্পিত ঠোঁটের ছোঁয়ায়।"

[দরজা ভাঙার শব্দ। ঘরে ঢোকে তিনজন সশস্ত্র ব্যক্তি। একজনের ইউনিফর্ম কনস্টেবল-এর, অপর জনের পুলিশ-অফিসারের। বাকি জন সাধারণ বেশে—অর্থাৎ এস. বি.-র লোক।]

অফিসার ॥ হ্যাণ্ডস্ আপ! হাত তুলুন! গুলি করে দেব এখুনি। [কুন্তল বিমূঢ় হয়ে হাত তোলে]

এস. বি. ॥ সার্চ! সার্চ করুন পুরো ঘরটা—এক্ষুণি—

অফি ॥ [কনস্টেবলকে] এই নিমাই—সার্চ কর শালা, সময় নেই!

এস. বি. ॥ আগে এই মক্কেলের পকেট হাতড়ে ছাখ—মাল বেরোয় কিনা—[কনস্টেবল কুন্তলকে সার্চ করতে থাকে]

কুন্তল ॥ কি আশ্চর্য! আমায় কেন এমনভাবে—আমি কি করেছি!

এস.বি. ॥ দরজা খুলছিলেন না কেন?—[হঠাৎ সজোরে ঘুঁষি, কুন্তল পড়ে যায়]

কনস্টেবল ॥ এ শালাও মনে হচ্ছে সুবিধের লোক নয় স্যার—

অফি ॥ দেখাচ্ছি মজা! পাশের ঘরটায় দেখ তো কেউ আছে কি না!

[কনস্টেবল চলে যায়। টলতে টলতে কুন্তল উঠে দাঁড়ায়]

কুন্তল ॥ কোন্ অধিকারে এই ঘরে ঢুকেছেন আপনারা? কেন দরজা ভেঙেছেন?

অফি ॥ চোপ্ শালা—আবার বড় বড় কথা! [চড় মারে]

কুন্তল ॥ এ অত্যাচার! নিরীহ মানুষের ওপর বর্বরতা!

এস.বি. ॥ আপনার নাম?

কুন্তল ॥ আমি কোনো পার্টি করি না। কি দোষ করেছি আমি যে এভাবে—

অফি ॥ এখনও তেজ আছে বাঞ্চোতের। আর একটা কথা বলে গুলি চালাব —মাথায় আগুন জ্বলছে আমাদের—দিনরাত টেনশানের মধ্যে আছি—

কুন্তল ॥ কেন কিসের জন্যে আপনারা আমায়—

এস.বি. ॥ নামটা কি বলুন! নাম কি আপনার?

কুন্তল ॥ যা ইচ্ছে তাই করে যাবেন আপনারা—যা খুশি—এই কি স্বাধীনতা—

এস.বি. ॥ [আঘাত করে] নামটা বল না শালা, লেকচার পরে ঝাড়বি।

[কনস্টেবল ঢোকে]

কনস্টেবল ॥ ও ঘরে কেউ নেই স্যার! ওটা বাথরুম আর পায়খানা।

অফি ॥ এই ঘরটা দেখ ভালো করে। কিছু যেন বাদ না যায়।

এস.বি. ॥ [নরম স্বরে] নামটা বলুন না মশাই, কি নাম? [কনস্টেবল ঘর দেখে]

কুন্তল ॥ কুন্তল—কুন্তল চট্টোপাধ্যায়।

এস.বি. ॥ কি করেন?

কুন্তল ॥ মাস্টারী। কিন্তু কেন আমাকে এত প্রশ্ন করছেন? আমি তো—

এস.বি. ॥ ফ্ল্যাটটা আপনার? মানে আপনার নামেই ভাড়া নেওয়া?

কুন্তল ॥ হ্যাঁ—আমারই ফ্ল্যাট। বিশ্বাস করুন আমি কোনো পার্টিতে নেই—কোনোদিন ছিলাম না।

এস.বি. ॥ একাই থাকেন? বাড়ীর অন্যলোকেরা সব কোথায়?

কুন্তল ॥ আমি একাই থাকি। আচ্ছা আমাকে হ্যারাস্‌ড্ করে কি লাভ আপনাদের?

এস.বি.॥ [ঘরের চারপাশ দেখতে দেখতে] বাঃ, সারা ঘর জুড়ে শুধু বই আর বই—প্রচুর পড়াশুনা করেন বুঝি!

কুন্তল॥ [কনস্টেবলের কাণ্ড দেখে আর্তনাদ করে ওঠে] ঐ দেখুন—বই-গুলোকে কিভাবে এলোমেলো করছে, ছিঁড়ছে, নষ্ট করছে—আমার কত কষ্টের বই সব—[ছুটে যেতে চায়, অফিসার বাধা দেয়]

অফি॥ বাধা দেবেন না। ও ডিউটি করছে। ওকে কাজ করতে দিন।

কুন্তল॥ তা'বলে বইগুলো ছিঁড়বে—ঐ ঐ দেখুন কবিগুরুর সঞ্চয়িতার মলাট ছিঁড়ে ফেল—

অফি। ছিঁড়বে, ছিঁড়বে—আরও অনেক কিছু ছিঁড়বে। চুপ করে থাকুন—

কুন্তল॥ তাই বলে রবীন্দ্রনাথের বই ছিঁড়বে—

অফি॥ রবীন্দ্রনাথ বলে তো আর ধোয়া তুলসীপাতা নয়! ঐ বইটার মধ্যে টুকরো টাকরা বে-আইনী কাগজপত্র লুকিয়ে থাকতে পারে।

কুন্তল॥ এ অন্যায়—এ জবরদস্তি—

এস.বি.॥ [হাত ধরে টানে] ওদিকে তাকাবেন না। আগে আমার কথা-গুলোর জবাব দিন।

কুন্তল॥ আমি তো বুঝতেই পারছি না—কেন যে আমায়—

এস.বি.॥ কোন্ স্কুলে মাষ্টারী করেন?

কুন্তল॥ কাছেই। অভয় চরণ বিদ্যামন্দির—

এস.বি.॥ নোট করুন অফিসার, অভয় চরণ বিদ্যামন্দির—

কুন্তল॥ এসব প্রশ্নের অর্থই বা কি? বলেছি তো আমি কোনো রাজনীতি করিনা, বিশ্বাস না হয় খোঁজ নিয়ে দেখুন।

অফি॥ রাজনীতি করেন না বলেই তো বেশী বিপজ্জনক—ওপরে দিব্বি ভাল মানুষ, ভেতরে ভেতরে কাল কেউটে।

এস. বি.॥ এত বড় ফ্ল্যাটে একা থাকেন কেন?

কুন্তল॥ একা থাকতে ভাল লাগে বলে।

এস. বি.॥ বাড়ী কোথায়? মানে মা-বাবা-আত্মীয়স্বজন কোথায় থাকে?

কুন্তল॥ এসব জানতে চাইছেন কেন? এ সব খবরে আপনার কি দরকার?

এস. বি.॥ বল শালা [মারে] ঠিক করে বল যা জানতে চাইছি!

কুন্তল। [যন্ত্রণায়] একজন নির্দোষ মানুষকে এইভাবে—এইভাবে অত্যাচার—

এস.বি.। বল শালা একা থাকিস্ কেন? ফেরারী আসামীদের শেল্টার দেবার জন্ত একা একটা ফ্লাট নিয়ে আছিস?

কুন্তল। আমি রাজনীতি করিনা। একা থাকি তার কারণ বাড়ীর কারুর সাথে আমার মেলে না বলে। বাড়ীর ঠিকানা দিচ্ছি। খোঁজ নিয়ে দেখুন—আমি পার্টি করি না।

এস. বি.। তবে কি করেন? চাকরী ছাড়া অন্ত কি করেন? অল্পবয়েসী একটি ছেলে বিয়ে-থা করেনি, একা একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে—অথচ রাজনীতি করে না—তবে আর কি করে সে?

কুন্তল। [ঘাবড়ে গিয়ে] আমি—মানে—একজন ইয়ে—মানে ইয়ে লিখি—অনেক ছাপা-টাপাও হয়েছে—আমি লিখেই সময় কাটাই—

অফি। ইয়ে লেখে মানে? ইয়েটা কি?

কনস্টেবল। দূর—কিছু নেই—ঘরে গুচ্ছের বই আর বই। ধূলো ঘেঁটে সর্দি ধরে গেল।

কুন্তল। একি? আমার সব বই ছিঁড়েছে—আমার কত সাধের কালেক্‌সান-গুলো জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে—সব—সব নষ্ট করেছে—

এস. বি.। ও, মহাশয় তাহলে একজন কবি? মহাশয়ের তাহলে কবিতা নিয়েই কাজ কারবার?

কুন্তল। আগেই তো বলেছি কবিতা লিখি—অন্ত কোনো কিছুতে আগ্রহ নেই।

অফি। ওঃ ইয়ে মানে তাহলে পন্ত? ইনি পন্ত লেখেন! তা এমন পন্ত লিখিয়ে লোকটাকে ঘাঁটিয়ে তো দেখছি মহা অন্তায় করেছি—হাঃ হাঃ

এস.বি.। আরে সুভাষ মুখুজ্জের বইও তো দেখছি—পদাতিক; সুকান্ত সমগ্র রয়েছে—এই তো পাব্‌লো নেরুদার বই—নাজিম হিকমতের কবিতা—কি মশাই এই যে বলছিলেন কোনো রাজনীতি-টিতি করেন না; তবে এইসব কমিউনিস্টদের কবিতার বই ঘরে রেখেছেন যে?

কুন্তল। একজন কবি শুধুমাত্র কবিই। তাঁর অন্ত কোনো পরিচয় নেই। তিনি কমিউনিস্ট নন, ক্যাপিটালিস্ট নন, বুর্জোয়া নন, প্রলেটারিয়েট নন।

তিনি শুধু কবি। আমি এজন্য পাউণ্ডের কবিতাও ভাল বাসি। লোকে যাকে ফ্যাসিস্ট বলে।

অফি ॥ উরিব্বাস! ব্যাটাকে ভেবেছিলাম ধুর, এ যে দেখছি হেভি সেয়ানা।

এস. বি. ॥ হ্যাঁ! এদিকে জ্ঞান রয়েছে টন্‌টনে।

কুন্তল ॥ কিন্তু কেন? কেন আমাকে এভাবে—কি চান আপনারা? আমি তো আপনাদের কোনো ক্ষতি করিনি—

এস. বি. ॥ আচ্ছা, কবিতা নিয়েই কথাবার্তা বলা যাক্। আমারও কবিতা খারাপ লাগে না, সময় পেলে মাঝে মাঝেই পড়ি—রবিঠাকুরের মেঘনাদ বধ, গীতাঞ্জলি।

কুন্তল ॥ মেঘনাদবধ রবীন্দ্রনাথের নয়, ওটা মাইকেল মধুসূদনের—

অফি ॥ মালটা হেভি খচরা তো!

এস. বি. ॥ ভুল হয়ে গিয়েছিল। সে যাক—হ্যাঁ—কবিতা পড়েন বলছিলেন কবি, না? আমি শুনেছি মাও-সে-তুঙ্, হো-চি-মিন—এঁরাও নাকি মস্তবড় পড়েছেন নাকি মাও-সে-তুঙ্-এর কবিতা—

কুন্তল ॥ [যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারে] না! পড়ি নি।

এস. বি. ॥ সে কি! মাও-সে-তুঙ্-এর কবিতা পড়েন নি? এ আপনার ভীষণ অন্যায়—মাও-সে-তুঙের কবিতা না পড়লে চলে—

কুন্তল ॥ ঠিক আছে—আপনি যখন বলছেন পড়ে দেখব—

কনস্টেবল ॥ দারুন চালাক লোকটা। কিছুতেই ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসবে না—

এস. বি. ॥ পড়ুন—পড়ুন মাও-সে-তুঙ-এর কবিতা পড়ুন—না হ'লে কবিতা লিখবেন কি করে? পড়েননি মাও-সে-তুঙের সেই কবিতাটা? সেই যে মাও লিখেছেন—বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত—যবে অত্যাচারীর—

কুন্তল ॥ মাপ করবেন। ওটা নজরুল ইসলামের লেখা, মাও-সে-তুঙের নয়।

এস. বি. ॥ [পেটে লাথি মেরে ফেলে দেয়] বারবার নিজের বিদ্যে ফলাস না বাঞ্চোৎ। খুন করে ফেলব।

অফি ॥ কি করব একে নিয়ে? অ্যারেস্ট করব?

এস. বি. ॥ না না ফালতু লোক। তবে ভীষণ ক্লেভার।

অফি ॥ মনে হচ্ছে, এই তলাতে নেই—আরও উঠতে হবে।

এস. বি. ॥ হ্যাঁ ফর নাথিং এখানে সময় নষ্ট হল। চলুন। [কুন্তলকে] এই শুয়োরের বাচ্চা মিচকে কবি—বলে দিচ্ছি কোনো বাজে ঝামেলায় যাবি না! আর, হ্যাঁ শোন—রোগামত প্যাণ্ট শার্ট পরা কোনো ছেলে যদি তোর ঘরে এসে লুকোতে চায়, তবে আমাদের খবর দিবি—পুলিশভ্যান সামনেই আছে—প্রতিটা ঘর আমরা সার্চ করব—আবার হয়ত এখানে আসতে পারি। [কুন্তল ছাড়া—সবার প্রস্থান]

[কুন্তল আর্তনাদ করতে করতে উঠে দাঁড়ায়]

কুন্তল ॥ দুঃস্বপ্ন! একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলাম যেন। তলপেটটা এখনও টনটন না করলে ভেবে নেওয়া যেত--একটা দম আটকানো স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম এতক্ষণ। কিন্তু না—এই তো ঘরের মধ্যে ওরা তাণ্ডব করে গেছে—তার প্রতিটি চিহ্ন ছড়ানো—এই তো সব বইগুলো ছেঁড়া-খোঁড়া ছড়ানো ছিটানো—ওঃ। ভেতরে একটা অসহায় রাগ ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মত আমায় আঁচড়াচ্ছে—কত কষ্ট—কত কষ্ট করে সামান্য মাস মাইনে থেকে বাঁচিয়ে একটা একটা করে বইগুলো কিনেছি—সব গেল, সব—আমার পাঁজরগুলো ওরা খুলে নিয়ে গেল—এই দেশে মানুষ বাস করে—কার কাছে যাব, কার কাছে বলব।—[নিজের বইগুলো ছিঁড়ে ফেলতে থাকে রাগে] যাক, সব শেষ হয়ে যাক, এ দেশে কবিতা লেখা চলে না, এদেশে ছবি আঁকা চলে না। আমার—আমার এখন নিজেকেই খুন করতে ইচ্ছে করছে—কি লাভ বেঁচে থেকে—এদেশে কবিতা বাঁচে না, শিল্প কাঁদে না। আমি— আমি কি করব? [হঠাৎ শান্ত হয়ে] আচ্ছা, ওরা এমন করল কেন? আমি তো বললামই যে পার্টি টার্টি করি না—তবু আমাকে কেন—আচ্ছা, কি একটা ওরা বলে গেল যেন যাবার সময়—কাকে খুঁজছে যেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কেউ ঢুকেছে এই বাড়িতে, নিশ্চয়ই কেউ—তাকে খুঁজতে ওরা এমনভাবে হানা দিয়েছে এ বাড়িতে—উঃ, কি বে-আক্কেলে ছেলে সব—নিজেরা মরবি মর, আমাদের জড়াস কেন? আমাদের এমনভাবে ঝামেলায় ফেলার অর্থ কি হয়? বিপ্লব হচ্ছে না

আরো কিছু—মিছিমিছি লোকের উপর অত্যাচার ডেকে আনা—[টেবিলের কাছে গিয়ে] আরে কবিতাটা দেখছি এত উৎপাতের মধ্যেও অক্ষত রয়েছে, কি আশ্চর্য, এটার ওপর ওদের চোখই পড়ল না ? অবাক কাণ্ড। [হেসে ওঠে] এটা আর রেখে কি করব ? এ কবিতা আর কোনোদিন শেষ হবে না। কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, জীবনে আর কবিতা লিখতে পারবে না তুমি। তুমি ফিনিস্‌ড্‌। কি হবে আর মায়া করে ? ছিঁড়ে কুটি কুটি করে আগুনে ফেলে দাও সব। [ছিঁড়তে যায়] ছিঁড়ব ? হেরে যাব ? ওদের কড়া শাসনের ফাঁসে জড়িয়ে খুন করব আমার শেষ স্বপ্ন ? না, আরেকবার শেষবারের মত রুখে দাঁড়াব ? নিজের লেখা নিজের হাতে ছিঁড়ে নষ্ট করা আপন সন্তানকে হত্যা করার সামিল। পারি না, পারব না। আবার চেষ্টা করি, আবার—এ কবিতাটা আমাকে শেষ করতেই হবে ;— আমার শেষ কবিতা, এই নষ্ট পৃথিবীতে, এই ব্যর্থ জীবনে আমার শেষ প্রতিবাদ—[আবার লিখতে বসে। ঘরের আলো কমে। ইতিমধ্যে আলো-আঁধারিতে কে যেন ঢুকছে ঘরের ভিতর, আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে—কুন্তলের দিকে সতর্ক চোখ রেখে, কুন্তলের মুখে আলো-আঁধারির খেলা। সামান্য কিছু পরে কুন্তল লেখা থামায়। সপ্রশংস স্বরে বলে ওঠে] বাঃ অপূর্ব এমনটি লিখতে পারব আগে ভাবিনি, দারুণ হয়েছে শেষটা। নিজেই নিজের পিঠ চাপড়াতে ইচ্ছে করছে। এমন ভাবে শেষ দিকটা ঘুরে যাবে ভাবতেই পারি নি—[পড়তে থাকে কবিতাটি, এখানে আলোর খেলা চলবে]

"সুদূর স্বপ্নের মতো তুমি আসো যাও আমার প্রান্তরে
প্রতিক্ষণ তোমার পদশব্দে কেঁপে ওঠে এ ক্লান্ত প্রহর ;
তুমি মৃত্যুর মতো অনিবার্য স্থির প্রতিকৃতি এই ঘরে—
দ্রুত হেঁটে পার হও তুমি আমার এ নদনদী অরণ্য নগর—
কেননা তোমার চৌহদ্দির বাইরে আমার কোন অবস্থান নেই,
কতবার ভুল করে ফিরে যাই পুনর্বার ফিরে আসি তোমার ছায়ায়
তুমি প্রকৃতির মতো ফুলের গন্ধ আনো জাগরণ ক্লান্ত ব্যর্থ সকালেই
সব দুঃস্বপ্নের বিষ মুছে যায় তোমার ঐ কম্পিত ঠোঁটের ছোঁয়ায়

তুমি কারামুক্ত সময়ের ঘড়ি, আমার সর্বনাশের কিনারে ঘণ্টা বাজাও
তারপর সবুজ সিগন্যাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকো নির্জন স্টেশনে
সারা অঙ্গে রক্ততিলক পরে আসি, তুমি হাতে রাইফেল তুলে দাও
বিপর্যস্ত অস্তিত্ব খুঁড়ে খুঁড়ে দেখ, সমস্ত ক্লেদ কেটে যাবে নির্মম
হননে।"

যুবক॥ বাঃ অপূর্ব! [মঞ্চে পরিপূর্ণ আলো জলে ওঠে]

কুন্তল॥ [চমকে ওঠে] কে? কে আপনি?

যুবক॥ ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনার কোন ক্ষতি করতে আসি নি।

কুন্তল॥ কি করে ঢুকলেন আমার ঘরে? কেন এসেছেন?

যুবক॥ আস্তে। আস্তে। চেঁচাবেন না।

কুন্তল॥ অদ্ভুত ব্যাপার। আমারই ঘরে ঢুকে আমাকেই চোখ রাঙায়—

যুবক॥ চুপ! বলেছি না—চেঁচাবেন না।

কুন্তল॥ আমার ঘর আমি যা খুশি করব। কেন ঢুকেছেন এ ঘরে? কোন্ অধিকারে?

যুবক॥ কোন অধিকার টধিকার নেই। স্রেফ প্রাণ বাঁচানোর দায়ে।

কুন্তল॥ ও! আপনিই সেই মক্কেল! আপনাকে খোঁজার জন্যই তাহলে ঘরে ঘরে তল্লাসী চলছে!

যুবক॥ বুঝতে পেরেছেন ঠিকই। তবে আর চেঁচাচ্ছেন কেন? চুপটি করে বসুন। ওরা টের পেলে আমাকে তো শেষ করবেই আপনাকেও ছেড়ে দেবে না।

কুন্তল॥ বাঃ চমৎকার! আপনার জন্যে আমি মরতে যাব কোন্ দুঃখে! চলে যান, এখুনি চলে যান এ ঘর ছেড়ে!

যুবক॥ কোথায় যাব বলুন? চারদিকে ওরা ওঁৎ পেতে রয়েছে যে,—

কুন্তল॥ সে আমি কি জানি? সরে পড়ুন, বলছি। নয়ত আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব কিন্তু।

যুবক॥ আপনি তো অপূর্ব কবিতা লেখেন, দারুন হাত আপনার—

কুন্তল॥ তোষামোদ হচ্ছে বুঝি! ওসবে চিঁড়ে ভিজবে না! সরে পড়ুন।

যুবক॥ তোষামোদ করছিনা—শুধু বলতে চাই—এমন চমৎকার কবিতা

লিখতে জানে যে লোক, জীবন সম্বন্ধে যার অনুভূতিগুলো এত তীব্র, তার কেন মানবিকতা থাকবে না ?

কুন্তল ॥ মানে ? কি বলতে চান ?

যুবক ॥ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে একজন আশ্রয়প্রার্থীকে কেন ঠেলে দেবেন ?

কুন্তল ॥ আপনি এখানে থাকলে আমিও মরব।

যুবক ॥ সে তো ওরা খোঁজ পায় যদি, তবে। নাও তো খোঁজ পেতে পারে কিন্তু আমাকে এখান থেকে বের করে দিলে আমি কি আর বাঁচব ভেবেছেন ? ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ওরা আমাকে ছিঁড়ে খাবে।

কুন্তল ॥ সে আমি কি করব ? আমি কি করতে পারি ?

যুবক ॥ আমায় বাঁচাতে পারেন ? কিছুক্ষণ আশ্রয় দিতে পারেন ?

কুন্তল ॥ বার বার একই কথা কেন বলছেন ? আমি নিরুপায়। আপনাকে থাকতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়! আগের দিন হলে হয়ত আপত্তি করতাম না। কিন্তু এখন যা অবস্থা, তাতে যেচে ঝুঁকি নিতে চায় না কেউ।

যুবক ॥ তা' যা বলেছেন। বাড়ির সামনে যদি একটা ছেলেকে দশজন ঘিরে ধরে পিটিয়ে মারে, তবু আপনারা দরজা বন্ধ করে দেবেন, এগিয়ে এসে বাঁচাবেন না ছেলেটাকে।

কুন্তল ॥ সবই যদি বোঝেন, তবে এ সর্বনাশা রাস্তায় নেমেছেন কেন ? দেখছেন না—আপনারা একেবারে একা, কেউ পাশে নেই দাঁড়িয়ে বন্ধুর মতো। তবু কেন এসেছেন এই পথে—নিশ্চিত মৃত্যুর কানা গলিতে ?

যুবক ॥ [হেসে] উপায় ছিল না যে। অন্য কোনো রাস্তাই খোলা ছিল না।

কুন্তল ॥ তার মানে ? কি বলতে চান ?

যুবক ॥ দেখুন—মানুষের নিজের জীবনটুকু ছাড়া তো অন্য কিছুই নেই। যা তাকে করতে হবে, সবই এই জীবনটুকুর মধ্যেই, যা তাকে পেতে হবে তাও এই জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানের সময়টাতেই। জন্মের আগেও মানুষ কোথাও ছিল না, মৃত্যুর পরেও সে কোথাও থাকবে না। তার স্বর্গও নেই, নরকও নেই, থাকবার মধ্যে আছে শুধু তার একটি বাসযোগ্য

পৃথিবী, আর বসবাসের সময় তার ক্ষণস্থায়ী। পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো চপল জীবন, এর বাইরে কিছু নেই।

কুন্তল ॥ বাঃ। দারুন কথা বলতে পারেন তো আপনি!

যুবক ॥ ঐ জন্যেই তো জীবন এত প্রিয়, বাঁচতে প্রত্যেকে চায়, কেউ চায় না মৃত্যু! তবেই ভাবুন—নিশ্চয়ই এমন কোন গুরুতর কারণ জন্ম নিয়েছে আজ, যার জন্যে হাজার হাজার ছেলে তাদের পরম প্রিয় জীবনকেও উপেক্ষা করে দেশজোড়া মৃত্যুর ফাঁদের উপরে দাঁড়িয়ে আছে কি এক দুঃসাহসে—নিশ্চয়ই তার কারণটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

কুন্তল। বুঝি না। বুঝি না আপনাদের সেই কারণটাকে। রাজনীতি আমার ভালো লাগে না।

যুবক ॥ আচ্ছা ঠিক আছে। ওসব কচকচি ছাড়ুন। আমারও ভালো লাগছে না। মাঝে মাঝে ভীষণ ক্লান্ত লাগে। এইভাবে পালিয়ে বেড়াতে আর মন চায় না।—আপনি তো মনে হয় কবিতা লেখেন, পড়ুন না দু' একটা কবিতা—

কুন্তল ॥ আপনি—আপনি এখন কবিতা শুনবেন?

যুবক ॥ হ্যাঁ! পড়ুন না। আপনি তো বেশ ভালোই লেখেন।

কুন্তল ॥ জানেন—আপনাকে ওরা ধরতে পারলে খুন করবে! চারদিকে খ্যাপা কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে আপনাকে। আমার ঘরেও এসেছিল —তাণ্ডব চালিয়ে গেছে। তবু আপনি এখন কবিতা শুনবেন?

যুবক ॥ এই তো কবিতা শোনার সময়। জীবনের চেয়ে মহৎ কবিতা আর আছে কি? তাই তো অনিবার্য মৃত্যুর থাবার নীচে দাঁড়িয়েও আমরা গান গাই, ছবি আঁকি—

কুন্তল ॥ আমি—আমি পারতাম না। আমি নিজে কবিতা লিখি, তবু আপনার অবস্থায় পড়লে এমন অবিচলিত হয়ে কবিতা শুনতে পারতাম না।

যুবক ॥ "পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে
জলামাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে
বুনো হাঁস পাখা মেলে, সাঁই সাঁই শব্দ শুনি তার;
এক-দুই-তিন-চার-অজস্র-অপার"

কুন্তল ॥ জীবনানন্দ! আপনি জীবনানন্দ পড়েছেন?

যুবক ॥ "রাতের কিনারা দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা।
তারপর পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ—দু' একটি কল্পনার হাঁস"

কুন্তল। কি অদ্ভুত! পুরো মুখস্থ আপনার—

যুবক ॥ "মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুনিমা সান্যালের মুখ।
উড়ুক উড়ুক তারা পৌষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।"

কুন্তল ॥ [প্রায় চেঁচিয়ে] আপনি কবিতা ভালোবাসেন। কি আশ্চর্য—আমি তো ভাবতেই পারিনা—

যুবক ॥ [হেসে] একটা ক্রিমিন্যাল অ্যান্টিস্যোসাল এলিমেন্টও কবিতা ভালো বাসতে পারে, তাই না? যাদের গায়ে বিলেত ফেরত মহামহা জনদরদী নেতারাও হাফ হুলিগাণের হাফ পলিটিশিয়ানের মার্কা মেরে দিয়েছেন—তারাও জীবনানন্দ পড়ে—!

কুন্তল ॥ আমার ভীষণ অবাক লাগছে—কেন এমনভাবে নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে বসেছেন? কেন এইভাবে প্রাণ বিপন্ন করছেন?

যুবক ॥ বলেছি তো, এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না।—দুনিয়াটাকে বদলে দেওয়া চাই। বুঝলেন, জীবনকে সাজানো চাই নিজের মনের মতো আভরণে—অলংকারে।

কুন্তল ॥ সে তো আমিও বুঝি। সব কিছু পাল্টানো দরকার, এই জীবন আর সহ্য হয় না, ঐ জন্যেই সবার কাছ থেকে সরে গেছি। একা হয়ে গেছি!—কিন্তু দুনিয়াটাকে বদলাবার কি একটাই রাস্তা, অন্য পথ কি ছিল না?

যুবক ॥ ছিল কি? তা হলে এতদিন বদলানো যায়নি কেন? এতকাল তো আমরা এই পথে নামিনি, অন্য পথেই তো ঘুরে মরেছি, তবু কেন বদলানো যায় নি এই দেশকে, এই সমাজকে? আজ যখন যুদ্ধ করতে

রাস্তায় নেমেছি তখন শুনছি অন্য পথের ওকালতি। সেই অন্য পথটা এতদিন কোথায় ছিল?

কুন্তল॥ কি জানি! বুঝি না! রাজনীতি মাথায় ঢোকে না আমার!

[একটা গুলির শব্দ ও একটি আর্তনাদ]

কুন্তল॥ গুলি করল—মেরে ফেলল একজনকে।

যুবক॥ এখনও নিস্পৃহ থাকবেন? এখনও উদাসীন? আপনি না কবি, জীবন সম্পর্কে জগৎ সম্পর্কে আপনি না সুন্দরতম, পবিত্রতম স্বপ্ন দেখেন? দেশজোড়া এই হত্যালীলার বিরুদ্ধে আপনি কি কোন প্রতিবাদ করবেন না?

কুন্তল॥ আমার বড্ড ভয় করে—ভীষণ ভয় আমার।

যুবক॥ এখনও কি আপনি রি-এ্যাক্‌ট্ করবেন না? একটা বর্ণালী ফুল দেখলে আপনার কবিতা আসে, বর্ষার মেঘমালা দেখে আপনি কবিতা লেখেন, সুন্দরী মেয়ের মুখ চোখে পড়লে আপনি কবিতার বন্যা বইয়ে দেন—অথচ, অথচ আপনারই চেনা জানা, আপনারই ঘরের ছেলের লাশ যখন পড়ে থাকে রাস্তায়, আপনারই ভাইয়ের নিরপরাধ রক্তে লাল হয় দেশের মাটি—তখন আপনার কোন প্রতিক্রিয়াই ঘটে না; আপনার নিশ্চিত জীবনে কোন আলোড়নই আসে না! আপনারা কি মানুষ?

কুন্তল॥ আপনি চলে যান—চলে যান এখুনি!

যুবক॥ আমার অবাক লাগে—এত হাজার হাজার ছেলে মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় ধরে জীবনকে বাজী রেখে দুনিয়া বদলানোর নেশায় মেতে উঠেছে, অথচ আপনারা শিল্পীসাহিত্যিকেরা এমন নির্বিকার, এমন উদাসীন—এদেশে বিপ্লবী যুবকদের এত আত্মদান থেকেও জন্ম নিতে পারল না একটা গোর্কি, একটা বারবুস, একটা রোমা রলাঁ, একটা লু-শুন বা একটা বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টে।

কুন্তল॥ চলে যান—সত্যি বলছি—আপনার খোঁজে এই ঘরে এসেছিল ওরা, আমায় নির্দয়ভাবে মেরেছে—আবার এখানে আপনাকে পেলে—

যুবক॥ অথচ এখনই কিন্তু কবিতা লেখার সময়। কামানের গর্জনে রাইফেলের আওয়াজে বারুদের উত্তাপে নিহত সহযোদ্ধার রক্তে এখনই

তো কবিতা লেখার সময়। মানুষের ইতিহাসে নিখুঁততম কবিতার নাম বিপ্লব, কবিতাই বিদ্রোহের কৃষক, মানবাত্মার সর্বোত্তম উপাধি কবি—

কুন্তল ॥ চুপ করুন, থামুন। দোহাই আপনার। ওরা টের পেয়ে যাবে।

যুবক ॥ [লজ্জিত হেসে] বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। আসলে গুলির আওয়াজে মাথাটা কেমন গোলমেলে হয়ে গিয়েছিল। কে জানে কোন পরিচিত কমরেডেরই বুক বোধ হয় ঝাঁঝরা হয়ে গেল!

কুন্তল ॥ আপনার ভয় করে না?

যুবক ॥ কি?

কুন্তল ॥ প্রতি পদে মৃত্যু—তবু ভয় হয় না?

যুবক। [হেসে] ভয় পাবো না কেন? ভয় হয় বৈকি। যতই হোক মানুষ তো। বাঁচতে কে না চায় বলুন! এই এখন আপনার ঘরে বসেও কি ভয় হচ্ছে না আমার? খুব হচ্ছে। ধরতে পারলে আপনার সামনেই হয়ত গুলি করে মারবে [হাসতে থাকে]।

কুন্তল ॥ তবু হাসছেন?—আশ্চর্য লোক।

যুবক ॥ হাসব না কেন বলুন? ভয় হয় ঠিকই, কিন্তু এটাও জানি ভয় পেলেও তো মরার হাত থেকে বাঁচব না, তবে মিছিমিছি ভয় করে কি হবে? ভয় করার মানেই তো মরে যাওয়া, তাই ভয় না করেই বাঁচতে হবে।

কুন্তল ॥ কি জানি—সব গোলমাল হয়ে যায়।

যুবক ॥ জানেন, আমিও কবিতা লিখতাম।

কুন্তল ॥ আপনিও?

যুবক ॥ হ্যাঁ, গান গাইতাম, ছবিও আঁকতাম।

কুন্তল ॥ আজকাল আর লেখেন না?

যুবক ॥ [দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে] নাঃ সময় পাই কই?

কুন্তল ॥ কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন?

যুবক ॥ শুনবেন একটা? মনে আছে কি না কে জানে—

কুন্তল ॥ বলুন, শুনব—

যুবক ॥ অনেক—অনেক দিন বাদে আবার কবিতা বলছি—আসলে সন্তোষ—

মাপ করবেন, আপনার মতো একজন নিষ্ঠাবান কবিকে শোনাচ্ছি—ভুলচুক হলে মাপ করবেন—

কুন্তল ॥ ভনিতা ছেড়ে কবিতাটা শোনান—ভীষণ অবাক হচ্ছি—

যুবক ॥ [কুণ্ঠিত স্বরে শুরু করে] বালুচরে ঘর বাঁধি, জলে ধুয়ে যায়—
মৃত্যু নিঃশব্দ গুহায় নেচে চলে মুগ্ধ রমণী
বাসরলগ্ন শেষ হলে সাপের ফণার তলায়
বদ্ধরক্ত জমে উঠে পুঁজে ভরে ক্ষয়িষ্ণু ধমনী।

আর মনে পড়ছে না।

কুন্তল ॥ অদ্ভুত—আমি একেবারে—যাকে বলে অভিভূত—এত সুন্দর হাত আপনার, তবু ছেড়ে দিলেন কবিতা লেখা—

যুবক। [হেসে] আসলে এখন কবিতা তৈরী করছি, বিপ্লবের কবিতা। কবিকে এখন অস্ত্র ধরতে হবে, শুধু কবিতার অস্ত্রে কোনো কাজ হবে না! কবিতায় এখন মরচে পড়েছে, তাই বেয়নেট দিয়ে ঘষে ঘষে কবিতার মরচে তোলা দরকার।

কুন্তল ॥ আপনার এসব কথা আমি বুঝি না! তবু বলছি কবিতা লেখা ছাড়বেন না, বড় সুন্দর হাত আপনার—

যুবক ॥ দেখি যদি সময় সুযোগ পাই, লিখব দু'একটা। যেমন গেরিলা যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে মাও-সে-তুঙ, হো-চি-মিন, চে-গুয়েভারা লিখতেন! জানেন চে-গুয়েভারাকে যখন মেরে ফেলা হয়, তখন তাঁর কাছে ছিল মাত্র দুটি জিনিস--একটি রাইফেল অন্যটি পাবলো নেরুদার কবিতার বই। [বাইরে পায়ের আওয়াজ]

কুন্তল ॥ এইরে। এসে পড়ল বোধ হয়! পালান আপনি, চলে যান।

যুবক ॥ কোথায় যাব?

কুন্তল। সে আমি কি করে বলব? আমায় বেশ বিপদে ফেলবেন?

যুবক ॥ [একটুক্ষণ ওকে দেখে গম্ভীরভাবে] বেশ, চলেই যাচ্ছি। ধন্যবাদ। [প্রস্থানোদ্যত]

কুন্তল ॥ [চিৎকার করে] সে কি ও দিকে কোথায় যাচ্ছেন? ওরা ধরে

ফেলবে আপনাকে। যান—এদিকে যান—বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকুন।

যুবক ॥ [হেসে] এবার কিন্তু যেচেই বিপদ নিলেন, আমি চলেই যাচ্ছিলাম। আপনিই আটকালেন।

কুন্তল ॥ কথা বাড়াবেন না, চলে যান। এসে পড়ল ব'লে। [যুবকটি চলে যায়] কাজটা ঠিক করলাম কি? বোধহয় না—কিন্তু এমনভাবে ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিতেও মন চায় না! এই রে, এসে পড়েছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

[টেবিলে গিয়ে বসে। অফিসার, এস. বি. ও কনস্টেবল ঢোকে]

এস. বি. ॥ এই যে কবি মশাই—আবার বিরক্ত করতে এলাম!

কুন্তল ॥ কি চান আপনারা? আবার কি দরকার?

অফি ॥ পদ্য লিখছিলেন বুঝি! মাইরি আপনারা কবিরা এক আজব চীজ—বাইরে এত হুজ্জোত-হাঙ্গামা, তবু বেশ মজার পদ্য লিখে চলেছেন।

এস. বি. ॥ [টেবিল থেকে সদ্য লেখা কবিতাটা তুলে নিয়ে] এইটেই এখন লিখলেন বুঝি—

যুবক ॥ দিয়ে দিন, আমার কবিতাটা দিয়ে দিন।

এস. বি. ॥ আস্তে, আস্তে। অত ব্যস্ত হন কেন? কবিতা কি খাওয়ার জিনিস? আমরা কি খেয়ে ফেলব?—পড়তে দিন!

কুন্তল ॥ আমার কবিতা আপনারা পড়বেন?

এস. বি. ॥ কেন মশাই? পুলিশ বলে কি কবিতা পড়তে নেই? আমরা কি কবিতা পড়ি না? জানেন সেই ম্যাট্রিকে পড়েছিলাম সেই রবি ঠাকুরের কবিতা—আজও গড়গড়িয়ে মুখস্থ বলতে পারি—হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—তা সবে অবোধ আমি—

অফি ॥ কি যা-তা বলছেন—ওটা রবি ঠাকুরের লেখা কে বলল? এটা তো সত্যেন দত্তের লেখা—

এস.বি. ॥ থাক, থাক আপনাকে আর কবিতা নিয়ে কথা বলতে হবে না—কত কবিতা পড়েছেন জানা আছে, ভাগ্যে বলে বসেন নি ওটা মাইকেল মধুসূদনের লেখা—

কুন্তল ॥ [শান্ত স্বরে] আমার কবিতা পড়ে কি লাভ আপনাদের? দিয়ে দিন।

এস. বি. ॥ লাভ আছে, লাভ আছে। বোঝেনই তো পুলিশ বিনা লাভে কিছু করে না। আসলে এই কবিতাটা পড়লেই বোঝা যাবে আপনি আসলে মালটি কি?

কুন্তল ॥ তার মানে?

এস. বি. ॥ মানে অতি সোজা, আগে অতি বুকনি দিলেন না রাজনীতি করেন না, পার্টি করেন না. এ কবিতাটা পড়লেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা আসলে কি!

কুন্তল ॥ [গম্ভীর হয়ে] বেশ পড়ুন।

অফি ॥ এই যে মশাই—আজকের মতো আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি বটে, তবে প্রতি হপ্তায় একবার ক'রে থানায় গিয়ে হাজরী দিয়ে আসবেন, বুঝলেন?

কুন্তল ॥ আপনাদের অসীম দয়া। কিন্তু আমাকে নিয়ে নিরর্থক এই টানাহেঁচড়ার কারণটা কি জানতে পারি?

অফি ॥ কারণ টারণ কিছু নেই। কাউকেই আর বিশ্বাস করি না আমরা। যে যত গো-বেচারার ভান করে সেই তত ডেঞ্জারাস।

কনস্টেবল ॥ পাবলিকের মত খতরনাক চীজ দেখি নি মশাই, বাইরে সব ভিজে বেড়াল, ভেতরে ভেতরে সব কটা এক নম্বরের হারামী।

অফি ॥ এই যে আমরা এত পরিশ্রম করছি—দেশের জন্যে আইন ও শৃঙ্খলার জন্যে খেটে খেটে রোগা হয়ে যাচ্ছি—কোন শালার এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ নেই। একটা খবরও দিতে চায় না কেউ। মনে মনে সব শালা ওদের ফেবারে।

এস. বি. ॥ [পড়তে পড়তে] দুর, দুর। এ'সব কি কবিতা লিখেছেন মশাই —সুদূর স্বপ্নের মতো তুমি—একটা লাইনেরও মানে বোঝা যায় না— এ'সব কি কবিতা?

কুন্তল ॥ দয়া করে আপনাকে মানে বুঝতে হবে না, লেখাটা আমায় দিন।

এস. বি. ॥ শেষের দিকে এসব কি এঁ্যা? রাইফেল টাইফেল লিখেছেন কেন?

সায়া অঙ্গে রক্ততিলক পরে আসি, তুমি হাতে রাইফেল তুলে দাও।
মানে? মানেটা কি দাঁড়ালো?

কুন্তল ॥ কিচ্ছু মানে নেই। কবিতাটা দিয়ে দিন।

এস. বি. ॥ [সজোরে চড় মেরে] কিচ্ছু মানে নেই, না? আমরা সব ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? কবিতার ভেতরে নকশালী গন্ধ ছড়ানো হচ্ছে—রাইফেল বোমা পিস্তল পাইপগানের রাজনীতি লেখা হচ্ছে—

কুন্তল ॥ [ক্লান্ত স্বরে] আপনার যা খুশি ভাবুন, আমার কিছু বলার নেই!

এস. বি. ॥ প্রথমে ভেবেছিলাম প্রেম করতে— তুমি আমি চাঁদফুল পেরজাপতি আসলে শালা ভয়ানক চালাক—ঠিক কবিতার মধ্যে বোমাবাজীর আমদানী করেছে—

অফি ॥ এই নিমাই—আবার সার্চ কর—দেখি আর কিছু বেরোয় কি না! কবি। শালা কবি না কপি। সার্চ কর।

কুন্তল ॥ [চিৎকার করে ওঠে] কেন? কেন আমাকে মিছিমিছি জ্বালাতন করছেন?

অফিসার ॥ মিছিমিছি কি মশাই, মিছিমিছি কি? যে ছোকরাটা আমাদের নাগাল এড়িয়ে এই ফ্ল্যাটবাড়ির মধ্যে ঢুকেছে সেটা গেল কই? ওপরেও নেই, নীচেতেও নেই। আপনার ঘরেও দেখছি নেই। ভূতের মত হাওয়া হয়ে গেল নাকি?

কুন্তল ॥ আমি কি করে বলব? আমার ঘরে সে আসতেই বা যাবে কেন?

এস. বি. ॥ আস্তে, আস্তে। অত চেঁচাচ্ছেন কেন?—হ্যাঁ, সব কটা ফ্লাট দেখে মনে হচ্ছে যদি লুকোতেই হয় তবে ঐ নটোরিয়াস ক্রিমিনালটা আপনার ফ্লাটে লুকোনই নিরাপদ মনে করবে—

কুন্তল ॥ [ভয়ে চিৎকার করে] না! আমি কোন রাজনীতি করি না!

এস. বি. ॥ তার কারণ কি জানেন?—সবকটা ফ্ল্যাটে সবাই ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। একা আপনার ফ্ল্যাট আপনি একা। সুতরাং এ্যাবস্‌কণ্ড করার পক্ষে এইটিই আদর্শ জায়গা।

কুন্তল ॥ বিশ্বাস করুন—আমি কাউকে ঢুকতে দিইনি—কেউ নেই—

অফি ॥ এই নিমাই, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, সার্চ কর না—

কনস্টেবল॥ কোথায় আর সার্চ করব স্যার, বইয়ের ধুলো ঘেঁটে আর কি হবে?

কুন্তল॥ মিছিমিছি আমার এখানে সময় নষ্ট করছেন—কেউ নেই—

এস. বি.॥ বাথরুমের দরজাটা বন্ধ কেন?

কুন্তল॥ দোহাই আপনার, আমায় বিশ্বাস করুন—আমি কোন পার্টিতে নেই।

এস. বি.॥ বাথরুমের দরজাটা বন্ধ কেন?

কুন্তল॥ আমি একজন স্কুল মাস্টার—কবিতাটবিতা লিখি—এছাড়া আর কিছু করি না—

এস. বি.॥ বাথরুমের দরজাটা বন্ধ কেন?

কুন্তল॥ আমার সম্পর্কে খোঁজ নিন—দেখবেন আমার এগেন্‌স্টে কোন চার্জ নেই—

এস. বি.॥ [আবার মারে] বলছি না বাথরুমের দরজাটা বন্ধ কেন?

[কুন্তল নিজেকে সামলে নিতে থাকে]

কুন্তল॥ আমি জানি না—মানে এমনি বন্ধ—মানে আমি বন্ধ করে রেখেছি—মানে গন্ধটন্ধ আসে—

এস. বি.॥ [ওর দিকে তাকিয়ে] দরজাটা খুলে আমরা ঐ ঘরটা সার্চ করব।

কুন্তল॥ [প্রাণপণ শান্ত থাকে] বেশ তো যা আপনাদের ইচ্ছে—

এস. বি.॥ [ওকে দেখতে দেখতে] সত্যি সত্যিই কিন্তু ঐ ঘরটা খুলে দেখব আমরা—

কুন্তল॥ [হাসার চেষ্টা করে] বেশ তো—দেখুন না—আমিই খুলে দিচ্ছি—

এস. বি.॥ হাসছেন কেন? হোয়াই? হোয়াট মেক্‌স্ ইউ লাফ—বাস্টার্ড?

কুন্তল॥ হাসব না কেন? হাসছি আপনাদের কাণ্ড দেখে—আপনারা ভেবেছেন বুঝি—বাথরুমে কেউ লুকিয়ে আছে—বেশ তো আমিই আপনাদের দেখাচ্ছি—আসুন—

এস. বি.॥ [হতাশায়] ও, আচ্ছা! ঠিক আছে। চলুন অফিসার। আপাতত: এখানে কিছু মিলছে না।

কুন্তল ॥ কেন চলে যাবেন কেন? সন্দেহ যখন হয়েছে, বাথরুমটা দেখে যান—

এস. বি. ॥ ইয়ার্কি করবি না বাঞ্চোৎ, মাথায় আমাদের আগুন জলছে। কাম অন অফিসার—[ওরা চলে যেতে চায়]

কুন্তল ॥ আমার কবিতাটা—আমার কবিতাটা দিয়ে যান—

এস. বি. ॥ কবিতাটা? কবিতাটা দিয়ে যেতে হবে না? [কুটি কুটি করে ছিঁড়ে] এই যে শালা—তোর কবৃতে! নে! [পুলিশরা চলে যায়]

কুন্তল ॥ [আর্তনাদ] ছিঁড়ে ফেলল—আমার কবিতা ছিঁড়ে ফেলল—

[যুবকটি অন্য দিক দিয়ে প্রবেশ করে]

যুবক ॥ [হাসতে হাসতে] সব কথা শুনেছি আমি, দারুন নার্ভ তো আপনার—বাথরুমের কথায় ভাগ্যে ভয় পাননি—ঐ জন্যেই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম—

কুন্তল ॥ এই দেখুন—আমার কবিতাটাকে ওরা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়েছে—

যুবক ॥ কবিতাকেও ওরা এবার আক্রমণ শুরু করেছে। সরস্বতীর কমলবনে প্রবেশ করেছে মত্ত হস্তির দল। তবুও কি কবি তুমি থাকবে উদাসীন নির্বিকার?

কুন্তল ॥ কতদিন—কতদিন বাদে একটা কবিতা লিখেছিলাম—সেটাও রইল না, নষ্ট করে দিল শয়তানের দল।

যুবক ॥ এই দেশে একদিন ব্রিটিশ পুলিশ কবিতা লেখার অপরাধের গ্রেফতার করেছিল নজরুল ইসলাম নামে এক কবিকে। আজও অন্ধ্রে, পাঞ্জাবে শয়ে-শয়ে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিককে জেলে পুরে রেখেছে সাম্রাজ্যবাদের নোকরের দল, হত্যা করেছে তেলুগু কবি সুব্বারাও পানিগ্রাহীকে, রাতের অন্ধকারে কলকাতার ময়দানে কবি ও সাংবাদিক সরোজ দত্তকে। আজ তো শুধু আপনার কবিতা ছিঁড়ছে, কাল হামলা করবে আপনারই ওপর!

কুন্তল ॥ কেন? কেন ওরা আমার কবিতা ছিঁড়ে দিল—আমি কোন রাজনীতি করি না—আমি কোন সাতে নেই পাঁচে নেই।

যুবক ॥ হয়ত আপনারই অজান্তে আপনার কবিতা ওদের শত্রুশিবিরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বুক ফুলিয়ে। আপনার তো গর্ব হওয়া উচিত এই নপুংসক ক্লীবতার দেশে যখন ভাড়াটে কবি-শিল্পীদের গলায় উঠেছে ওদের দাসত্বের সোনালী বকলস, যখন সবাই প্রভুদের পিঠ চাপড়ানোর মোহে এ্যাকাডেমি আর জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের লোভে মালিকের পায়ের তলায় বসে লেজ নাড়ছে, তখন ওরা আপনাকে আক্রমণ করেছে, আপনার কবিতাকে —আপনার কবিতাকে মনে করেছে বিপজ্জনক—এতে তো আপনার গর্বে বুক ফুলে ওঠার কথা।

কুন্তল ॥ হ্যাঁ, কেমন ভাবে যেন শেষটা ঘুরে গেল—রাইফেল এসে গেল—বোধহয় একটু আগেই ওদের হাতে মার খেয়েছিলাম, ঐজন্যেই বোধহয় ভেতরের রাগটা কবিতার শেষের দিকে অমনভাবে ফেটে বেরুল—

যুবক ॥ ঠিকই তো—এখন তো রেগে যাওয়াই দরকার। কবিতায় এখন বইয়ে দিতে হবে ক্রোধের তপ্ত হাওয়া, কবিতার বুক ভরে দিতে হবে প্রতিহিংসার বারুদে—

কুন্তল ॥ ভয় করে—ভয় করে ভীষণ—

যুবক ॥ ভয়? এদেশের এক বৃদ্ধ কবি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে ক্রোধে ক্ষেপে উঠে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন রাজভক্তির ঘৃণিত উপাধি, অথচ শতশত জালিয়ানওয়ালাবাগ তৈরী হচ্ছে এখন এই দেশে বরাহনগর, কাশীপুর, বারাসত, কোন্নগরে, তবুও আমাদের এ্যাকাডেমি আর জ্ঞানপীঠ পাওয়া কবিরা থাকেন নীরব। দুশো বছরের ইংরেজ শাসনে একবার মাত্র জেলের ভেতর গুলি চলেছিল—হিজলীতে, আর তারই প্রতিবাদে সেই বৃদ্ধ কবিই তাঁর কাব্যসাধনার নিভৃত মন্দির ছেড়ে নেমে এসেছিলেন লড়াইয়ের ময়দানে—আর তাঁরই শিষ্য-প্রশিষ্যের দল আজ প্রায় প্রতিদিন জেলের ভিতরে গুলি চললেও কাদের ইঙ্গিতে যেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে—

কুন্তল ॥ কিছুই যে বুঝি না তা' নয়—আসলে আমি খুব ইন্ট্রোভার্ট তো, ছোটবেলা থেকেই একা একা থাকতে চাইতাম—আজও তাই বাড়ির সবাইকে ছেড়ে স্রেফ নিঃসঙ্গ জীবন উপভোগের লোভেই আলাদা থাকি।

আমার ঠিক কি বলব ?—জনতা সম্পর্কে একটা এ্যালার্জি আছে, চিৎকার, ভিড়, শ্লোগান, মিছিল, মিটিং ভালো লাগে না—

যুবক ॥ এই দেখুন—কথায় কথায় আসল কথাটাই ভুলে গেছি—আমায় কিছু খেতে দেবেন ?

কুন্তল ॥ খেতে দেব ?

যুবক ॥ হ্যাঁ, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। আজ সারাটা দিন পেটে কিছু পড়েনি। কিছু মনে করলেন না তো ? এভাবে খেতে চাওয়া অশোভন ঠিকই, তবে ক্ষিদে যেন মানছে না।

কুন্তল ॥ না—না, মনে করতে যাব কেন ? খিদে পেয়েছে যখন খেতে তো চাইবেনই। আর একজন অপরিচিত লোককে আশ্রয় দিয়েছি যখন, তাকে খেতে দেওয়াও নিশ্চয়ই আমার কর্তব্য কিন্তু মুশকিলটা হলো—

যুবক ॥ খাবারদাবার কিছু নেই, তাই তো ?

কুন্তল ॥ হ্যাঁ, মানে—একা থাকি তো, তাই রান্নাবান্নার ঝামেলা করি না—হোটেলে খাই, দেখি ঘরে মুড়ি টুড়ি আছে কিনা—

যুবক ॥ আহা খিদের মুখে মুড়ি অতি উপাদেয়। দিন। আসলে সেই কথায় আছে না খেতে পেলে শুতে চায়, আমার হয়েছে ঠিক এর উল্টো—থাকতে পেলে খেতে চায় [কুন্তল বাটিতে করে মুড়ি নিয়ে আসে]

কুন্তল ॥ এই নিন। সামান্য এই কটাই ছিল।

যুবক ॥ যথেষ্ট, এতেই হবে। [গোগ্রাসে গিলতে থাকে]

কুন্তল ॥ [মমতার স্বরে] খাওয়া দাওয়াও ঠিকমত হয় না নিশ্চয়ই।

যুবক ॥ [খেতে খেতে] কি করে আর হবে বলুন—ভোজনম্ যত্রতত্র, শয়নম্ হট্টমন্দিরে। পুলিশের তাড়ায় এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতে—কে আর আদর করে বসিয়ে খাওয়াবে বলুন—

কুন্তল ॥ বাড়ির কথা মনে পড়ে না ?

যুবক ॥ পড়ে বৈকি। এই যেমন মুড়ি চিবোতেই মনে পড়ছে বাড়িতে থাকলে মা পাশে বসিয়ে থালা সাজিয়ে খাওয়াতেন—জানেন আজও মা আমাকে ভাত বেখে দেন, আমি পাশে না শুলে মার ঘুমই আসে না—এখন আমার জন্যে হয়ত বুড়ি দিনরাত কাঁদে—

কুন্তল ॥ তবু সেই মাকে ছেড়ে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন !

যুবক ॥ কি করব ? বিপ্লবই আমার মায়ের মত। পার্টিই আমার বুক জুড়ে আছে— [নেপথ্যে গাড়ির আওয়াজ]

কুন্তল ॥ ওরা বোধহয় চলে গেল। ভ্যানটা ছাড়ল বোধহয়।

যুবক ॥ হ্যাঁ। মনে হচ্ছে এবার রাস্তা পরিষ্কার। আচ্ছা চলি, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার কথা চিরদিন মনে থাকবে।

কুন্তল ॥ মনে রাখার মত কোন কাজ করিনি ভাই, আসলে আমি একটা ভীতু, ঘরকুনো জীব। হয়ত আপনার সংস্পর্শে এসেই কিছুটা সাহস পেয়েছি।

যুবক ॥ নিজের সম্পর্কে এত খারাপ ধারণা করবেন না কমরেড। নিজেকে পাল্টানো যায়, সবাই বিপ্লবের পথে আসতে পারে, যদি ইচ্ছা থাকে। আর দেরি করব না।

কুন্তল ॥ আজকের রাতটা থেকে গেলে হতো না ?

যুবক ॥ ইচ্ছে করছে অবশ্য থেকে যাই, তবে থাকা চলবে না।

[যেতে যেতে]

এসেছে আদেশ—

বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হলো শেষ

পুরনো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা

আর চলিবে না।

তুফানের মাঝখানে

নূতন সমুদ্রতীর পানে

দিতে হবে পাড়ি।

কুন্তল ॥ বাহিরিয়া এল কারা ? মা কাঁদিছে পিছে

প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছিছে !

ঝড়ের গর্জন মাঝে

বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে ;

ঘরে ঘরে শূন্য হলো আরামের শয্যাতল—

যুবক ॥ যাত্রা করো, যাত্রা করো, যাত্রী দল
উঠেছে আদেশ
"বন্দরের কাল হলো শেষ।"

কুন্তল ॥ বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা!

যুবক ॥ স্বর্গ কি হবে না কেনা?

কুন্তল ॥ বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না কোন ঋণ?

দুজনে ॥ রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন!
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন!
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন!

[ধীরে ধীরে রিভলভার হাতে তিনজন প্রবেশ করে।]

এস. বি. ॥ আগেই সন্দেহ করেছিলাম—ব্যাটাকে এখানেই পাওয়া যাবে—

অফি ॥ [কুন্তলকে একটা লাথি মেরে] শালা খুব ধোঁকা দিয়েছিলি আমাদের।

এস. বি. ॥ [যুবককে] চল বাঞ্চোৎ—ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে—তোর খেল খতম।

কনস্টেবল ॥ [হাসতে হাসতে] গাড়িটা স্টার্ট করে কেমন ভড়কি দিয়েছিলাম—সুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়েছে—

এস. বি. ॥ দেরি করিস না বাঞ্চোৎ—এই নিমাই, বাঁধ একে—

[কনস্টেবল বাঁধতে থাকে যুবকটিকে]

যুবক ॥ [নির্লিপ্ত স্বরে] মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার
সময় তো নাই শুধাবার।

এস. বি. ॥ শালা—আবার কব্‌তে আওড়ানো হচ্ছে—

[তিনজনে মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে থাকে যুবকটিকে—কুন্তল মাটিতে পড়ে আছে।]

যুবক ॥ [ভ্রূক্ষেপ না করে] এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চালিত হবে তরী ;
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল ;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী। [টেনে নিয়ে যায়]

নেপথ্যে যুবক কণ্ঠ ॥ এসেছে আদেশ
বন্দরের কাল হলো শেষ।

[একটা গুলির আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক স্বরে ঘোষণা : "আনন্দ বাজার—পুলিশের হেফাজত থেকে পালাতে গিয়ে যুবক নিহত।" কুন্তল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়—]

কুন্তল ॥ এইবার—এইবার কবিতা যুদ্ধ ঘোষণা করবে, এইবার কবিতা আক্রমণাত্মক ভূমিকায় যাবে, কবি হবে বিদ্রোহের কৃষক, কবিতার গহন কাননে বইয়ে দেবে সশস্ত্র বাতাস, এখুনি কবিতা লেখার সময় ? বারুদের উত্তাপে রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে কবিকে এবার লক্ষ্যভেদী কবিতার বুলেট ছুঁড়তে হবে, কবিকে এবার হাতে তুলে নিতে হবে অস্ত্র, জিঘাংসায় অস্থির প্রতিহিংসায় উদ্দাম কবিকে এবার দাঁড়াতেই হবে শেষ যুদ্ধের ব্যারিকেডে—

বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা—
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবেনা
এত ঋণ—
রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবে না দিন !

নেপথ্যে কোরাস ॥ রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন !
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন !
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন !

[পর্দা]

দেশটা যখন কারাগার

অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী

●

প্রথম অভিনয় রজনী ২৩শে জানুয়ারী '৭৮

ব্যাণ্ডেল নবীন সঙ্ঘ

জাগৃতির প্রযোজনায় যাঁরা অভিনয় করছেন

অম্বর রায়	—	স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা	—	অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী
বিজয়	—	ঐ পুত্র	—	রনজিৎ সাহা
সুকান্ত	—	প্রতিবেশী যুবক	—	শক্তি ঘোষ
জগদীশ	—	এম. এল্. এ.	—	কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
সরোজ হাজরা	—	ও. সি.	—	কমল চট্টোপাধ্যায়
সি.আর.পি.	—	১ম	—	উৎপল ঘোষ
		২য়	—	ওমপ্রকাশ রাজভড়

নির্দেশনা—অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী   মঞ্চ ব্যবস্থাপক—উৎপল ঘোষ

সঙ্গীত—কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ   আলো—শিশির ভট্টাচার্য্য

●

[মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ অম্বরবাবু। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি—স্বদেশী যুগের লোক। অম্বরবাবুর বৈঠকখানা ঘর। ঘরে একটা চৌকি, টেবিল ও গোটা দুই চেয়ার। দেওয়ালে মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বোস ও জহরলালের ছবি টাঙানো এবং ঘরটা মধ্যবিত্ত রুচি অনুযায়ী সাজানো। অম্বরবাবুর একমাত্র ছেলে বিজয়, বয়স প্রায় তিরিশের কোঠায়। বিজয় টেবিলে বসে কি যেন লিখছে। অম্বরবাবু চৌকিতে অর্ধশায়িত। সময় তখন রাত দেড়টা।]

অম্বর ॥ রাত তো অনেক হোল, শুয়ে পড় না। আবার তো নাকে মুখে গুঁজে সকালে বেরুতে হবে।

বিজয় ॥ তুমি ঘুমিয়ে পড় না বাবা। আমার এই লেখাটা শেষ করে এনেছি, এটা শেষ হলেই শুচ্ছি।

অম্বর ॥ তা, হ্যাঁরে, বৌমাকে কবে আনবি? নাকি আমিই একদিন গিয়ে বৌমাকে নিয়ে আসবো?

বিজয় ॥ ও! তোমায় বলতে ভুলে গেছি। ওর দাদা আমার অফিসে ফোন করেছিল। বলল, কাল বিকেলে উনি নিজেই ওলিকে রেখে যাবেন।

অম্বর ॥ বৌমা না থাকলে বাড়ীটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। হ্যাঁরে, তোর সেই প্রফেসর বন্ধু সৌরীন এখন কোথায় থাকে?

বিজয় ॥ কে?

অম্বর ॥ সেই যে তোর বিয়েতে—সৌরীনকে চিন্‌ছিস না?

বিজয় ॥ ও, সেই সৌরীনের কথা বলছো—ও তো এ্যারেস্টেড—কোলিয়ারী অঞ্চলে ও একজন বিরাট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।

অম্বর ॥ ওকেও এ্যারেস্ট করেছে! ওর অপরাধ?

বিজয় ॥ এখন বিরোধী নেতাদের কোন অপরাধের মাপকাঠি নেই। মহান নেত্রীর আদেশ, দেশের স্বার্থে বিরোধীদের জেলে পোরো।

অম্বর ॥ দেশটার অবস্থা দিন কে দিন কি হয়ে দাঁড়াচ্ছে বল দেখি? যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যে মহাত্মা গান্ধী, ওঁর বাবা জওহরলাল, নেতাজী ও আমাদের মত হাজার হাজার বিপ্লবীরা ইংরেজদের সাথে ফাইট করেছি—আর আজ সেই জওহরলালের বংশধর হয়ে শুধুমাত্র নিজের গদি বাঁচাবার জন্যে সারা দেশটা জেলখানায় পরিণত করেছে!

বিজয় ॥ তুমি তো বাবা স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করে জলে জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে থেকেছ—জেল খেটেছ। নিজেকে কংগ্রেসী বলে এখনও বুক ফুলিয়ে বেড়াও।

অম্বর ॥ হুঁ! এখন ভাবি, কিসের জন্যে, কাদের জন্যে লড়াই করেছিলাম।

বিজয় ॥ ব্যাস্—কমপ্লিট—বাবা।

অম্বর॥ কিরে— ?

বিজয়॥ একটা কথা বলবো ?

অম্বর॥ বল না।

বিজয়॥ আমার কি মনে হয় জানো। তোমরা যে স্বাধীনতার জন্তে লড়াই করেছ—জেল খেটেছ—সত্যাগ্রহ করেছ—আমি কিন্তু সেটাকে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে স্বীকার করে নিতে পারি না।

অম্বর॥ এ তুই কি বলছিস বিজয় !

বিজয়॥ হ্যাঁ বাবা। তোমাদের মত কিছু লোক হয়ত ছিলে যারা নেতাদের আদেশই শুধু পালন করেছো, কিন্তু সেই আন্দোলনের পেছনে একদল নেতা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তারা চেয়েছিল 'কমপ্রোমাইস উইথ দ্য ব্রিটীশ' এবং ভারত দ্বিখণ্ডিত করে গদী দখলের চেষ্টা।

অম্বর॥ কি আবোল-তাবোল বলছিস ? তখন গান্ধী আর জওহরলাল সারা ভারতকে মাতিয়ে তুলেছে, ওদের আহ্বানে হাজার হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় জেলে গেছে।

বিজয়॥ একটা কথার জবাব দাও তো বাবা। স্বাধীনতার ফলশ্রুতি হিসেবে যে জাতীয়তাবোধ জাতির জীবনে বড় হয়ে দেখা দেওয়ার কথা—সেই জাতীয়তাবোধ, তোমাদের ঐ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও কি সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে জাগাতে পেরেছো ? আসলে সব কিছুর মূলে ছিল গদীর মোহ—নেতৃত্বের মোহ। কে প্রধানমন্ত্রী হবে—কে কোন দপ্তর নেবে—এইটাই ছিল ফ্যাক্ট। তোমাদের মত কিছু নির্ভীক সৎলোক—যারা নেতৃত্বকে অন্ধ বিশ্বাস করেছিল, তারা আজ বড় জোর দুশো টাকার পেন্সনভোগী। আর ওদের বংশধররা স্টেপ্ বাই স্টেপ্ মন্ত্রীত্ব ও রাষ্ট্রদূতের জন্তে কিউ লাগিয়ে চলেছে।

অম্বর॥ কথাগুলো যা বললি, তা ভাববার বিষয়। আমিও মাঝে মাঝে ভাবি, এই তো দেখ না, বেশী দূরে যেতে হবে না—নিজেদের স্টেটের ব্যাপারটা দেখ—মিনিষ্ট্রি নিয়ে কি খেয়োখেয়ি। ওদের মধ্যে কটা সৎ লোক আছে আমি তাই তো ভেবে পাই না। কোথায় ছিল এরা ? না আছে যোগ্যতা, না আছে সভতা—আমি ভেবেই ঠিক করতে পারি না।

যাক্‌গে এসব কথা—ভাবতে গেলে মাথা গরম হয়ে ওঠে। যা, তুই ওঘরে যা—শুয়ে পড়।

বিজয়॥ যাচ্ছি। ভেতরে যায়। [কিছু পর দরজায় খট্‌ খট্‌ আওয়াজ ও অপরিচিতের কণ্ঠস্বর]

নেপথ্যে॥ ভেতরে কে আছো, দরজা খোল।

অম্বর॥ কে?

নেপথ্যে॥ আগে দরজা খোল।

অম্বর॥ কিরে বাবা—এ যেন ঘোড়ায় জিন্‌ দিয়ে এসেছে।

[বিজয় প্রবেশ করে]

বিজয়॥ কি ব্যাপার বাবা! কে ডাকছে?

অম্বর॥ আমাদের পরিচিত কেউ হলে, অমন অভদ্রের মত ডাকবে কেন?

[বিজয় দরজা খোলে দু'জন সি. আর. পি. সহ থানার ও. সি. সরোজ হাজরা প্রবেশ করে।]

সরোজ॥ তখন থেকে দরজা গুঁতোনো হচ্ছে—চিৎকার করে ডাকা হচ্ছে—কানে তুলো দিয়ে সব ঘুমনো হচ্ছিল নাকি?

অম্বর॥ কি অভদ্র কথাবার্তা—

সরোজ॥ কি বললেন—?

বিজয়॥ না, না, ও কিছু নয়। কি ব্যাপার বলুন তো, এত রাত্রে আমাদের বাড়ীতে?

সরোজ॥ অকারণে অতিথি হয়ে নিশ্চয়ই আসিনি।

[ডায়েরি দেখতে থাকে]

অম্বর॥ কি প্রয়োজন আমার বাড়ীতে তাই বলুন।

সরোজ॥ আমাদের উপস্থিতি আপনার কাছে খুব অস্বস্তিকর লাগছে নাকি?

অম্বর॥ স্বাভাবিক। ভদ্রলোকের বাড়ীতে এইভাবে—

সরোজ॥ থামুন! অম্বর রায় কে?

বিজয়॥ ইনি আমার বাবা।

সরোজ॥ বিজয় রায়?

বিজয়॥ আমি।

অম্বর ॥ কি ব্যাপারটা কি, সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না—

সরোজ ॥ পারবেন, পারবেন। আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবেন। কেউ তো আর খোকা নন।

অম্বর ॥ ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসেছেন ; ভদ্রভাবে শব্দ প্রয়োগ করুন।

সরোজ ॥ আজকাল কলে পড়লে সব শালাই ভদ্র বনে যায়।

বিজয় ॥ কার সাথে কিভাবে কথা বলছেন ? আপনি হয়তো জানেন না উনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা—সরকার থেকে এখনও—

সরোজ ॥ সব শুনেছি—তোমাদের নাড়ী নক্ষত্রের খবর নেওয়া হয়েছে। শ্রীমান বিজয়বাবু, তোমার এগেন্সটে মিসায় এ্যারেষ্ট করার অর্ডার আছে।

অম্বর ॥ সে কি !

বিজয় ॥ আমার অপরাধ ?

সরোজ ॥ জরুরী অবস্থার অবমাননা করেছো। ফ্যামিলি প্ল্যানিং বানচাল করার জন্যে পাবলিককে উস্কানি দিচ্ছ। আরো অনেক রিপোর্ট আছে —সব বলা যাবে না এবং বলতেও আমি বাধ্য নই। আর হ্যাঁ, বাড়ীটাও সার্চ করবো ॥

বিজয় ॥ এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা—মিথ্যে কথা। আমি ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ বাধা দিচ্ছি—এ সব মিথ্যে প্রোপাগাণ্ডা।

অম্বর ॥ এ সব কি বলছেন আপনি ! আমার ছেলে দশটা পাঁচটা অফিস— করে—তার সংসার আছে। ও ও-সব ঝামেলায় ও যাবে কেন ? আপনারা ভুল ইনফরমেশন পেয়েছেন। ও নিজের অফিস আর পত্রিকা নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

সরোজ ॥ এই তো আসল কথায় এসেছেন। আপনার ছেলে শ্রীমান বিজয় রায় গেল মাসে ওনাদের ঐ বিদ্রোহী কাগজে কি যেন লিখেছিলেন— [ডায়েরি দেখে] 'দেশ এখন একনায়কত্বের পথে এগুচ্ছে'—কি অস্বীকার করতে পারেন বিজয়বাবু ?

বিজয় ॥ অস্বীকারের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। আর যা লিখেছিলাম সেটা তো সারা দেশবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এইটাই ঘটনা— জরুরী অবস্থায়-ই একনায়কত্বের সোপান।

সরোজ ॥ তেজতো পুরো মাত্রায় রয়েছে দেখছি।

অম্বর ॥ তেজ থাকাই স্বাভাবিক। যা ন্যায় সেটা বলতেই হবে। যা সত্য তা উদ্‌ঘাটিত করতেই হবে। এটাইতো ছোটবেলা থেকে ওকে আমি শিখিয়েছি।

সরোজ ॥ প্রাইম মিনিষ্টারের এগেন্সটে কথা বলা, সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা, জনকল্যাণমূলক কাজে বাধা দেওয়া, শান্তিপ্রিয় মানুষকে উত্তেজিত করা সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ কাজ—আর সেই কাজে আপনার শ্রীমান সবাইকে উস্কে দিচ্ছে। সবায়ের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ঘরে তো দেখছি নেতাদের ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়েছে—এসব ভড়ং বেশ তো শিখেছেন!

অম্বর ॥ ছিঃ ছিঃ কার সাথে কথা বলবো—ভদ্রতার লেশমাত্র নেই। এরাই আমাদের শান্তিরক্ষক—আর এদের হাতেই শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের দায় দায়িত্ব।

সরোজ ॥ চল হে বিজয়বাবু। আমাদের আরো অনেক কাজ বাকি আছে। ওঃ, শালা এমার্জেন্সি হয়ে আমাদের একবার দম ফেলবার ফুরসৎ নেই।

বিজয় ॥ এ্যারেস্ট অর্ডারটা দেখি—

সরোজ ॥ এ্যারেস্ট অর্ডার? কিসের এ্যারেস্ট অর্ডার? ওসব পাট উঠে গেছে। এখন আমাদের ইচ্ছেমত যা খুশি তাই করতে পারি।

অম্বর ॥ তার মানে এটা জঙ্গলের রাজত্ব নাকি? ব্রিটিশ আমলেও ওয়ারেন্ট দেখিয়ে আসামীকে ধরতে হোত।

সরোজ ॥ ওসব ভুলে যান। এখন আমাদের মুখের কথাই যথেষ্ট। পার্লামেন্টে মিসা আইনের যে খসড়াগুলো পাশ হয়েছে কাগজে পড়েন নি?

অম্বর ॥ বাঃ সুন্দর! কি চমৎকার প্রশাসন। স্বাধীনদেশের নাগরিক আমরা অথচ মত প্রকাশের অধিকারটুকু নেই। যাকে খুশি এ্যারেষ্ট করবে, জেলে পুরবে, চক্রান্ত করে খুন করবে অথচ আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ নেই। চমৎকার!

সরোজ ॥ কি হোল, যাবে—না কোমরে দড়ি পরাতে হবে?

[প্রবেশ করেন জগদীশবাবু, এম. এল. এ.। পাশের বাড়ীতে থাকেন। বয়স সাতাশ / আঠাশ।]

জগদীশ ॥ কি ব্যাপার, এই রাত দুপুরে এখানে পুলিশ কেন? সবে একটা জরুরী মিটিং সেরে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম—আপনার বৌমা বললো, দেখতো পাশের বাড়ীতে হৈ চৈ হচ্ছে কেন? কি ব্যাপার দাদু? আর আপনারাইবা এই রাতদুপুরে ভদ্রলোকের বাড়ীতে কেন? [ইশারা করে] কি ব্যাপার সরোজবাবু, ব্যাপারটা কি?

সরোজ ॥ ব্যাপার যা তাই স্যার। আপনিও যে এখানে আসবেন, আমি বুঝতেই পারি নি।

জগদীশ ॥ এই এইটাই তো কথা। যবে থেকে এম. এল. এ. হয়েছি পাব্লিক ওয়ার্ক করতে করতে বিশ্রাম কাকে বলে তা একেবারে ভুলেই গেছি। পাড়ায় ঝুট্ঝামেলা—এসব শুনলেতো চুপ করে থাকতে পারি না। হাজার হলেও এরা আমার প্রতিবেশী। তা ছাড়া দাদু হচ্ছেন সে যুগের একজন—যাক্ আপনারা এখন অন্য কাজে যান—আমি এনাদের কাছে আগে ব্যাপারটা বুঝে নিই।

সরোজ ॥ ঠিক আছে স্যার, আমার অন্য একটা কাজ আছে, সেটা বরং আগে সেরে আসি।

জগদীশ ॥ ও হ্যাঁ শুনুন [সরোজবাবুর কানে কানে কি যেন বলেন]

সরোজ ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। আপনি যেরকম বলবেন ঠিক তাই হবে। আমরা তাহলে যাচ্ছি স্যার।

জগদীশ ॥ হ্যাঁ আসুন।

[সরোজবাবু সি. আর. পি. সহ চলে যান]

জগদীশ ॥ কি ব্যাপার দাদু? পুলিশ হঠাৎ কিসের গন্ধ পেল, যে এই রাতদুপুরে—

বিজয় ॥ আমি বলছি শুনুন—

জগদীশ ॥ আপনি চুপ করে থাকুন। যা জানবার আমি দাদুর কাছ থেকেই শুনছি। বলুন দাদু।

অম্বর ॥ কি আর বলবো? বিজয়কে তো তুমি কোনোই—

জগদীশ ॥ বিলক্ষণ—এতে আর সন্দেহ কি? খুব ভাল ভাবেই চিনি।

অম্বর ॥ ও তো নিজের অফিস আর পত্রিকা নিয়েই ব্যস্ত। ওর অপরাধ,

ওদের ঐ 'বিদ্রোহী' কাগজে ও একটা আর্টিকেল্ লিখেছে। সেইজন্তেই ওকে মিসায় এ্যারেস্ট করতে চায়।

জগদীশ ॥ ও—তা কি এমন আর্টিকেল, যে একেবারে পুলিশের নজরে পড়তে হয়। আর ঐ সব ছাই-পাঁশ লেখবারই বা দরকার কি ?

বিজয় ॥ কি বলছেন আপনি ! আপনি একে ছাই পাঁশ বলছেন—

জগদীশ ॥ ছাই পাঁশ বলবো নাতো কি বলবো ? আরে বাবা, লিখতে হয়তো দেশের জন্তে লেখ, জাতির জন্তে লেখ—টোয়েন্টি প্লাস ফাইভ পয়েন্টের জন্তে লেখ। তারপর ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ মানুষকে এগিয়ে আসার জন্তে লেখা হোক। তাতে দেশের কাজ হবে। সরকারের এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট পাওয়া যাবে—পয়সার অভাব হবে না, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।

অম্বর ॥ এসব তুমি কি বলছো জগদীশ ! মানুষ কি সব বোকা আছে ? নাকি ? তাদের কানে কি কোন খবরই এসে পৌছাচ্ছে না ? ঘা খেতে খেতে মানুষের চোখ খুলতে শুরু করেছে। আমি নিজে ওর ঐ আর্টিকেলটা পড়েছি। ও যা লিখেছে সেইটেই আজ বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে।

বিজয় ॥ মত প্রকাশের অধিকার সকলেরই আছে।

জগদীশ ॥ না, এখন আর তা নেই। ঐ জন্তেই তো পি. এম. জরুরী অবস্থা জারী করেছেন। ওই যে জে. পি. মানে জয়প্রকাশ—কিছু লোক একেবারে মাথায় করে নাচতে শুরু করেছিল। আরে বাবা বেশতো সর্বোদয়-ভূদান যজ্ঞ নিয়ে ছিলি—আবার পলিটিক্স্ কেন ? উনি কি করেছিলেন, না আমাদের দেশের শান্তিপ্রিয় লোকদের ক্ষেপিয়ে নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করবার চক্রান্ত করছিলেন—স্কুল কলেজের ছেলেদের স্কুল বয়কট করার কথা বলছিলেন। এইভাবে গণতন্ত্র ধ্বংস করলে পি. এম. কি তোমাদের ছেড়ে দেবে ? না ফুলবেলপাতা দিয়ে পুজো করবে ? আর আপনারও বলিহারী যাই বিজয়বাবু, আপনারা মনে করেন ডুবে ডুবে জল খেলে কেউ বুঝি টের পায় না ?

অম্বর ॥ কি বলতে চাইছো তুমি ? ও আবার কি ডুবে ডুবে জল খায় ?

জগদীশ ॥ খায়-খায়। ওনাকেই জিজ্ঞেস করুন না। উনি এখনও পার্টির সাথে পুরোপুরি লিঙ্ক রেখেছেন। এখন আবার মিটিং মিছিলে সবেতেই যেতে শুরু করেছেন। শুধু কি তাই ? গোপনে গোপনে পার্টিকে অর্গানাইজ করছেন।

অম্বর ॥ সে কি! ওদের পার্টি তো শেষ হয়ে গেছে। এই তো সেদিন আমাদের চিফ্ মিনিস্টার বললেন ওদের পার্টি নাকি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। জনগণ এখন তোমাদের দিকে।

বিজয় ॥ কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস জানা থাকলে এই সমস্ত অবাস্তর কথাবার্ত্তা উনি বলতেন না।

জগদীশ ॥ দেখুন বিজয়বাবু, কম্যুনিস্ট কথাটা আমার সামনে উচ্চারণ করবেন না বলে দিচ্ছি। আমার গা একেবারে রি-রি করে জ্বলে যায়। হ্যাঁ, আপনি কি বলছিলেন দাত্ব, জনগণ আমাদের দিকে কি না ? নিশ্চয়ই—জনগণ এখন আমাদের দিকে। তার প্রমাণ তো কিছুদিন আগে পেলেন। ঐ যে আপনাদের জে. পি. ইউনিভার্সিটি ইন্সটিট্যুটে ঢুকতেই পারলো না। মিটিং তো দূরের কথা! আমাদের জনগণ সে কি ধিক্কার দিল। জে. পি. আসার সাথে সাথে জনগণ ধিক্কার জানিয়ে গর্জে উঠলো—জে. পি. নিপাত যাক্—জে. পি. গো ব্যাক। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

অম্বর ॥ দেখ জগদীশ, সেদিন জে. পির মিটিংএ তোমরা যে কলঙ্কময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছ, আগামী দিনের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার কৈফিয়ৎ তোমাদের দিতে হবে।

জগদীশ ॥ এই তো—দুজনের কণ্ঠে একই সুর। তা আপনি এখন কোন দলে জে. পি. না কম্যুনিস্ট ?

বিজয় ॥ তার মানে এইটাই কি আমাদের মেনে নিতে হবে যে আপনারা যেটা বুঝবেন সেইটাই ঠিক, আর সব বেঠিক ?

অম্বর ॥ দেখ জগদীশ, গণতন্ত্রের ডেফিনিশন বলতে তোমরা কি বোঝ সেটা তোমরাই জান। আমি বলতে চাই—

জগদীশ ॥ আরে দাদু,ঐ সব বড় বড় বুকনি রাখুন তো—।

অম্বর ॥ সত্যি কথায় তোমরা এত উত্তেজিত হয়ে ওঠো কেন? তোমাদের গণতন্ত্রের নমুনাতো আর কারো অজানা নেই। এই যে তিনবছর হতে চললো পাড়ায় কত ছেলে পাড়াছাড়া। জোর করে মিটিং মিছিল বন্ধ করা। অফিস দখল করা, ইউনিয়ন দখল করা-এগুলো কি গণতন্ত্রের নমুনা?

জগদীশ ॥ বুঝতে পেরেছি আপনাদের সব মরার পালক গজিয়েছে। ভেবেছিলাম পাড়া প্রতিবেশী, চোখের সামনে—আপনাকে শ্রদ্ধাও করতাম। বিজয়বাবুর কাছ থেকে একটা স্টেটমেণ্ট নিয়ে এ যাত্রা রেহাই করে দেবো। তা দুজনেই দেখছি সে পথের বান্দা নন। এর পরে কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবেন না।

বিজয় ॥ তার মানে এ ষড়যন্ত্রের পেছনে পুরোপুরি আপনারও হাত আছে?

জগদীশ ॥ ষড়যন্ত্র! কিসের ষড়যন্ত্র? ষড়যন্ত্র করছেন আপনারা। আপনাদের মত দেশদ্রোহীরা যারা ধার করা বিদেশী কম্যুনিজমের তত্ত্ব নিয়ে কচ্‌কচানি করেন। আমাদের এই সনাতন ভারতের বুকে কম্যুনিজমের বিষ ছড়াবার চক্রান্ত করেন। আমাদের মহান নেত্রীর বাণী আজ সারা বিশ্বের কাছে বিস্ময়। তাই বলি, ধার করা ভুল তত্ত্বের ওপর নির্ভর না করে আমাদের সনাতন আদর্শকে বোঝবার চেষ্টা করুন—মহান নেত্রীর আহ্বানে সাড়া দিন। টোয়েণ্টি প্লাস ফাইভ পয়েণ্টকে সফল করার জন্যে সকলে মিলে কাঁধে কাঁধ দিয়ে—

অম্বর ॥ বাঃ এম. এল. এ. হয়ে কথার ফুলঝুরি বেশ শিখেছ! দেশদ্রোহীর ডেফিনিশন জান? দেশদ্রোহী কাদের বলে জান? সে কথা যদি জানতে তাহলে আমার মত এই ষাট বছরের বৃদ্ধ যার যৌবনটা কেটেছে ব্রিটিশের কারাগারে, যাকে ধরবার জন্যে ব্রিটিশ সরকার দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, আর আমার ছেলে বিজয় যে তত্ত্বকে বিশ্বাস করে, বিশ্বের এক তৃতীয়াংশে আজ তা স্বীকৃত। আমিও সারমর্ম বুঝেছি। মার্কসিজম হলো শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার বনিয়াদ। ওঃ, আজ আমার সবচাইতে আফ্‌শোষের দিন যে তোমার মত একজন স্বার্থান্বেষী—

জগদীশ ॥ দাদু !

অম্বর ॥ [illegible]ী রিগিংমাষ্টার আমায় জ্ঞান দিচ্ছে— ।

জগদীশ ॥ ঐ তো—ঐ তো আপনাদের দোষ। আঁতে ঘা লাগলে খালি দুর্নাম দেবার চেষ্টা করেন। অনেকের মুখেই আজকাল শোনা যায়, আমরা নাকি রিগিং করে গদীতে এসেছি। আরে বাবা, রিগিং আবার কি ! জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিয়ে আমাদের জিতিয়েছে—আমাদের মহান নেত্রীর নয়া সমাজতন্ত্রের আহ্বানকে সারা ভারতের মানুষ স্বাগত জানিয়েছে।

বিজয় ॥ সম্পূর্ণ বাজে কথা। আপনারা ভারতের জনগণকে নয়া সমাজতন্ত্রের বটিকা খাওয়াচ্ছেন—আসলে ওটা ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছুই নয়।

জগদীশ ॥ তা হলে এত লোক আমাদের ভোট দিল কেন ?

বিজয় ॥ ভোট দেয় নি—জোর করে ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন।

জগদীশ ॥ সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা—ঐ সব ঐ—ইয়েদের কথা।

অম্বর ॥ মিথ্যে কথা ? তোমার বলতে একটু লজ্জা হল না ? বোমা, পিস্তল, পাইপগানের জোরে একশ্রেণীর পুলিশের সহায়তায় মস্তানদের লেলিয়ে দিয়ে জোর করে তোমরা ভোটাধিকার কেড়ে নাওনি ?

জগদীশ ॥ ও সব ঐ মাকুদের কথা।

বিজয় ॥ বাবা ছেড়ে দিন ওসব কথা।

অম্বর ॥ কেন, ছাড়বো কেন—আজ থেকে আমিও জনে জনে বলে বেড়াবো—এই আমি অম্বর রায় স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা যে সাত সাতটা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে গত বাহাত্তর সনে সেই আমাকে ভোটকেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তোমাদের ভাড়াকরা গুণ্ডার দল। তারা 'বুথ' দখল করেছে, ভোটের আগের দিন রাত্রে ব্যালট পেপারে ছাপ দিয়ে বাক্সভর্তি করেছে—এইভাবে তোমরা তোমাদের মহান নেত্রীর স্তাবকেরা গণতন্ত্র ধ্বংস করেছ। তোমাদের মুখে আবার বড় বড় কথা।

জগদীশ ॥ এর উত্তর দিতে আমিও জানি। এসব আপনাদের মত কম্যুনিস্টদের বানানো কথা। আমরাই বরঞ্চ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি।

যুক্তফ্রন্টের আমলে এই পশ্চিম বাংলার অবস্থা সকলে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। খুন রাহাজানি, ডাকাতি, জমিদখল, ধর্ষণ, ইয়ে—

বিজয়॥ তারপরে, বলুন রবীন্দ্রসরোবরে লরি লরি জামাকাপড় বিধবার মস্তকমুণ্ডন—

জগদীশ॥ হয়েছিলই তো। কাগজওয়ালারা কি মিথ্যে লিখেছিল? আমরা, এই আমরাই পশ্চিম বাংলাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছি। শ্মশানে পরিণত বাংলাকে আমরা এবারে সোনার বাংলার প্রতিষ্ঠা করবো। আমাদের মহান নেত্রী বলেছেন—আমাদের মাসুদা বলেছেন—

বিজয়॥ দেখুন জগদীশবাবু, আপনার সাথে আমরা তর্ক বিতর্ক করতে চাই না। আপনার খুশিমত যা ইচ্ছে তাই করুন গিয়ে। তবে একটা কথা জেনে যান, দাসখৎ দিয়ে কুকুরের মত বেঁচে থাকতে আমি বা আমাদের বংশে কেউ কোনদিন রাজী হয় নি—হবেও না—আপনি এখন যেতে পারেন।

জগদীশ॥ যাবোতো নিশ্চয়। তবে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে ভাল হত। পাড়া প্রতিবেশী—দাদুরও কি একই মত?

অম্বর॥ উপযুক্ত ছেলে আমার—সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে।

জগদীশ॥ ডিপ্‌লি থিংক করলে ভাল হোত। আমি বরঞ্চ সকালবেলা আসতুম। হাজার হোক পরিচিত লোক—শেষে ইয়ে—একটা বিচ্ছিরি—

বিজয়॥ জগদীশবাবু, আমাদের ব্যাপার আমাদেরই চিন্তা করতে দিন।

জগদীশ॥ চিন্তা আর কি করবেন। জেলে বসে হরিনাম জপ করতে হবে। আমার সাধ্য অনুযায়ী যা করার তাই করলাম।

অম্বর॥ ছিঃ ছিঃ এরা মুখে আবার গণতন্ত্রের কথা বলে। গান্ধীজীর কথা বলে। আমার বয়সটা আমায় দমিয়ে দিচ্ছে তবু এই ভগ্ন দেহ নিয়ে আবার আমি সংগ্রামে অবতীর্ণ হব। গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করবো। তোমাদের মত মেকী দেশসেবকদের মুখোশ আমি খুলে দেব।

জগদীশ॥ দাদু ধৈর্যের সীমা আছে—এত দূর ভাল নয়।

অম্বর ॥ এইবার সত্যি কথাগুলো ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে আমিও বলবো।

বিজয় ॥ বাবা তুমি চুপ কর—তোমার মাথার যন্ত্রণাটা বেড়ে যাবে।

অম্বর ॥ চুপ? চুপ করবো কি রে! চুপ করে করেই তো আজ দেশটার এই হাল হয়েছে। আরে আমি হচ্ছি সেই লোক যে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দশ বছর জেল খেটেছি। গায়ে যার এখনও গুলির দাগ রয়েছে। সেকি এই সমস্ত ফচ্‌কে ছোকরাকে ভয় খাবে? এম. এল. এ. বলে ভয় খাবে?

জগদীশ ॥ মুখ সামলে কথা বলবেন, দাদু।

বিজয় ॥ বাবা, প্লিজ তুমি চুপ কর।

অম্বর ॥ কেন—চুপ করবো কেন—ওর ভয়ে? তোরা ভয় করতে পারিস। আর এদের ভয় করে করে আজ এই অবস্থা হয়েছে। দেশটাকে ওরা কয়েদখানায় পরিণত করেছে।

জগদীশ ॥ আচ্ছা, আমিও মজা দেখাচ্ছি। বাপ ব্যাটাকে আনি জেল খাটিয়ে তবে ছাড়বো।

বিজয় ॥ ঐ ভয় আমাদের দেখাবেন না। এবার ভয় পাবার পালা আপনাদের আর ভয় খেতে শুরুও করেছেন।

জগদীশ ॥ আমরা ভয় খাচ্ছি? আমাদের ভয় খাওয়ার পালা?

অম্বর ॥ ভয় না খেলে সারা দেশে জরুরী অবস্থা কেন? বিরোধী নেতাদের জেলে পোরা হচ্ছে কেন? খবরের কাগজে সেন্সর বসেছে কেন?

বিজয় ॥ বাবা তুমি থামবে?

অম্বর ॥ দুদিনকার ছোকরা আমাদের ভয় দেখাতে এসেছে? মুচ্‌লেকা নিতে এসেছে? বলি সেদিনকার সাহেব কুত্তাদের ভয় খায়নি আর এরাতো দেশী কুত্তা।

জগদীশ ॥ দাদু, কুকুর টুকুর যাতা বলবেন না বলে দিচ্ছি। শেষকালে একটা বিচ্ছিরি—

অম্বর ॥ কি করবে, মারবে? পুলিশে ধরিয়ে মিসায় জেলে পুরবে? ওর জন্যে এই ষাট বছরের বৃদ্ধ অম্বর রায় পেছপা নয়। এখন দয়া করে তুমি যেতে পার—অনেক হয়েছে—

জগদীশ ॥ বুঝলাম এটা পুরোপুরি কম্যুনিস্টের ঘাঁটি।

অম্বর। ইয়েস—কম্যুনিস্ট—আমার ছেলে কম্যুনিস্ট এবং আজ থেকে আমিও কম্যুনিস্ট। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে, ন্যায়ের স্বপক্ষে বললে, সরকারের সমালোচনা করলে যদি কম্যুনিস্ট হয় তবে আমার মত মানুষ যে মনেপ্রাণে গান্ধীবাদে বিশ্বাসী ছিল, সে আজ থেকে কম্যুনিস্ট। যাও, এই কথাটা তোমাদের চাটুকারদের জানিয়ে দাও।

জগদীশ ॥ জানাবো বৈকি, নিশ্চয় জানাবো। পেনসন বন্ধ করে দেব। এই সমস্ত ডেঞ্জারাস কম্যুনিস্টদের পাড়ায় থেকে পুলিশের কুনজরে পড়বো ?

বিজয় ॥ বাবা, তুমি আর কোন উত্তর দেবে না। জগদীশবাবু, অন্ধ মোহে না থেকে দেওয়ালের লেখাগুলো পড়বার চেষ্টা করুন। যান, যাদের আমন্ত্রন জানিয়ে এনেছেন দয়া করে পাঠিয়ে দিন।

জগদীশ ॥ ঠিক আছে, ঠেলা বুঝবেন। [চলে যায়]

বিজয় ॥ বাবা—

অম্বর ॥ কি রে ?

বিজয় ॥ আমারই জন্যে হয়তো এই বুড়ো বয়সে তোমাকেও অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সইতে হবে।

অম্বর ॥ আমি ? না না আমার জন্যে একটুও চিন্তিত নই। চিন্তা শুধু বৌমার জন্যে। সে বেচারী কিছুই জানলো না, শুনলো না—সে কি এইসব সইতে পারবে ?

বিজয় ॥ তুমি তাকে সব বুঝিয়ে বলবে। শুধুতো তোমার বৌমাই নয়—ভারতের বুকে আজ কত নারীকেই এই দুর্ভোগ সইতে হচ্ছে।

অম্বর ॥ তোর মার উদাহরণ দেবো। তোর মাওতো দশটা বছর আমার পথ চেয়ে দিন গুনে ছিল, আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছিল, প্রেরণা দিয়েছিল। বৌমাও তো সেই বাড়ীরই বৌ। আচ্ছা, এক কাজ কর না—এখুনি তুই পালিয়ে যা। ওরাতো এখনও এসে পৌছায় নি।

বিজয় ॥ এ তুমি কি বলছো বাবা ? নেকড়ের মুখে তোমাকে ফেলে রেখে আমি পালিয়ে যাবো ? আমাকে না পেলে তোমাকে ওরা ছেড়ে দেবে

ভেবেছো? এরা তো জার্মানীর হিংস্র নাৎসী বাহিনীর মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ছেলেকে না পেলে বাবাকে খুন করবে।

অম্বর॥ ঠিক আছে। যা ভাল বুঝিস তাই কর। তবে আমিও ছেড়ে দেবো না। বাকি কটা দিন আমি এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবো। জনগণকে সচেতন করবো। তারজন্যে যদি এই বৃদ্ধ বয়সে আবার জেলে যেতে হয় যাবো। সেখানে গিয়ে পুরোনো বন্ধু বান্ধবদের সাথে মিলিত হব। নতুন সংগঠন তৈরী করবো। এই স্বৈরাচারী শাসনকে উৎখাত করার জন্যে বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের একত্রিত করবো।

[ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে সুকান্ত, প্রতিবেশী যুবক]

সুকান্ত॥ বিজয়দা, আমাদের বাড়ীতে পুলিশ ঢুকেছে।

বিজয়॥ আমাদের বাড়ীতেও তো এসেছিল—এখনি হয়তো আবার আসবে। তুই কোথায় ছিলি?

সুকান্ত॥ মা টের পেয়ে পেছন দরজা দিয়ে বের করে দেয়। প্রাচীরের পাশে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে সব দেখছিলাম। আর থাকতে পারলাম না। ঐ জগদীশবাবু, ঐ সব করাচ্ছে—বাড়ী চেনাচ্ছে—ঐ—

অম্বর॥ একটু আগে আমাদের কাছে সাধু সেজে গেল। বলে কিনা ওর গিন্নী পাঠিয়েছে—পাড়া প্রতিবেশী—শয়তান।

সুকান্ত॥ এদিকে বাবা তো হার্টের রুগী। পুলিশের কথায় বাবা যেন কেমন বোবা হয়ে গেছেন। মাকে যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করছে। বলছে ছেলেকে যদি আমাদের হাতে তুলে না দাও তাহলে মরা ছেলের মুখ দেখতে হবে।

অম্বর॥ বিজয়, আমি একবার সুকান্তদের বাড়ীতে যাবো। এটা কি মগের মুল্লুক নাকি যে যা ইচ্ছে তাই করবে!

বিজয়॥ তুমি গিয়ে কি করবে?

অম্বর॥ তীব্র প্রতিবাদ করবো। ওরা ভেবেছে কি? ওঃ এতদূর অধঃপতনে গেছে—নারীর মানসম্মান আজ ভূলুণ্ঠিত! অথচ দেখ আমাদের শাসন-কর্ত্রী একজন নারী—যার বাবার আমলেও এই জঘন্য প্রশাসন ছিল না—সেও এমন করে গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরে নি। আমি কালই চিফ

মিনিস্টারের কাছে যাব। স্ট্রংলি প্রতিবাদ করবো—দেখি উনি কি বলেন। আর উনিই বা কি বলবেন—চাটুকারের কাছে গিয়ে ফল বিপরীতই হবে।

বিজয়॥ তবে আর ও সমস্ত কথা বলছো কেন? কিন্তু সুকান্ত আমার মনে হয় তোর আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা উচিত নয়। ওরা আমাদের এখানে এক্ষুনি আসবে। জগদীশবাবু সেই ব্যবস্থাই করতে গেছে।

সুকান্ত॥ ও তো আমাদের বাড়ীর দিকে গেল।

বিজয়॥ তুই বরঞ্চ আমাদের ঐ পেছন দিয়ে সোজা রমেনদের বাড়ীতে যা। রমেনকে আমার কথা ও অবস্থাটা বুঝিয়ে বলবি। সে তোর সব ব্যবস্থা করে দেবে।

সুকান্ত। ওদিকের অবস্থা কি হচ্ছে কে জানে। বাবার জন্যে আমার চিন্তা হচ্ছে। উনি বোধ হয় হার্টফেল করবেন।

বিজয়॥ সে আমরা দেখছি কি করা যায়, তুই যা তো এখন।

[ঠেলে সুকান্তকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয়]

অম্বর॥ এদিকের দরজাটা দিয়ে দি, কি বল?

বিজয়॥ কি দরকার? দরজা দিলে কি আর ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে? জগদীশবাবুর হুমকি শুনলে না?

[সুকান্ত আবার ছুটে মঞ্চে ঢোকে]

সুকান্ত॥ বিজয়দা, ওধারে রাস্তার ওপরে পুলিশ।

বিজয়॥ তাহলে? আর তো দেরি করা উচিত হবে না।

অম্বর॥ এর মধ্যে ওরা যদি এসে যায়?

[অম্বরবাবুর বাইরের দরজা দিয়ে দেয়]

বিজয়॥ তাইতো কি করা যায়?

অম্বর॥ বাঃ বারে রাজত্ব—

সুকান্ত॥ আমি বাড়ীতে যাই। যা করে করুক—তবু বাবাকে তো একবার—

বিজয়॥ ছেলেমানুষি করবি না। তোকে পেলে তোর অবস্থা কি করবে ভেবে দেখেছিস? তুই কি জানিস না কিছু?

অম্বর॥ না-না আমারও মনে হচ্ছে ওর বাড়ীতে যাওয়া ঠিক হবে না। শেষে

একটা অঘটন ঘটে যাবে। এরা এখন সব পারে। মা-বাবার সামনে সন্তানের রক্তে ওরা হোলি খেলবে। তোদের ঐ কাগজে প্রায়ই দেখছি এই জাতীয় ঘটনা। দেশটা এখন অবিকল হিটলারের জার্মানির মত।

বিজয়। তুই এক কাজ কর। আমাদের বাথরুমের মধ্যে লুকিয়ে থাক্। আমি বা বাবা না ডাকা পর্যন্ত বেরোবি না। আমাকে যে কি করবে—যাক্ গে বাবাতো থাকবে। তুই যা, ভেতর থেকে দরজায় ছিটকিনি দিয়ে দিবি। যা-যা।

[সুকান্ত ভেতরে যায়]

নেপথ্যে। কি ব্যাপার! আবার দরজা দিয়ে ঝাকামি করা হচ্ছে কেন? পালাবার সব রাস্তা বন্ধ। দরজা খোল।

[অম্বরবাবু দরজা খুলে দেয়। দুজন সি. আর. পি. সহ সরোজবাবুর প্রবেশ]

সরোজ। কি, জগদীশবাবুর প্রপোজাল্‌টা পছন্দ হোল না?

অম্বর। সে কৈফিয়ৎ কি আপনাকে দিতে হবে?

সরোজ। গলাটা নামিয়ে কথা বলুন।

অম্বর। কেন গলাটা কেটে দেবেন নাকি?

বিজয়। দেখুন, আমার বাবার বয়স হয়েছে, তাছাড়া একটুতেই উনি—

সরোজ। তা আমার মাথা কিনে নিয়েছেন না কি? তখনও বড্ড বেশি চেঁচামিচি করেছেন।

অম্বর। চেঁচামিচি! সত্যি কথা বললে চেঁচামিচি হয়! অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে আপনাদের কাছে চেঁচামিচি হয় বুঝি? অবশ্য আপনাদের কাছে যুক্তি তর্ক এ সবই বৃথা। যারা গৃহস্থবধূর সাথে ভদ্রভাবে কথা বলতে জানে না—

সরোজ। আপনার বাড়ীর কোন মেয়েছেলের দেখাই তো পাইনি—

অম্বর। একটু আগে সুকান্তর মায়ের সাথে অভদ্র ব্যবহার করেছেন। বাড়ীতে তার অসুস্থ বাবা—

সরোজ। আচ্ছা -এ খবরটা পেলেন কি করে?

বিজয়। না—মানে—আমরা শুনেছিলাম—

সরোজ॥ কার কাছে? বল—

বিজয়॥ ঐ তো—ইয়ে—এসেছিল—

সরোজ॥ কে এসেছিল? সুকান্ত?

বিজয়॥ না—না, ও আসবে কেন? ওদের সাথে আমাদের খুব একটা পরিচয় নেই।

সরোজ॥ অম্বরবাবু, বুড়ো হয়েছেন। সত্যি কথা বলুন, সুকান্ত আপনাদের বাড়ীতে এসেছে? চুপ করে আছেন কেন, বলুন। বিজয়বাবু আগুন নিয়ে খেলবেন না। আমি কিন্তু বেশি কথার লোক নই। একবার—দুবার—তারপর সিপাই—

বিজয়॥ আপনি বিশ্বাস করুন সুকান্ত আমাদের বাড়ীতে আসে নি।

সরোজ॥ টাইম ইজ ওভার। সিপাই-যাও কোঠিকা অন্দর আউর চার তরফ সার্চ কর। কোই ছোকরা ছিপা হুয়া কি নেহি—যাও দেখো।

অম্বর॥ দাঁড়াও। তার আগে আমাকে সার্চ ওয়ারেন্ট দেখাতে হবে। আমি এ বাড়ীর মালিক। আমার পারমিশন নিতে হবে।

[পুলিশ দুজন দাঁড়িয়ে পড়ে]

সরোজ॥ সার্চ ওয়ারেন্ট! কিসের সার্চ্চ ওয়ারেন্ট? ওসব নিয়ম কানুন উঠে গেছে। এখন আমাদের সন্দেহ, আমাদের হুকুমই যথেষ্ট। জরুরী অবস্থায় আমাদের ক্ষমতা এখনও তুঙ্গে। আমি ইচ্ছে করলে যাকে খুশি মিসায় এ্যারেস্ট করে জেলে পুরতে পারি। আবার কুকুরের মত গুলি করে ফুটপাথে ফেলে রেখে দিতে পারি।

অম্বর॥ বেশ, তবে তাই দাও। এই আমি বুক পেতে দাঁড়ালাম। আমাকে আগে শেষ করো তবে তোমরা ভেতরে ঢুকতে পারবে—তার আগে নয়। অর্ডার দেম টু স্যুট মি অর ইউ স্যুট মি।

বিজয়॥ এ তুমি কি করছো?

সরোজ॥ দেখো—তোমার বাবাকে সরিয়ে নাও। নইলে সরিয়ে দিতে বাধ্য হব।

বিজয়॥ আপনারাই বা আমাদের কথা বিশ্বাস করছেন না কেন? আমরা

বলছি সুকান্ত আমাদের বাড়ী আসে নি। আপনারা আমাকে এ্যারেস্ট করতে এসেছেন—আমায় এ্যারেস্ট করুন।

সরোজ ॥ তোমাকে কি ছেড়ে দেব? কিন্তু ঐ মালটিকে তো আমার চাই। সিপাই—হাটাদো—অন্দর দেখো—

অম্বর ॥ না, আমাকে শেষ না করে তোমরা ভেতরে যেতে পারবে না।

সরোজ ॥ ধাক্কাসে হটাও—

[পুলিশ দুজন ধাক্কা মেরে অম্বরবাবুকে সরিয়ে দেয়। অম্বরবাবু চৌকির কোনায় আছড়ে পড়েন। কপাল কেটে রক্ত বেরোতে থাকে। ওরা ভেতরে যায়]

বিজয় ॥ বাবা! এ আপনি কি করলেন? এই বুড়োমানুষটার গায়ে হাত ওঠাতে আপনাদের দ্বিধা হল না?

সরোজ ॥ সরোজ হাজরা হুকুম একবারই দেয়। সে হুকুম না মানলে—তার ফল এইভাবেই ভোগ করতে হয়।

[একজন পুলিশ মঞ্চে ঢুকে বলে]

পুলিশ ১ ॥ সাহাব, ঘরমে কই আদমী নেহি।

সরোজ ॥ আরে বাবা হ্যায় হ্যায়—ঠিক সে দেখো—বাথরুম, পায়খানা, ছাদকা উপর ঢুঁড়ো। [১ম পুলিশ ভেতরে যায়] কোথায় লুকিয়েছ বলে ফেল—নইলে এর চাইতেও বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে যাবে। [দ্বিতীয় পুলিশের প্রবেশ]

পুলিশ ২ ॥ সাহাব, বাথরুমকা দরওয়াজা ভিতরসে বন্ধ হ্যায়, মালুম হোতা হ্যায় ভিতরমে কোই আদমী হ্যায়।

সরোজ ॥ দরওয়াজা তোড় দো। আচ্ছা চল—আমিও যাচ্ছি।

[পুলিশসহ সরোজ হাজরা ভেতরে যায়]

অম্বর ॥ ওঃ, এ আমি কি করলাম—ও কথা কেন আমি বলতে গেলাম—এ আমি কি করলাম—

বিজয় ॥ বাবা!

নেপথ্যে ॥ ভালোয় ভালোয় দরজা খোল। এই শুয়োরের বাচ্চা—এই যে—তুমিই তাহলে শ্রীমান সুকান্ত ব্যানার্জী! ইউ ব্ল্যাডি, বাস্টার্ড, ভেবেছিস আমার চোখে ধুলা দিবি—

[চুলের মুঠি ধরে মঞ্চে আনে ও ধাক্কা মেরে মঞ্চের মাঝখানে ফেলে দেয়]

সরোজ ॥ বলি শালা কত চাঁই চাঁই মালকে ঢিট্ করলাম, আর তুইতো সেদিনের ছোকরা। পার্টি করা হচ্ছে—বিপ্লব আনা হচ্ছে—তুমি শালা উনসত্তর সালে জগদীশবাবুর বাড়ী পাঁচশো লোক নিয়ে চড়াও হয়েছিলে—?

সুকান্ত ॥ সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা—বাজে কথা—

সরোজ ॥ তুমি বাহাত্তর সালে করুণাসিন্ধু পাত্রের বাড়ী বোম মেরেছিলে ?

সুকান্ত ॥ আমি বাড়ীই ছিলাম না। কারা করেছে তাও জানি না—

সরোজ ॥ তুমি কানোয়ার লালের দোকানে ডাকাতি করেছিলে—?

সুকান্ত ॥ সব সাজানো ব্যাপার—

সরোজ ॥ চুপ শালা শুয়োরের বাচ্চা—

বিজয় ॥ দেখুন আমি বলছিলাম—

সরোজ ॥ কিপ সাইলেণ্ট। বল শালা বল— [মুখে ঘুঁষি মারে]

সুকান্ত ॥ মারো—আমাকে মেরে ফেলো। তবু অন্যায় স্বীকার করবো না। আমরা জানি, সারা বিশ্বে তোমরা এমনি করে কম্যুনিস্টদের খতম করতে চেয়েছ—কিন্তু তোমরাই তার বদলে পিছু হটেছ। তোমাদের খুনী বাহিনী এর চেয়ে বীরত্ব আর কি দেখাবে ?

সরোজ ॥ [ঘুষি মারে] চোপ্ রাসকেল, কম্যুনিস্ট। কম্যুনিস্ট কথাটা শুনলে আমার মাথায় খুন চেপে যায়। বলে শালা কত কম্যুনিস্ট বাচ্চাদের এই হাতে শেষ করলাম—

বিজয় ॥ আপনি ভুল বলছেন। ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে—কম্যুনিস্টদের মেরে শেষ করা যায় না। ভিয়েতনাম, কিউবা, কম্বোডিয়া তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সরোজ ॥ আর যেখানে যাই হোক, আমাদের ভারতের মাটিতে ওসব চলবে না। চলতে দেওয়া হবে না— [বিজয় ও সুকান্ত হেসে ওঠে] হাসির কি হল ?

বিজয় ॥ হাসির কথা বললেন তাই !

সরোজ ॥ কি হাসির কথা বললাম ?

সুকান্ত ॥ ঐ যে বললেন না—ভারতের মাটিতে ওসব চলতে দেবেন না।

আমেরিকার মত সাম্রাজ্যবাদীরা পিছু হটছে—আর আপনাদের মত চাটুকারের দল, যারা ভবিষ্যতের ভাষা বোঝে না—যারা সংগ্রামী মানুষের চেতনাকে উপলব্ধি করতে পারে না—কেবল পারে হাজার হাজার মায়ের কোল শূন্য করতে, শত শত নারীর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিতে। শুধু দেশটাকে কারাগারে পরিণত করতে—কিন্তু এর বদলা আমরা না পারি আমাদের উত্তরসূরীরা নিশ্চয় নেবে।

অম্বর ॥ বাঃ বাঃ এইতো সুকান্ত বীরের মত কথা বলছে। সুকান্তের মধ্যে আমি আমার যৌবনকে দেখত পাচ্ছি। পারবি, তোরা পারবি। অন্যায়কে কখনও মাথা পেতে নিবি না। জয় তোদের একদিন হবেই।

সরোজ ॥ স্টপ্। আর একটা কথা নয়। মনে করেছেন এতেই রেহাই পাবেন। সরোজ হাজরা এর চাইতেও কড়া লোক—সেটা টের পাইয়ে দেবো। আমার কাজে কেউ বাধা দেবে না, কেউ কোন কথা বলবে না।

সুকান্ত ॥ ঐ ধমকের কাছে আমাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হবে না। দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে চিৎকার করে—মরার শেষ মুহূর্তেও বলে যাবো—তোমাদের এই অত্যাচার, অবিচারের কাছে কম্যুনিস্টরা কোনদিন বশ্যতা স্বীকার করবে না।

সরোজ ॥ তাহলে দেখ্ তোর ঐ কণ্ঠস্বর আমি স্তব্ধ করে দিতে পারি কি না। আজ আমি এক নতুন খেলা শুরু করবো। ইউ ব্লাডি, তোদের ঐ লালমার্কা বুলি ছেড়ে আমার সাথে বলতে হবে, আমাদের মহান নেত্রীর জয়গান করতে হবে। বল—আমাদের মহান নেত্রী যুগ যুগ জিও। এশিয়ার মুক্তিসূর্য যুগ যুগ জিও—

সুকান্ত ॥ না—বলবো না। বলাতে পারবে না—

বিজয় ॥ শুধু ও নয়, আমরা কেউই বলবো না।

অম্বর ॥ স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা অম্বর রায়ও বলবে না।

সরোজ ॥ তোমাদের সবাইকেই বলতে হবে।

তিনজনে ॥ না—বলবো না।

সরোজ ॥ বলতে হবে।

[সুকান্তকে পিস্তল থেকে গুলি করে। বিজয়, অম্বরবাবু চিৎকার করে ওঠে—তারপর সকলেই নিশ্চল পাথরের মত]

অম্বর ॥ [গভীর নিঃশ্বাস ফেলে] ওঃ কি নির্মম, নিষ্ঠুর! একটা ফুটন্ত যৌবন—তাকে এমনি করে শেষ করে দিল। এরা কি এই দেশের মানুষ? এরা কি ভারতীয়? এদের কি ঘর সংসার, মা, বাবা, ভাইবোন কেউ নেই? কিছু নেই? এদের কি শুধু মানুষের খোলসটা পরানো? হৃদয় বলে কি এদের কিছু আছে?

সুকান্ত ॥ [মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর] আঃ আঃ বিজয়দা—দাদু, আমার মা বাবা, ছোট বোনটা রইলো—ওদেরকে তোমরা বোলো—আমি—আঃ পারছি না—বল যে তোমাদের সুকান্ত মরে নি—সে এই দেশের হাজার হাজার মেহনতি মানুষের মাঝেই রইলো—তাদের মাঝে খোঁজ করলেই আমাকে পাবে—আঃ (মৃত্যু) [মরার সময় হাত মুঠি করে কিছু বলতে যায়, কিন্তু বলতে পারে না]

অম্বর ॥ ফিনিস্। একটা ফুটন্ত যৌবন এরা শেষ করে দিল। একটা লাল আগুনের লেলিহান শিখা মাঝ পথে নিভে গেল। ভাবছ খুব বীরত্ব দেখালে, তাই না? রক্তপিপাসু নরখাদক—চাটুকারের দল—তোমরাও রেহাই পাবে না। ইতিহাস ঠিক এর বিচার করবে।

সরোজ ॥ কোন ফালতু কথা নয়। তাহলে—

অম্বর ॥ কি করবে? আরো একটা গুলি খরচা করবে? করো—এই অম্বর রায় আর পেছপা হবে না। এবার সেও যুদ্ধ ঘোষণা করবে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে—

বিজয় ॥ বাবা তুমি চুপ করো।

অম্বর ॥ আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বলে বেড়াবো, ফ্যাসিজ্ম্ কায়েম হয়েছে—এরা গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটিয়েছে—তোমরা সব সজাগ হও। প্রতিবাদ কর—প্রতিরোধ কর।

সরোজ। সিপাই—ডেড্‌বডি গাড়ীমে উঠাও। এবার চল বিজয়বাবু, তোমাকে আমরা এত সহজে শহীদ হতে দেব না। তোমার জন্যে ব্যবস্থা হবে একটা ছোট কুঠরী—বাইরের আলো যেখানে ঢুকবে না—কারও দেখাসাক্ষাৎ পাবে না। শুধু তোমার কানের কাছে বাজানো হবে কাঁসর আর ঘন্টা—চব্বিশ ঘন্টা ধরে। আমরা যতদিন চাইবো—ঠিক ততদিন। [বিজয় মুচকি হাসে] ঐ হাসি আমরা স্তব্ধ করে দেব।

অম্বর ॥ ওঃ এরা ব্রিটিশকেও হার মানাবে, সুস্থ মানুষকে পাগল করে দেবে !

সরোজ ॥ ইয়েস, আমরাও তো তাই চাই। আপনার ছেলে পাগল হয়ে যখন ছাড়া পাবে ওকে দেখে ভয়ে সবাই শিউরে উঠবে। কেউ আর কম্যুনিস্ট হয়ে হিরো সাজবার চেষ্টা করবে না। আর এদিকে তোমার বৃদ্ধ বাবা হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত জনে জনে তোমার বীরত্বের কথা বলে বেড়াবে। হাঃ হাঃ চল—।

[বিজয় বাবাকে প্রণাম করে]

অম্বর ॥ ভেঙে পড়িস নে বাবা—তোদের জয় একদিন হবেই হবে। আমার আশীর্বাদ তোর মাথায় রইল। [বিজয়কে নিয়ে সরোজ হাজরা বেরিয়ে যায়। দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলেন অম্বরবাবু] বল, বল, বাপুজী—এই ভারত কি তুমি চেয়েছিলে। বল জওহরলাল, এই গণতন্ত্রের স্বপ্ন কি তুমি দেখেছিলে। বল সুভাষ, এই স্বাধীনতার জন্যেই কি তুমি যুদ্ধ করেছিলে ? এরই জন্যে কি হাজার হাজার ভারত মায়ের সন্তান ফাঁসিতে ঝুলেছে ?—কারাবরণ করেছে ?—শহীদ হয়েছে ? তোমরা আমার কাছে শোন—তোমরা আজ এই শাসকগোষ্ঠীর কাছে পরাজিত। এরা তোমাদের সামনে রেখে গদী টিকিয়ে রাখবার মহড়া দিচ্ছে—তোমাদের আদর্শ, তোমাদের থিয়োরীকে পদদলিত করছে। এরা জোর করে জনগণকে দমিয়ে রাখতে চায়, অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ক্ষুধাকে রাইফেলের গুলি দিয়ে এরা স্তব্ধ করে দিতে চায়। ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতিকে এরা যৌন লালসার নোংরা জিনিস দিয়ে আচ্ছন্ন করে দিতে চায়। কিন্তু এরই বিরুদ্ধে সবাই যখন জোটবদ্ধ হয়ে—প্রতিবাদ করে—প্রতিরোধ করে—তখনই এদের বলা হয় দেশদ্রোহী। কিন্তু আজ আমি তোমাদের বলছি—এরাই দেশ প্রেমিক—এরাই দেশকে গড়তে চায়। তাইতো দিকে দিকে শুরু হয়েছে শেকল ভাঙার গান। শোন, ঐ শোন, তোমরা কান পেতে শোন—

[নির্বাচিত কোন গণসঙ্গীত শোনা যাবে ও ধীরে ধীরে পর্দা পড়বে।]

নাট্যকারের ঠিকানা : ১৬ তরফদার পাড়া, আড়পুর (শ্যামনগর), ২৪ পরগনা।

ঢাকের বাদ্যি

অসীম মৈত্র

[মনে রাখতে হবে—১৯৭৪ সালের রেলধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরে, জরুরী অবস্থার আগে এবং পরে আকাশ বাণী এবং অন্যান্য প্রচার সংস্থার যে নির্লজ্জ ভূমিকা আমাদের বিরক্তি ও পীড়া উৎপাদন করেছিল, তারই ফলশ্রুতি এই নাটকটি সেই সময়েই লেখা হয়েছিল কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তখন অভিনীত বা প্রকাশিত হয় নি।]

●

চরিত্র

ঢাকী
মহামন্ত্রী
অমাত্যগণ
প্রতিহারী
প্রশস্তিকারীগণ
বেতারভূষণ
বিসংবাদবাবু
মিঃ টিভি
শ্রীকাকম্‌
আগন্তুক
প্রধান ভৃত্য
প্রজাগণ

[প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে যেতেই মঞ্চে বেজে ওঠে ঢাক। নানা কায়দায় বেশ জোরে জোরে কিছুক্ষণ বাজতে থাকে। স্বভাবতই দর্শকগণ একটু বিরক্তি বোধ করেন। এইবার সামনের পর্দা ফাঁক করে একজন ঢাকী দর্শকদের সামনে বেরিয়ে এসে ২।৪ বার ঢাক বাজায়। এরপর কাঁধের ঢাকটি নামিয়ে রেখে গড় করে এবং সুর করে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে......]

ঢাকী ॥ শুনুন, শুনুন, মহাশয়—ভদ্র সভাজন,
পাংশুপুরের ঢাকের বাদ্যি করি যে বর্ণন।
এই ঢাক, মহাঢাক, সর্বদাই বাজে—
কান ঝালাপালা তবু সতত বিরাজে।
কেন এই ঢাকের বাদ্যি করি নিবেদন,
আজগুবি এই কথা, তবু শুনুন দিয়া মন ॥
(বোল) নেই ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্
নেই ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্, গুড়্ গুড়্ ॥
পাংশুপুর নামে এক আছে মহাদেশ,
প্রজারা পায়না খেতে তবু আছে বেশ।
রাজার প্রবল তেজ, যেন তেজপাতা,
মহামন্ত্রী আসল যন্ত্রী ঘোরান তিনি যাঁতা।
রাজার নামে মহামন্ত্রী চালান শাসনকার্য
যথা ইচ্ছা তথা করেন, না হয় বিচার্য ॥
অতিষ্ঠ হইয়া তবে ক্ষেপে প্রজাগণ,
মহা আইন জারী হৈল করিতে দমন।
একদিকে চলে দেশে প্রজা উৎপীড়ন
অন্যদিকে প্রচার হ'ল—হ'চ্ছে উন্নয়ন ॥
আদেশ হ'ল চতুর্দিকে বাজাও তবে ঢাক
সত্য সব যাক ভেসে, মিথ্যে থাকে থাক।
তাই ঢাক বেজে চলে সকাল হতে রাত
প্রজাকুলের কানে ব্যথা, ঢাকীর হাতে বাত ॥
(বোল) নেই ঢাক্ ঢাক্……… ॥

[ঢাকী কি যেন বেঁফাস বলে ফেলেছে এইভেবে সভয়ে এদিকে ওদিকে তাকায়]

ঢাকী ॥ এই রে……! কি সব উল্টোপাল্টা বলে ফেলেছি। মহামন্ত্রীর কানে গেলে নির্ঘাৎ শূলে চাপাবেন। তা বাবু মশাইরা, আপনারা একটু আমার হয়ে বলবেন। আমি বাবু মরক্কু মানুষ, অধম প্রজা। ঢাকী।

ঢাক বাজাই, খাই। মহামন্ত্রী বলেছেন, তাই বাজাচ্ছি। হাতে বাত ধরে গেছে, তবু উপায় নেই। বাজাতেই হবে। কথা কম কাজ বেশী। তাই কাজই করে যাচ্ছি। কিন্তু বাবুমশাই—চুপি চুপি বলি, ব্যাপার-স্যাপার দেখে মন্দ লাগছে, তাই সব গড়্গড় করে বলে ফেলেচি। বললে পেত্যয় যাবেন না……না বাবা আর বলবো নি, কে কোথা শুনে ফেলবে আর গর্দান যাবে। এক কাজ করো না বাবুরা, তোমরা চলো না আমাদের পাংশুপুরে। কি দরকার পরের মুখে ঝাল খাওয়ার। তার চে চলো আমাদের পাংশুপুরে। এসো আমার সাথে……

[ঢাকী ঢাক তুলে নিয়ে পর্দা সরিয়ে মঞ্চের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সব আলো নিভে যায়। ভেরী বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামনের পর্দা সরে যায়। দেখা যায় মহামন্ত্রী দর্শকের দিকে পিছন ফিরে মধ্যমঞ্চে চিন্তারত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সামনে দু'জন অমাত্য উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে। ডানদিকে প্রতিহারী বিরাট এক খাঁড়া হাতে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছে। (মঞ্চের পিছনে কালো পর্দায় রাজা-রাজড়ার কোন একটি প্রতীক চিহ্ন সাঁটা থাকলে ভাল হয়) অমাত্যগণ বারবার মহামন্ত্রীর দিকে তাকায় কিন্তু মহামন্ত্রী অবিচল। একসময় মহামন্ত্রী আজগুবি ঢংয়ে কথা বলতে সুরু করেন।]

মহামন্ত্রী ॥ উঃ! কি সাংঘাতিক! ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। বিরাট এক বিপর্যয়ের হাত থেকে রাজ্যকে আমি বাঁচিয়েছি। ঠিক সময়মত ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছিলাম তাই—তা না হ'লে রাজ্যের অবস্থাটা কি হতো—বলতো ?

১ম অমাত্য ॥ সত্যিই স্যার, ভাবাই যায় না পর পর ঘটনা গুলো মনে পড়লেই মাথাটা কেমন বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে থাকে। উঃ! আপনি যদি না সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তবে আজ রাজ্য রসাতলে যেত। আর আমরা খড়কুটোর মত ভেসেই যেতাম। উঃ! কি ভয়াবহ ব্যাপার।

২য় অমাত্য ॥ মনে হয় এটা কিছু বিদেশী রাষ্ট্রের গোপন উস্কানীর ফল। অনেকদিন ধরেই তারা গোপনে দেশের বিদ্রোহী প্রজাদের মদত দিচ্ছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে গোয়েন্দা বিভাগ জানিয়েছিল কিন্তু উনি কানেই নেননি।

আপনি কিন্তু আশ্চর্যভাবে সব ধরে ফেলে নজির বিহীন অদ্ভুত কায়দায় সবকিছু ভেস্তে দিয়েছেন। ধন্য আপনি! আর আমরাও ধন্য আপনার ছত্রছায়ায় থেকে।

১ম অমাত্য ॥ মনে হয় বিদেশমন্ত্রী এই ষড়যন্ত্রে পরোক্ষে লিপ্ত ছিলেন। তা না হলে—

মহামন্ত্রী ॥ বিদেশমন্ত্রীর ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক কিন্তু—

১ম অমাত্য ॥ আপনার মনে যখন সন্দেহ জেগেছে তখন ওঁকে পদচ্যুত এবং বন্দী না করে স্বপদেই বহাল রেখেছেন—এ'টাই আমাদের কাছে এক বিস্ময়কর ঘটনা।

২য় অমাত্য ॥ হ্যাঁ স্যার, এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে কেমন যেন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে ঠেকছে। অনুগত বহু প্রজাই এর রহস্য কি তা জানতে উৎসুক। মানে—

মহামন্ত্রী ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! এটা হচ্ছে আমার আর একটা নিজস্ব ঢং। এর নাম হ'ল 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা উৎপাটন' পদ্ধতি। পরে সময় পেলে এই পদ্ধতি সম্পর্কে একটা বই লিখব ভাবছি।

১ম অমাত্য ॥ হ্যাঁ স্যার, তাহলে দেশের খুব উপকার হবে। ভাবীকালের দেশবাসীর জন্য এটা একটা অমূল্য গ্রন্থ হবে।

মহামন্ত্রী ॥ ও বিষয়ে পরে ভাবা যাবে। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—ব্যাপারটা কি জান—দেশের বিশেষ কয়েক শ্রেণীর প্রজা, যারা সংখ্যায় বেশী, তাদের উপর বিদেশমন্ত্রীর খুবই প্রভাব। তাই ওঁকে পদচ্যুত বা কারারুদ্ধ করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এই সব ভেবেই—

২য় অমাত্য ॥ আপনার ধারনা অকাট্য! কিন্তু আপনার উপর সব শ্রেণীর প্রজাদের সমর্থন অঢেল। তাই আপনার এত প্রভাব প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বে আপনি বিদেশ মন্ত্রীকে—

মহামন্ত্রী ॥ আরে বাবা সবুরে মেওয়া ফলে। কিছুদিন যেতে দাও তারপর আমার খেলা দেখতে পাবে। তোমরা কি ভাব আমি চুপচাপ বসে আছি? মাছ আমি খেলিয়ে ডাঙায় তুলি—বুঝেছো?

২য় অমাত্য ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

মহামন্ত্রী। ওর পেছনে গুপ্তচর লাগিয়েছি, টেলিফোনে আড়ি পাতার ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া পরোক্ষে হেনস্তা করার সুব্যবস্থা নিয়েছি। এক কথায় একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেছেন তোমাদের ঐ বিদেশমন্ত্রী —হাঃ হাঃ হাঃ!

১ম অমাত্য। সত্যি স্যার আপনার বুদ্ধির তুলনা হয় না। মাঝে মাঝে মনে হয় রাজ্যের মহাময়দানে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে হরিনাম সংকীর্তনের মত অষ্টপ্রহর আপনার নামগানের ব্যবস্থা করি।

মহামন্ত্রী॥ (প্রশয়ের হাসি হেসে) হেঁ-হেঁ-হেঁ! কি যে বল! একবার আরম্ভ করলে আর তোমরা থামতে চাও না। থামো হে থামো।

১ম অমাত্য॥ কিন্তু স্যার, গুণীর গুণগান করা তো মানুষের মহান কর্তব্য।

২য় অমাত্য। আসলে ব্যাপার কি জানেন স্যার? ঐ যে আজকাল বিদেশ থেকে টেপ-রেকর্ডার নামে যে বিচিত্র যন্তর পাচার হয়ে এদেশে ঢুকেছে, সেই যন্তরের মধ্যে কথাওলা ফিতে ঢুকিয়ে দিয়ে বোতাম টিপলে বার বার কথাগুলো শোনা যায়। আমরাও ঐ রকম এক একটা যন্তর বিশেষ। হেঁ-হেঁ-হেঁ (বিনয়ে গলে যেতে চায়)

মহামন্ত্রী॥ দেখ, তোমরা যে আমাকে ভালবাস, তোষামোদ কর, তা বেশ বুঝি কিন্তু তোমাদের তোষামোদ মন্দ লাগে না।

২য় অমাত্য॥ কিন্তু স্যার তোষামোদ করা ছাড়া আমাদের দ্বারা আর যে কিছুই করা সম্ভব নয়। কেন এরকম হয়—এ কথা বলাতে আমাদের রাজবৈদ্য বলেছেন যে এটা এক ধরনের অদ্ভুত রোগ। কালে কালে কিছু মানুষ এই রোগাক্রান্ত হয়। এতে শরীরের নার্ভগুলো ঐ ফিতেওলা যন্তরের ফিতের মতই কাজ করে। অর্থাৎ জয়গান করা ছাড়া আমাদের নার্ভগুলো আর কিছুতেই সাড়া দেবে না। আর এ রোগ নাকি সারে না।

মহামন্ত্রী। অদ্ভুত রোগ তো! তা রাজবৈদ্য কোন ওষুধ বিষুধ বলে দেন নি?

২য় অমাত্য॥ বললাম তো স্যার, এ রোগ সারে না তাই ওষুধও নেই।

মহামন্ত্রী॥ তা এই অদ্ভুত রোগের নাম কি?

২য় অমাত্য ॥ বড় উদ্ভট্ নাম, স্যার। রাজবৈদ্য বলেছেন এর নাম হ'ল চাম্‌চেকিত্তা।

মহামন্ত্রী ॥ বড় ভজকট নাম তো, মনে রাখা শক্ত। ভাগ্যিস্ চিকিৎসা-শাস্ত্রটা শিখিনি, তাই রক্ষে! নতুবা ঐ সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি নাম মনে রাখতে গিয়ে মাথাটাই ভজকট হয়ে যেত।

১ম অমাত্য ॥ যা বলেছেন স্যার, আসলে বস্তিগুলো মানুষই নয়। মানুষ হলে ঐ বিচ্ছিরি নামগুলো মাথায় রাখতে পারতো? আমাদের তো স্যার ঐ সব নাম শুনলেই গা ঘুলোয়।

মহামন্ত্রী ॥ যাকগে ওসব কথা। দেখুন অমাত্যগণ (গম্ভীর হয়ে পদচারণা করেন) আজ আপনাদের বিশেষ কারণে মন্ত্রণার জন্য ডাকা হয়েছে। বেশ কয়েকদিন হ'ল মহাআইন জারি হয়েছে। কেন এই আইন জারি হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য কি তা নিশ্চয়ই আপনারা অবগত আছেন?

অমাত্যগণ ॥ হ্যাঁ স্যার, সে আর বলতে—

মহামন্ত্রী ॥ মহাআইন জারি করে আপনাদের বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, আসল ক্ষমতা কিন্তু রাজার নামে আমার করায়ত্ত?

১ম অমাত্য ॥ এ কথা আমাদের মনে করানো দরকার নেই, স্যার।

মহামন্ত্রী ॥ প্রশাসনের ভেতরের কথা কিংবা আমার গোপন নির্দেশ কোন ক্রমেই প্রকাশ করা চলবে না। প্রতিটি নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে, নতুবা সমূহ বিপদ। আর একটা কাজ করতে হবে—

২য় অমাত্য ॥ বলুন স্যার, আমরা সব করতে রাজী।

মহামন্ত্রী ॥ প্রচার করতে হবে। আপনাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবিরাম প্রচার চালিয়ে যাবেন যে দেশের প্রচণ্ড উন্নতি হচ্ছে এবং আরও—আরও হবে। জনগণের দুঃখ দুর্দশা চিরতরে দূর করার এক বিশেষ প্রকল্প আমি অনুমোদন করেছি। বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিকগণের সহায়তায় দেশের হরিপাল ক্ষেত্রে এক বিশেষ সঞ্চয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হবে। জনগণ ইচ্ছে করলেই এখানে তাদের দুঃখ জমা রাখতে পারবে।

এরজন্যে অবশ্য কর ধার্য করা হবে। পরে এই ব্যাঙ্ক সারাদেশের সকল ক্ষেত্রেই স্থাপন করা হবে।

১ম অমাত্য ॥ দুঃখ জমা রাখার ব্যাঙ্ক! এতো অভিনব!

মহামন্ত্রী ॥ হ্যাঁ। এই প্রকল্পের সাহায্যে দেশ থেকে দুঃখ দূর করা হবে। আর দুঃখ থাকবে না।

২য় অমাত্য ॥ অপূর্ব পরিকল্পনা! অভূতপূর্ব!

১ম অমাত্য ॥ প্রতিহারী—তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও, প্রশস্তিকারীগণকে সভায় আসতে বল।

প্রতিহারী ॥ তা আর বলতে। ইশারা পাচ্ছিলাম না তাই কিছু করতে পারছিলাম না। (যেতে গিয়েও ফিরে আসে) কিন্তু এরপর আবার ক'দণ্ড পর আসতে বলব, স্যার?

১ম অমাত্য ॥ সভাকক্ষের বাইরে অপেক্ষারত থাক, ইশারা করলেই চলে আসবে। এখন ডাকো, ডাকো, ওদের ডাকো, ক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, শিগ্‌গির আসতে বল।

প্রতিহারী ॥ (শিস্ দেয়) এসে যাও, হে প্রশস্তিকারীগণ, সভায় হাজির হয়ে প্রশস্তিগান গাও……

[৩ জন বা ২ জন কলের পুতুলের মত এসে মঞ্চের সামনে সার দিয়ে দাঁড়ায় এবং দম দেওয়া পুতুলের মত গলা ফুলিয়ে গান গায়]

প্রশস্তিকারীগণ ॥ জয় জয় জয়! শাহ্ মহামন্ত্রীর জয়।

দেশের তিনি হাল ধরেছেন, আর নাইকো ভয়।

দুঃখ কষ্ট যাবে মিটে

ভোরের আলো উঠবে ফুটে

সন্তাদরে মিলবে ঘুঁটে

অভাব পাবে লয়॥

শাহ্ মহামন্ত্রীর জয়॥

[গানের শেষে গায়কগণ পুতুলের মতই চলে যায়]

মহামন্ত্রী ॥ না না এসবের কি দরকার ছিল। আমার আবার জয়গান কেন?

আমি কে? জনগণ আর দেশের দীন সেবক মাত্র। প্রজাদের প্রতিনিধিত্ব আর রাজার নির্দেশ পালন করা ছাড়া আর কিছুই আমি করতে পারি না! সেবা করা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি—কি বল হে!

প্রতিহার॥ কিন্তু স্যার, রাজা—

মহামন্ত্রী॥ চোপ্—(প্রচণ্ড ধমকে প্রতিহারী বিষম খায়) আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখতে যেও না। এ সব আমি মোটে দেখতে পারি না। তুমি মাঝে মাঝে বেশী কথা বল। এমন করলে তোমাকে আর স্বপদে বহাল রাখা যাবে না। তোমাকে আমি—

প্রতিহারী॥ ব্যস্, ব্যস্! আর এগোবেন না স্যার। এতেই আমার এগারটা বেজে গেছে। মরে যাব স্যার, ছেলেমেয়ে নিয়ে একেবারে পথে বসব। জানেন তো স্যার, পরিবার-পরিকল্পনা আমাদের কালে না থাকার জন্যে ঘেটের মুখে নুড়ি জেলে আমার ১৪টি সন্তান। এবার কার মত—

মহামন্ত্রী॥ ঠিক আছে ঠিক আছে। তোমাকে আর বংশতালিকা প্রকাশ করে কাঁদুনি গাইতে হবে না। তোমাকে না হাজারবার বলেছি—কথা কম কাজ বেশী।

প্রতিহারী॥ কিন্তু স্যার, ঐ কাজ বেশী করতে গিয়েই তো—চোদ্দ

মহামন্ত্রী॥ আরে মূর্খ! ও কাজ নয়। দেশের কাজ, দশের কাজ। নিজের কাজ নয় আহম্মক—বুঝলে?

প্রতিহারী॥ জলের মত। এরপর থেকে আর মুখই খুলব না।

মহামন্ত্রী॥ জেনে রাখ, এ দেশে রাজাই সব। কিন্তু আমরা থাকতে রাজা কষ্ট করবেন কেন? রাজা এবং প্রজার প্রতিনিধি হিসাবে আমরা রাজ্যের উন্নতির জন্যে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করব। এইটাই আমাদের ব্রত। রাজা পরিকল্পনা করবেন, নির্দেশ করবেন, আজ্ঞা করবেন আর আমরা তার সার্থক রূপ দেব। এইটাই রীতি এবং বিধি।

১ম অমাত্য॥ অবশ্যই, অবশ্যই।

২য় অমাত্য॥ এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মহামন্ত্রীর নির্দেশনামায় সব কিছুই সরলভাবে বর্ণিত আছে। এখন মহা আইন

জারী আছে। রাজ্যে চরম শান্তি বিরাজ করছে। মুখ বুজে কঠোর শ্রমের দ্বারা সকল দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা দূর করতে হবে। এর কোন বিকল্প আর কিছুই নেই।

১ম অমাত্য ॥ জয় আমাদের হবেই। মহা আইন দেশের রক্ষাকবচ। এই সুযোগে দেশকে শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও মহান করে তুলতে হবে। যারা এর বিরোধিতা করবে বা বাধা দেবে তারা দেশদ্রোহী। তাদের চরম শাস্তি দিতে হবে। এ' দেশে তাদের স্থান নেই। কি বলুন স্যার, ঠিক বলিনি?

মহামন্ত্রী ॥ হুম্……(কি যেন চিন্তা করেন) তোমরা একটু চুপ কর। আমার মগজে কি যেন একটা উঁকি ঝুঁকি মারছে। কি যেন…… আমি একটু চিন্তা করব……

২য় অমাত্য ॥ (ব্যস্ততা প্রকাশ করে) ওরে সবাইকে চুপ করে থাকতে বল্। প্রতিহারী! সাইরেন বাজিয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া হোক, মহামন্ত্রী চিন্তা করতে শুরু করেছেন।

[প্রতিহারী তাড়াতাড়ি চলে যায়। একটু পরে বাইরে সাইরেনের শব্দ শোনা যায়। মহামন্ত্রী পদচারণা করতে থাকেন। অমাত্যগণ সশঙ্ক ভঙ্গীতে নিঃশব্দে মহামন্ত্রীকে লক্ষ্য করতে থাকে]

মহামন্ত্রী ॥ হ্যাঁ,—আমার চিন্তা করা আপাততঃ শেষ। এরপর আমি একটু আলোচনা করব।

[প্রতিহারী প্রবেশ করে]

১ম অমাত্য ॥ হ্যাঁ স্যার, আলোচনা করুন। আমরা প্রস্তুত।

প্রতিহারী ॥ তাহলে কি অল কিলিয়ার সাইরেন বাজাতে বলব?

মহামন্ত্রী ॥ খবর্দার নয়। আচ্ছা আহম্মক দেখছি! এই সঙ্কটময় অবস্থায় রাজ্যে কক্ষণও অল কিলিয়ার সাইরেন বাজবে না, বুঝলে? প্রজাদের সবসময়েই আশঙ্কাময় অবস্থায় রাখতে হবে। ওদের বিমূঢ় করে না রাখলে বিরোধী, কুচক্রীরা আবার সুযোগ নিতে পারে। এইটুকুও কি তোমাদের মাথায় আসে না?

প্রতিহারী ॥ মাথাটার জন্যেই কিছু হোল না, স্যার! ধড়ের উপর বেশ বসে

আছে অথচ কিছুই করতে পারছে না। ঐ জন্যেই তো সারাজীবন প্রতিহারীই হয়ে রইলাম আর আমার চেয়ে যারা জুনিয়ার তারা……

মহামন্ত্রী ॥ থাক্ থাক্, ওসব কথা থাক। মোটকথা কথায়, কাজে আচারে বিচারে এমন কিছু করবে না যে ওরা আবার সুযোগ পায়। অনেক কৌশলে ওদের দমন করা হয়েছে, তাই বলে ভেব না ওরা শেষ হয়ে গেছে। ফাঁক পেলেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই তো তোমাদের বারবার বোঝাচ্ছি যে কোন কিছুতেই বেসামাল হলে চলবে না।

২য় অমাত্য ॥ সত্যিই স্যার, আপনার দূরদৃষ্টির তুলনা মেলে না। আপনার মত এমন একজন বিচক্ষণ নেতা পেয়ে দেশ ধন্য।

১ম অমাত্য ॥ এবং আমরাও।

২য় অমাত্য। আমরা যতই দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি।

মহামন্ত্রী ॥ শুধু দেখলেই হবে না, কাজ করতে হবে। আমার কার্যক্রম আর নির্দেশবাণী জনগণের কানের ফুটো ভেদ করে মনের মধ্যে গেঁথে দিতে হবে। এরজন্যে রাজ্যময় এক বিশেষ প্রচার অভিযান চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে প্রচারমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছি। প্রতিহারী— প্রচারমন্ত্রীকে সভায় আসতে বলা হোক।

প্রতিহারী ॥ যথা আজ্ঞা, স্যার—[প্রতিহারী চলে যায়]

মহামন্ত্রী ॥ শুনুন, মহামাত্যগণ! এই কর্মযজ্ঞের সার্থক রূপায়ণ কেবলমাত্র মন্ত্রীগণ বা সরকারী ব্যবস্থার দ্বারা সম্ভব নয়। আমাদের এবং প্রজাদের সমবেত এবং নিরলস প্রচেষ্টা চাই! বিরোধী পক্ষ ইতিমধ্যেই অপপ্রচার দ্বারা বেশ কিছু প্রজাদের বিপথগামী করে তুলেছে। তাই প্রজাদের বাগ মানিয়ে বাধ্য করাতে আপনাদের অনুরক্ত ভক্তবাহিনীকে কাজে লাগাতে হবে। দরকার হলে বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা করা হবে না।

১ম অমাত্য ॥ আপনার নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমরা ইতিমধ্যেই ভক্ত বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছি। দেশময় ত্রাস ও বিভীষিকার সঞ্চার হয়েছে।

২য় অমাত্য ॥ প্রজাগণ ভয়ে বোবা হয়ে গেছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ দূরে থাক মুখ বুজে অন্যায়কেই মেনে নিচ্ছে। কিন্তু একটু মুস্কিল হয়েছে যে

স্যার—

মহামন্ত্রী ॥ মুস্কিল ? মুস্কিল হ'ল কেন !

২য় অমাত্য ॥ স্যার, আমাদের ভক্ত পরিষদের সক্রিয় সদস্যদের চাঙ্গা রাখতে —ইয়ে মানে বুঝতেই পারছেন, একটু বেশী করে মাল মশলা আর রসদের দরকার হয়ে পড়েছে।

১ম অমাত্য ॥ মানে এতদিন যে কোটা ছিল তাতে কুলাচ্ছে না।

মহামন্ত্রী ॥ ও নিয়ে তোমাদের ভাবনার কোন কারণ নেই। আমি এর মধ্যেই নেশার উপকরণ এবং অস্ত্রশস্ত্রের কোটা বাড়িয়ে দিতে বলেছি। কোন চিন্তা নেই। ভক্ত বাহিনীকে কাজ করে যেতে বল, তাদের যাযা দরকার দেশে তার কোন অভাব নেই।

২য় অমাত্য ॥ আমরা জানতাম, এ বিষয়েও আপনি নিশ্চয় ভেবেচিন্তে সব ঠিক করে রেখেছেন।

মহামন্ত্রী ॥ শুধু তাই নয়, তারা যাতে নির্বিঘ্নে এবং নিঃসঙ্কোচে কাজ করতে পারে তার জন্যে আগেভাগেই মহাসচিব, মহারক্ষক এবং মহাখাজাঞ্চীকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে রেখেছি। কাজের যথাযথ মূল্য দেওয়া হবে।

১ম অমাত্য ॥ না স্যার, আমাদের কোন চিন্তা নেই। এবার আমরা এবং আমাদের ভক্ত বাহিনী জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করে যাব।

২য় অমাত্য ॥ সত্যি আমরা কত নিশ্চিন্ত ! যেন পর্বতের আড়ালে রয়েছি। এ' এক পরম সৌভাগ্য। প্রতিহারী প্রতিহারী—

১ম অমাত্য ॥ প্রতিহারী প্রচারমন্ত্রীকে ডাকতে গিয়েছে। কি দরকার ?

২য় অমাত্য ॥ প্রশস্তিকারীদের আর একবার সভায় আসতে বলার প্রয়োজন। ক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আপনিই ওদের খবর দিন।

১ম অমাত্য ॥ বটেই তো। এই যে আমি ডাকছি ওদের (এগিয়ে গিয়ে ডাকে) কৈ হে—তোমরা আবার সভায় এসে জয়মালা অনুষ্ঠানে বন্দনা-গীতি গাও…

[আবার সেই প্রশস্তিকারীগণ আগের মত ভঙ্গীতে সভায় এসে গান গায়।]

প্রশস্তিকারীগণ ॥ জয় জয় জয়, গাহ মহামন্ত্রীর জয়।
তাঁর কৃপাতে আসবে সুখ দুঃখ পাবে লয় ॥

রাজ্য জুড়ে কর্মকাণ্ড হয়ে গেছে শুরু
পুকুরেতে খেলবে ইলিশ, চড়বে গাছে গরু
তাই ধন্য মহামন্ত্রী আর ধন্য এই দেশ
তিনিই দেশের মুক্তি সূর্য, তিনিই পরমেশ ॥
আহা বেশ, বেশ, আহা বেশ, বেশ, বেশ ॥

[গায়ক দলের প্রস্থান]

মহামন্ত্রী ॥ প্রচারমন্ত্রীর এত দেরি হচ্ছে কেন? কি ব্যাপার?

১ম অমাত্য। ঐ তো স্যার, উনি আসছেন। সঙ্গে আরও কে কে যেন আছেন।

[প্রচারমন্ত্রী ও প্রতিহারী সভায় এসে মহামন্ত্রীকে অভিবাদন জানায়]

প্রঃ মন্ত্রী ॥ মহামন্ত্রীর জয় হোক!

মহামন্ত্রী ॥ এই যে প্রচারমন্ত্রী, তোমার কথাই ভাবছিলাম—

প্রঃ মন্ত্রী ॥ (ভয়ে ভয়ে) কেন স্যার, তবে কি আমাকে পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে হবে।

মহামন্ত্রী ॥ না না ওসব ব্যাপার নয়। প্রচারের ব্যাপারে কতদূর এগোলে এবং কতদূর কি করেছো এবং কি করতে চাও তার বিশদ বিবরণ চাই। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরামর্শ করতেই তোমাকে ডেকেছি।

প্রঃ মন্ত্রী। এতো পরম সৌভাগ্য! কিন্তু স্যার, কোন চিন্তা করবেন না। আমি সব পাকাপোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আপনার আশীর্বাদে দায়িত্ব পেয়েছি যখন, তখন আপনাকে খুশী করার মতোই কাজ করবো। সব কিছুর বিবরণ এবং নমুনা দেখলে আপনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন। এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

মহামন্ত্রী ॥ তাই নাকি! তা কি রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছো?

প্রঃ মন্ত্রী। আজ্ঞে স্যার, মহামতি গোয়েবলের দর্শন অনুযায়ী আমি সমস্ত প্রচার ব্যবস্থার ছক করে ফেলেছি।

মহামন্ত্রী ॥ গোয়েবল! সে আবার কে?

১ম অমাত্য। ফুটবল, ক্যাম্বিসের বল, দুর্বল, সবল এসব তো শুনেছি গোয়ে—

প্রঃ মন্ত্রী ॥ থামুন আপনারা—ঘরের দেওয়ালের বাইরে জগৎটা যে কত বড় তা তো কোনদিন জানলেন না, তাই এ ধরনের কথাবার্তা বলছেন।

মহামন্ত্রী ॥ আহা-হা—সকলে সব কিছু জানে না। তুমিই বল না কে ঐ মহামতি গোয়েবল ?

প্রঃ মন্ত্রী ॥ (মাথা চুলকে) কে তা সঠিক ভাবে জানা যায় নি—কারণ সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ ঘেঁটেও তাঁর হদিশ মেলেনি। তবে, আমার সচিবকে অঙ্কের বইগুলো ভাল করে খুঁজে দেখতে বলেছি। মনে হয় ওতেই মিলবে।

মহামন্ত্রী ॥ তা সে চুলোয় যাকগে যাক্! নামে কি আসে যায় ? তা তাঁর দর্শন কি বলছে ?

প্রঃ মন্ত্রী ॥ বলছে—একটা মিথ্যাকে যদি 'সত্যি' 'সত্যি' বলে বারবার নানা কায়দায়, নানা কৌশলে প্রচার করা যায় তবে, মিথ্যাকেও লোকে সত্যি বলে মেনে নেয়। অর্থাৎ প্রচারের কৌশলে মানুষকে বোকা বানানো সম্ভব। এটা নাকি ঐ মহামতি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করে পৃথিবী খ্যাত হয়েছেন।

মহামন্ত্রী ॥ তাই নাকি! তাহলে তো এটা একটা অদ্ভুত দর্শন!

১ম অমাত্য ॥ দিব্যদর্শনও বলতে পারেন।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ তা বলতে পারেন। আমিও পরীক্ষা করে হাতে হাতে ফল পেয়েছি।

মহামন্ত্রী ॥ কি রকম ? কি রকম ?

প্রঃ মন্ত্রী ॥ বিগত রাজ্যব্যাপী পরিবহন ধর্মঘটের সময় বেতার মারফৎ অহরহ প্রচার করা হয়েছিল যে সব গাড়ী ঠিকমত চলছে, ধর্মঘট কার্যতঃ ব্যর্থ হয়ে গেছে—এতে কর্মীদের মনোবল ভাঙতে থাকে এবং ক্ষেপে ক্ষেপে কাজে যোগদান করতে থাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল মিথ্যা প্রচারের দ্বারা ধর্মঘট ভেঙে দেওয়া গেছে।

মহামন্ত্রী ॥ হ্যাঁ এতে তুমি সফল হয়েছিলে বটে! এরজন্যে অবশ্য তোমাকে আমি পুরস্কৃত করেছিলাম।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ হ্যাঁ মহামন্ত্রী। সব সাফল্যই ঐ মহামতি গোয়েবলের দর্শনের জন্য।

মহামন্ত্রী ॥ হুম্—প্রতিহারী ! শিল্পমন্ত্রীকে বলে দিও যে এই মহামতি গুয়েবল না কি যেন নাম, তাঁর একটা আবক্ষ মূর্তি মহা রাজপথের সংযোগস্থলে অবিলম্বে স্থাপন করতে।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ কিন্তু স্যার, মূর্তি তৈরী করবে কি করে ? ওঁর কোন ছবি পাওয়া যায় নি যে !

মহামন্ত্রী ॥ তাতে কি হয়েছে। আন্দাজ মত করলেই হবে। মূর্তির তলায় নামটা বড় করে লিখে দিলেই হবে। বুঝলে ?

২য় অমাত্য ॥ অভাবনীয় সমাধান !

১ম অমাত্য ॥ এই জন্যেই তো আমরা মহামন্ত্রীকে আমাদের মুক্তিসূর্য বলে আখ্যা দিয়েছি।

২য় অমাত্য ॥ সত্যিই আমরা ধন্য। সৌভাগ্যবান !

মহামন্ত্রী ॥ যাক্—এখন কাজের কথা হোক। যে কথা বলছিলাম (থেমে গিয়ে মনে করতে থাকেন)··· কি কথা বলছিলাম ?

প্রতিহারী ॥ আমি বলব স্যার ?

মহামন্ত্রী ॥ তুমি !

প্রতিহারী ॥ অনেকক্ষণ থেকে চুপ করে আছি, স্যার। অমাত্যদের জন্যে একদম সুযোগ পাচ্ছি না।

মহামন্ত্রী ॥ বেশ, সুযোগ দিলাম। বল, তুমিই বল।

প্রতিহারী ॥ আপনি প্রচার অভিযানের কথা বলছিলেন, স্যার।

মহামন্ত্রী ॥ বাঃ ! তোমার স্মরণশক্তি তো বেশ ! ঠিক ধরিয়ে দিয়েছো। উত্তম—বর্তমান সেনাধ্যক্ষ নিতান্তই বৃদ্ধ হয়েছেন, চিন্তা করছি তোমাকেই···

প্রতিহারী ॥ আর বলতে হবে না স্যার, এতেই আমার হৃদয় ধক্‌পক্ করতে সুরু করেছে ! এখন স্যার, আমাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে ছুটি দিন।

মহামন্ত্রী ॥ কেন, ছুটি কেন ? এই সঙ্কটময় অবস্থায় ছুটি কি হবে ?

প্রতিহারী ॥ স্যার, পদোন্নতির খবরটা আমার গৃহিণীকে চট্ করে জানিয়ে আসতাম। চিরকাল একই পদে বহাল আছি আর এই পদে উৎকোচ

নেওয়ার কোন সুযোগ না থাকায় আমার পারিবারিক অবস্থাও খুব সঙ্কটপূর্ণ। তাই এমন একটা সুখবর—

মহামন্ত্রী ॥ বাজে বকো না। ওসব ন্যাকামী করার অনেক সময় পাবে। যাও, যাও—নিজের কাজে যাও। হ্যাঁ, কি যেন—

প্রতিহারী ॥ প্রচার অভিযান, স্যার।

মহামন্ত্রী ॥ প্রচার—হ্যাঁ। প্রচার মন্ত্রী, তোমার ঐ মহামতির দর্শন অনুযায়ী কিভাবে প্রচার ব্যবস্থা করেছো, একটা খসড়া বিবরণ দাও তো, দেখি—

প্রঃ মন্ত্রী ॥ বিবরণ কেন স্যার ? মহড়ার সাহায্যে চাক্ষুষ নমুনা প্রদর্শন করিয়ে দিতে পারি। এখন অনুমতি দিলেই হয়।

মহামন্ত্রী ॥ তাই নাকি ? তাহলে তো বেশ ভালই হয়। বেশ—তুমি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করো, আমরা সবাই দেখবো।

[প্রচার মন্ত্রী একপাশে সরে গিয়ে ঘণ্টা বাজালে তিনজন মঞ্চে প্রবেশ করে। প্রথমজন খবর-কাগজের টুকরো সাঁটা পাজামা ও পাঞ্জাবী এবং মাথায় খবরের কাগজের চোঙ্গা টুপি—ইনি বিসংবাদবাবু। দ্বিতীয়জন হাওয়াই শার্ট ও প্যাণ্ট গলায় একটা পীচবোর্ডের ব্যানার ঝোলান তাতে রেডিওর ছবি এবং তাতে 'পাংশুবাণী' লেখা—ইনি হলেন বেতার ভূষণ। তৃতীয়জন কোট প্যাণ্ট এবং টাই পরা গলায় ঝোলানো ব্যানারে TV Set-এর ছবি এবং তাতে TB কথা কেটে TV লেখা—ইনি হলেন Mr. TV। এরা মঞ্চের পিছনে সারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়]

মহামন্ত্রী ॥ এরা আবার কারা ?

প্রঃ মন্ত্রী ॥ এরাই আমার প্রধান হাতিয়ার। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, স্যার—ইনি হচ্ছেন বিসংবাদবাবু, রাজ্যের সংবাদ সংস্থার সভাপতি এবং তিনটি প্রধান সংবাদ পত্রের মালিক। ইনি হলেন বেতারভূষণ বাবু, রাজ্যের বেতার করপোরেশনের চেয়ারম্যান। আর ইনি আমাদের রাজ্য নবাগত অর্থাৎ দূরদর্শন সংস্থার ডিরেকটর Mr. TB না, না, Mr. TV.

মহামন্ত্রী ॥ পরিচয় পেয়ে খুশী হলাম। কিন্তু এঁরা এখানে কি করবেন ?

প্রঃ মন্ত্রী ॥ (হেসে) একটু ধৈর্য ধরুন স্যার। সবই সচক্ষে দেখতে পাবেন।

এঁরাই বুঝিয়ে দেবে আমার পরিকল্পনার ঢং। নিন্‌, বিসংবাদবাবু, আপনিই সুরু করুন···

[বিসংবাদ লাইন থেকে এক পা এগিয়ে এসে গলা ঝেড়ে মিহি এবং মেয়েলী কণ্ঠে বলতে শুরু করেন···]

বিসংবাদ ॥ রাজার নামে, মহাআইনের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত সংবাদ প্রচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মহামন্ত্রীর কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মিথ্যাচার নামক এক কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হয়েছে। সংবাদ ব্যবসায়ীদের কাছে মহামন্ত্রীর গোপন নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সম্পাদকদের ডেকে এনে নরমে গরমে কড়কে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বলা হয়েছে যে তাঁরা যেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে বলে সোচ্চার হন। এদিকে সংবাদপত্রের এবং সাংবাদিকতার স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কাগজে কাগজে মহামন্ত্রীর এবং তাঁর কর্মসূচীর গুণগান করা ছাড়া অন্য কথা প্রচারিত হবে না। মহা আইনের ফলে রাজ্যময় অভূতপূর্ব উন্নতি হচ্ছে—এটা বিশেষ ভাবে প্রচার করতে হবে। অবশ্য ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বিক্রয়মাত্রা বজায় রাখতে এবং রাজ্য-বাসীগণের মানসিকতা ভিন্ন পথে চালিত করার জন্যে কিছু সস্তা, বানানো এবং মুখোরোচক অথচ বিভ্রান্তিকর খবর প্রচারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কিছু দুর্বিনয়ী সাংবাদিক, যাদের বিদেশী চর বলে মনে করা হচ্ছে, তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। বিরোধী পক্ষের ব্যর্থতার অতিরঞ্জিত গালগল্প কৌশলে প্রচার হবে। এ-ছাড়া—

মহামন্ত্রী ॥ বাঃ! বাঃ! বেশ, বেশ। অতি উত্তম ব্যবস্থা। এতেই চলবে। কিন্তু একটা কথা—প্রচার মন্ত্রী, তুমি সব ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে।

[বিসংবাদ আবার লাইনে দাঁড়ায়]

প্রঃ মন্ত্রী ॥ তা আর বলতে। রাজ্যের সবচেয়ে ধুরন্ধর এবং সেরা গুপ্তচর শ্রীকাকমৃকে একটা আমদানীকৃত টেলিস্কোপিক বায়নাকুলার দিয়ে নজর রাখতে বলেছি। তাছাড়া, আমার দপ্তরের ছাদের মাথায় একটা শক্তি-শালী র‍্যাডার বসাবো ভাবছি।

মহামন্ত্রী ॥ ওটাতে কি হবে?

প্রঃ মন্ত্রী ॥ সব ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যাবে।

মহামন্ত্রী ॥ তাহলে ওটা এক্ষুনি বসিয়ে ফেল। দেরি কোর না।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ না স্যার। দু' একদিনের মধ্যেই বসে যাবে। আমার শ্যালকের কোম্পানীকে লাইসেন্স দিয়েছি।

মহামন্ত্রী ॥ বেশ করেছ। এখন আর কি কি দেখাবে, দেখাও—

প্রঃ মন্ত্রী ॥ হ্যাঁ, এই যে। এবার বেতারভূষণ বাবু, আপনি আসুন। পাংশুবাণীকে কিভাবে কাজে লাগানো হবে তার বর্ণনা দিন।

[বেতারভূষণ এগিয়ে এসে রেডিওতে সংবাদ পাঠ করার ভঙ্গীতে সুর করে বলতে থাকেন…]

বেতারভূষণ ॥ রাজ্যময় এক সঙ্কটময় অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় মহামন্ত্রী মহাআইন জারি করে দেশরক্ষা করেছেন। রাজ্যের বেতার সংস্থা, পাংশুবাণীর সব অনুষ্ঠান সূচী বাতিল করে দিয়ে মহামন্ত্রীর মহান কর্মসূচী এবং তাঁর অমোঘবাণী সমর্য্যাদায় প্রচার করা হবে। রাজ্যের উন্নতির কথা এমন ভাবে প্রজাদের কানে তুলে দেওয়া হবে যেন তারা ঘুমালেও ঐ স্বর গুঞ্জিত হয়। খ্যাত, অখ্যাত এবং কুখ্যাত নাট্যকার, শিল্পী এবং ভাষ্যকারদের দিয়ে ফরমায়েসী কথিকা, নাটক সঙ্গীত ইত্যাদির সাহায্যে রাজ্যের উন্নতির কল্পচিত্র তুলে ধরা হবে। মহামন্ত্রী এবং তাঁর কর্মসূচীর গুণগান প্রচারের জন্য ভাল ভাল গায়ক-গায়িকাকে দিয়ে জোর করে বন্দনা গান প্রচারিত হবে। এক কথায় পাংশুবাণীকে মহামন্ত্রীর মহান বাণী প্রচার কেন্দ্রে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মহামন্ত্রী ॥ বাঃ! এতো তারিফ্ করার মত ব্যবস্থা! সাবাস্—

বেতারভূষণ ॥ এ ছাড়াও কিছু সাজানো লোকের সাহায্যে কিছু সাজানো অনুষ্ঠান মারফৎ প্রচার করা হবে যে রাজ্যবাসী পরম সুখে ও শান্তিতে আছে এবং রাজ্যের চরম উন্নতি হচ্ছে।

মহামন্ত্রী ॥ চমৎকার! চমৎকার! কি বল হে অমাত্যগণ?

অমাত্যগণ ॥ সত্যিই চমৎকার! সুন্দর এবং প্রশংসনীয়!

মহামন্ত্রী ॥ তাহলে এবার Mr. TB না TV—র্ওর কারুকার্যটা শোনা যাক।

[বেতারভূষণ নিজের জায়গায় যায়]

প্রঃ মন্ত্রী ॥ আসুন মিঃ টি. ভি.—আপনি এসে বলুন, দূর দর্শন সংস্থায় আমরা কী কার্য্যসূচী গ্রহণ করেছি।

[মিঃ টি. ভি. সাহেবী কায়দায় এগিয়ে স্যালুট কোরে বলে]

মিঃ টি. ভি. ॥ এ রাজ্যে দূরদর্শন ব্যবস্থা সবে মাত্র সংগঠিত করা হয়েছে। যদিও এটা খুবই আনকোরা এবং costly but জনগণ এ ব্যাপারে বেশ উৎসাহী। তাই বেশ কিছু set sell হয়ে গেছে এবং জোর চাহিদা রয়েছে। সাধারণ প্রজাদের জন্য সরকারী খরচায় স্কুল, কলেজ, ক্লাব এবং সমবায় সমিতি প্রভৃতিকে বেশ কিছু set allot করা হয়েছে। প্রজাগণ দূরদর্শনে programme দেখার জন্য খুব ভিড় করছে। এই সুযোগে নানা Trick Shot এর সাহায্যে রাজ্যের progress এর চিত্র কৌশলে প্রচার করা হচ্ছে। মহামন্ত্রীর মহান কর্মসূচী illustration এর সাহায্যে তুলে ধরা হবে যাতে প্রজারা এর জয়গান করতে বাধ্য হয়।

মহামন্ত্রী ॥ বাঃ বাঃ! প্রশংসনীয় প্রচার ব্যবস্থা। আমি তৃপ্ত হয়েছি।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ বলিনি স্যার, আমি একেবারে নিটোল ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছি। এ ছাড়াও আমি আরও পাঁচ রকম ব্যবস্থা নেব বলে ভেবেছি। দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে এই প্রচারের ব্যাপারে কাজে লাগাব ঠিক করেছি।

মহামন্ত্রী ॥ তোমার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পার। তোমার কাজে আমি এতই তৃপ্ত যে আমার যদি মনিহার থাকতো তবে এক্ষনিই তা তোমার গলায় পরিয়ে দিতাম। যাকগে, আগামী খেতাব-দান উৎসবে তোমাকে একটা বিশেষ খেতাব দেব বলে মনে করছি।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ তার কোন দরকার নেই, স্যার। আপনার প্রশংসাই আমার পরম পুরস্কার আর আপনার আস্থাই আমার চরম ঈপ্সিত বস্তু।

মহামন্ত্রী ॥ আচ্ছা, এবার তোমার হাতিয়ারদের আমার সন্তোষ জানিয়ে প্রস্থান করতে বল। অন্য গূঢ় কথা আছে।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ (ওদের ইঙ্গিত করে) মহামন্ত্রী আপনাদের কাজে তৃপ্ত হয়েছেন। আপনারা প্রস্থান করে পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশসেবা করুন।

[ওরা তিনজন অভিবাদন করে চলে যায়]

মহামন্ত্রী ॥ নাঃ তোমাকে পূর্ণমন্ত্রী না করলে আর চলছে না। তোমরা কি বল—অমাত্যগণ?

অমাত্যগণ ॥ তাতো বটেই, তা তো বটেই।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ আপনার আশীর্বাদ পেয়ে আমি ধন্য! এবার অনুমতি পেলে আমি আমার দপ্তরে ফিরে যাই—

মহামন্ত্রী ॥ আরে বসোই না—একটু কথাবার্তা, গপ্পো-সপ্পো করা যাক।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ আজ্ঞে দপ্তরে প্রচুর জরুরী কাজ পড়ে রয়েছে।

মহামন্ত্রী ॥ কি এমন জরুরী কাজ!

প্রঃ মন্ত্রী ॥ এখনই একটা ফ্যাশান শো-এর উদ্বোধন করতে যেতে হবে। আমার শ্যালিকা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে।

মহামন্ত্রী ॥ ফ্যাশন শো! তোমার শ্যালিকা অপেক্ষা করবে? ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো!

প্রঃ মন্ত্রী ॥ আমার শ্যালিকা ঐ ফ্যাশান শো এর উদ্যোক্তা আর ঐ ফ্যাশান শোয়ে রাজ্যের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীগণ অংশ নেবেন। তাই পর্যবেক্ষণ করতে যাব ভেবেছি।

মহামন্ত্রী ॥ ফ্যাশান শো পর্যবেক্ষণ!! এটা কোন জরুরী কাজে লাগাবে?

প্রঃ মন্ত্রী ॥ আমার দপ্তরে কোন জিনিষ, কখন, কিভাবে কাজে লাগবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। প্রচার এমনি একটা বিষয় যে এখানে জরু থেকে গরু সবই কাজে লাগতে পারে। তাছাড়া উদ্বোধনী ভাষণে মহামন্ত্রীর নির্দেশ দেশের ফ্যাশন-ব্যবস্থার মধ্যে যে বিপ্লব আনবে সে কথা সমবেত সুন্দরীদের এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক শিল্পপতিদের তুলে ধরব।

মহামন্ত্রী ॥ বাঃ বাঃ! তবে তো তোমাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিতে হয়। আমার কাজ নিয়ে কথা। তা তুমি জরুই লাগাও আর গরুই লাগাও আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ে গেল—

প্রঃ মন্ত্রী ॥ কি স্যার! কি কথা?

অমাত্যগণ ॥ বলুন স্যার, আমরা শোনার জন্য অধীর।

মহামন্ত্রী ॥ শোন—এই ক্ষমতা আমাদের করায়ত্ত রাখতেই হবে আর তার জন্যে বালখিল্য পরিষদ বা আমাদের ভক্ত বাহিনীকে সব সময় সামাল

দিয়ে রাখতে হবে। যদিও এদেরকে শিরদাঁড়া বিহীন এবং মগজ বিহীন করে রাখার জন্তে ঢালাও নেশার উপকরণ আর অপসংস্কৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে তবু এদের বিশ্বাস নেই। কাঁচা মাথা তো—কখন যে কোন দিকে মুখ ফেরাবে তার ঠিক নেই।

১ম অমাত্য॥ আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছি, স্তার। মুখ ফেরালেই থেৎলে দেব।

২য় অমাত্য॥ আমরা সজাগ আছি, স্তার। ওদের পেছনে আমরা চর ছেড়ে রেখেছি। তাছাড়া ওদের টিকি আমাদের হাতে বাঁধা।

প্রঃ মন্ত্রী॥ তার মানে!

২য় অমাত্য॥ মহাবৈত্তের প্রেসক্রিপশন মত দাওয়াই দিয়ে ওদের আমরা পোষা কুকুরের মত করে রাখব।

১ম অমাত্য॥ অর্থাৎ 'ঘেউ' করতে বললে তবে করবে নৈলে নয়।

মহামন্ত্রী॥ বা-বা! এ তো দেখছি মোক্ষম দাওয়াই।

২য় অমাত্য॥ না স্তার, বিদেশ থেকে চোরাপথে আমদানী করা হচ্ছে।

মহামন্ত্রী॥ তা যে পথেই আস্থক না কেন কাজ হলেই হোল। তা ওষুধটার নাম কি?

২য় অমাত্য॥ এল. এস. ডি, ম্যানড্রেক্স, ম্যারিজুয়ানা আরও যেন কি সব। খুব কাজের ওষুধ। খেলে নাকি চোখের সামনে লাল নীল হলদে ছোট ছোট ফুল্‌কি ফুল্‌কি দেখতে পাওয়া যায়। ও নেশা ধরলে আর ছাড়া যায় না। দেবলোক নরলোক সব একাকার হয়ে যায়।

মহামন্ত্রী॥ তাই না কি! কয়েকটা এনে দিও তো, পরখ করে দেখব।

১ম অমাত্য॥ খবরদার স্তার। এখন খাবেন না, মন্ত্রীত্ব চলে গেলে মনের দুঃখে না হয় খেয়ে দেখবেন। এখন নয়, স্তার।

মহামন্ত্রী॥ তা হলে আর হল না পরখ করা। আমার মন্ত্রীত্বও যাবে না আর—

২য়। অমাত্য॥ না স্তার, ও ওষুধ পরখ করে কাজ নেই। এসব ঐ ছেলে ছোকরাদেরই ভাল। তবে একটা কুফল আছে এই ওষুধ খেলে।

মহামন্ত্রী॥ কুফল! কুফল কেন?

১ম অমাত্য॥ বেশীদিন এই ওষুধ খেলে দেহ মনের শক্তি একদম কমে যায়।

মহামন্ত্রী ॥ তাহলে বন্ধ করে দাও ওষুধটা। কারণ ওদের শক্তি কমে গেলে আমরাও নিভে যাব। ওদের জোরেই আমাদের জোর—বুঝলে?

প্রঃ মন্ত্রী ॥ তাহলে ডোজ কমিয়ে দেবেন আর মাঝে মাঝে গাঁজা, চরস্‌, কোকেন এইসব দেশীয় ভেষজ ব্যবহার করে দেখবেন। এতে কুটির শিল্পের প্রসার হবে।

মহামন্ত্রী ॥ হ্যাঁ তাই কোরো। তা ছাড়া আর দু'টো উপায় বলি, শুনে রাখ। শিক্ষা ব্যবস্থায় সুকৌশলে আনতে হবে চরম নৈরাজ্য আর বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ ছাত্ররা লেখাপড়া ছাড়া অন্য সব কিছুরই সুযোগ পাবে। যুবক ও ছাত্রদের প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত করার নামে অশিক্ষিত করে তুলতে হবে। যুব সমাজকে আশা আকাঙ্খার পিছনে সততই ঘোড়-দৌড়ে রত রাখতে হবে। সারা বছর উৎসব, মেলা, জলসা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ওদের প্রচণ্ড-ভাবে মাতিয়ে রাখতে হবে।

১ম অমাত্য ॥ অর্থাৎ তারা তাদের প্রকৃত অস্তিত্ব ভুলে যায়—এই তো?

মহামন্ত্রী ॥ ঠিক ধরেছো। এবার দ্বিতীয় উপায় বলি—এটা হল বিভেদপন্থা প্রয়োগ অর্থাৎ যুব সমাজকে নানা গোষ্ঠীতে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে রেখে এক দলকে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখতে হবে। ওদের সদা সর্বদা বিবদমান রাখতে পারলেই আমাদের কাজ হাসিল হবে। তবে হ্যাঁ—এই অদৃশ্য হাতের খেলা কোনমতেই বুঝতে দিলে চলবে না।

২য় অমাত্য ॥ সত্যি স্যার, এ যা একখানা মতলব বার করেছেন, সত্যিই জবাব নেই। রাজবৈদ্যের ওষুধের চেয়েও কড়া।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ আপনি স্যার, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিকেও ছাড়িয়ে গেলেন দেখছি।

১ম অমাত্য ॥ সত্যি স্যার, আপনার তুলনা আপনি নিজে।

মহামন্ত্রী ॥ (বিগলিত হয়ে) হেঁ-হেঁ-হেঁ—এত প্রশংসা কোর না, গলে যাব।

১ম অমাত্য ॥ কি যে বলেন, স্যার। প্রশংসা কোথায়? এতো নিছক সত্যি কথা।

২য় অমাত্য ॥ গুণীর গুণগান করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না স্যার। জীবনে তো আর কিছুই করতে পারলাম না।

মহামন্ত্রী ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। (পদচারণা করে) আচ্ছা, প্রচারমন্ত্রী,

তুমি এখন তোমার শোয়ে যেতে পার। (আবার পদচারণা করতে থাকেন। প্রচার মন্ত্রী চলে যায়। একটু পরে) আজকের মন্ত্রণাসভা এখানেই শেষ। অমাত্যগণ তোমরা নিজ নিজ অঞ্চলে চলে যেতে পার। আমি এখন বিশ্রাম করতে যাব। রাজনটী বোধ হয় এতক্ষণে আমার বিশ্রামকুঞ্জে……

সকলে ॥ মহামন্ত্রীর জয় হোক!

[অমাত্যগণ একদিকে এবং মহামন্ত্রী অন্যদিকে চলে যেতে উদ্যত হলে আচমকা পাগলা ঘন্টি বেজে ওঠে। সকলে অজানা আশঙ্কায় মধ্যমঞ্চে এসে জড়ো হয়]

মহামন্ত্রী ॥ একি !! মহাঘণ্টা বাজে কেন! কি হল! কি হল! তবে কি আবার…! প্রতিহারী দেখে এসো, শিগগীর দেখে এসো কি অঘটন ঘটলো। [প্রতিহারী সবেগে চলে যায়]

১ম অমাত্য ॥ ব্যাপার কি! ঘণ্টা বাজে কেন! আবার কি কোন… ?

২য় অমাত্য ॥ সেনা বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করল না তো!

১ম অমাত্য ॥ তাহলে তো মহাবিপদ! এখনই অন্য রাজ্যে পালাবার পথ খুঁজতে হবে, নতুবা নিস্তার নেই।

২য় অমাত্য ॥ মহামন্ত্রী অবশ্য আগেভাগেই এসব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন। বেনামে অন্য রাজ্যের ব্যাংকে প্রচুর টাকা জমা রাখা আছে। ভাবনার কি আছে ?

১ম অমাত্য ॥ বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। ব্যাপারটা না জানলে কিছুই করা যাচ্ছে না। আমার ভীষণ ভয় করছে, যদি কিছু হয়!

মহামন্ত্রী ॥ আঃ! চুপ্ করো তোমরা। যত সব মূর্খ, ভীরু, অপদার্থের দল! আজে বাজে চিন্তা না করে লেজ তুলে দেখ এঁড়ে না বক্‌না ? যত সব মগজ-বিহীন চাটুকারের দল।

১ম অমাত্য ॥ রাগ করবেন না, স্যার—ক্ষমতা এমনি জিনিস যে ওটা চিরকাল একই হাতে থাকে না। হাত পালটায়। তাই সব সময় আমরা ভয়ে ভয়ে থাকি। মানে, এই গেল, এই গেল মনে হয়, আর ভয়ে মরি।

মহামন্ত্রী ॥ তা এতই যদি ভয় তো বৌয়ের আঁচল ধরে বসে থাকলেই পারতে এখানে আসা কেন?

২য় অমাত্য ॥ আজ্ঞে একরকম আঁচল ধরেই তো আছি। সাহসের অভাব বলেই তো আপনার ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়াই।

মহামন্ত্রী ॥ (খিঁচিয়ে) তা বেশ করো। এখন চুপ করে থাকো। ব্যাপারটা আমাকে জানতে দাও। তোমরাই আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছ—কে?

[প্রতিহারীর সঙ্গে প্রধান গুপ্তচর শ্রীকাকম্ ঢোকে। বিচিত্র পোশাক—পরনে ধুতি, গায়ে ছাপা ছিটের ফুলশার্ট, মাথায় যাদুকরের কালো লম্বা টুপি, চোখে গগলস্, কাঁধে-ঝোলা ব্যাগ, হাতে লম্বা বাইনোকুলার। বাবরি চুল ও একমুখ গোঁফ দাড়ি শ্রীকাকম্ অভিবাদন করে]

শ্রীকাকম্ ॥ মহামন্ত্রীর জয়ম্ হোক!

মহামন্ত্রী ॥ তা হোক। কিন্তু ব্যাপারটা কি? মহাঘণ্টা বেজে উঠল কেন? সব খুলে বল, শ্রীকাক—

শ্রীকাকম্ ॥ ওটা আমার বাবার নামম্। ঠাকুর্দার নাম ছিল—শ্রী আর আমার হল অম্। তাহলেম্ এক দুই আর তিনম্ মিলে আমার সরকারী নাম দাঁড়াল—শ্রীকাকম্। আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে এটাই রীতিম্।

মহামন্ত্রী ॥ চুলোয় যাক্ তোমার রীতি! এখন ব্যাপারটা বল।

শ্রীকাকম্ ॥ ব্যাপারম্, স্যার বড়ই গুরুতরম্!!

মহামন্ত্রী ॥ অ্যাঁ! গুরুতর! সে কি!!

প্রতিহারী ॥ পেটে আটকে না রেখে, তাড়াতাড়ি সব খুলে বল। দেখছো না মহামন্ত্রী কত উদ্বিগ্ন।

শ্রীকাকম্ ॥ বলছি স্যার, বলছি। (দম নিয়ে) সে এক নিদারুনম্ ব্যাপারম্! রাজ্যের পূর্বক্ষেত্রে এক বেয়াদপম্ ব্যক্তি মহামন্ত্রীর কর্মযজ্ঞম্ তথা কর্মকাণ্ডমের অপব্যাখ্যায় প্রবৃত্তম্ হয়েছে। কোনমতেই নিবৃত্তম্ করা যাচ্ছে না। তার এই অপব্যাখ্যায় প্রজারা আকৃষ্টম্ হচ্ছে আর—

মহামন্ত্রী ॥ সে কি! নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না কেন? কোথায় সেই বেয়াদপ ব্যক্তি? তাকে ধরা হয় নি?

শ্রীকাকম্ ॥ সে আর বলতে। তাকে কি ছেড়ে রাখা যায়? সঙ্গে সঙ্গেই

গ্রেপ্তারম্ করা হয়েছে। নির্দেশম্ পেলেই মহামন্ত্রীর সামনে হাজিরম্ করা হবে।

১ম অমাত্য ॥ তা ঐ ব্যক্তি কি অপব্যাখ্যা করেছে?

২য় অমাত্য ॥ ব্যক্তিটি বিদেশী চরটর নয় তো?

শ্রীকাকম্ ॥ নাঃ! ভাল করে খোঁজম্ করা হয়েছে। স্বদেশী কিংবা বিদেশী কারুর চরম্ নয়। তবে চরাচরচমে এরকম উৎপটাং ব্যক্তি হয় না।

মহামন্ত্রী ॥ তা সে কি করে বেড়াচ্ছিল?

শ্রীকাকম্ ॥ প্রজাগণকে বলছে যে মহামন্ত্রীর সব কিছুই ভাঁওতাম্। মহামন্ত্রী যা কিছু করছেন বা বলছেন তা সবই মিথ্যাম্। কর্মসূচীম্—ভাঁওতাম্, মহাআইন ভাঁওতাম্। রাজ্যের উন্নতিম্—ভাঁওতাম্। আসলে প্রজারা অষ্টরম্ভাম্ পাবে, আর কিছুই নয়। এইসব শুনে বেশ কিছু প্রজাম্ অলরেডীম্ ভাঁওতা, ভাঁওতা বলে চিৎকারম্ শুরু করেছে। তাহলেই বুঝুন, কি সাংঘাতিকম্ ব্যাপারম্।

১ম অমাত্য ॥ সর্বনাশম্ বলে সর্বনাশম্! এ এক মহাছোঁয়াচে রোগম্। চুলকানির মত দ্রুতম্ ছড়িয়ে পড়ে। তাই তো ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারম্ করা হয়েছে। কিন্তু—

মহামন্ত্রী ॥ তা ওকে বিশেষ বিশেষ দাওয়াই দেওয়া হয়েছে কি?

শ্রীকাকম্ ॥ সব চেষ্টাই ব্যর্থম্ হয়েছে, স্যার।

১ম অমাত্য ॥ সে কি! ব্যর্থ হল কেন?

শ্রীকাকম্ ॥ মানে ঔষধম্ কাজে লাগছে না। মারন, উচাটন, উৎপাটন ইত্যাদি তান্ত্রিক দাওয়াই এবং বৈষ্ণব মতে ধোলাই প্রভৃতি করা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তার সেই একই কথাম্—'সব ভাঁওতাম্'। থামানো যাচ্ছে না, দাওয়াই দিলে বরং বেড়েই যাচ্ছে।

মহামন্ত্রী ॥ মহাফ্যাসাদ দেখছি। ব্যক্তিটি তো সাধারণ প্রজা নয়। অমাত্যগণ! তোমরাও চিন্তা কর। সবাই মিলে একটা মতলব বার করতেই হবে, নতুবা সমূহ বিপদ!

১ম অমাত্য ॥ ওকে মেরে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়?

প্রতিহারী ॥ তা কি করে হবে? মহামন্ত্রীর প্রজাতন্ত্রের মহিমা যে কালিমালিপ্ত হবে।

মহামন্ত্রী ॥ ঠিক বলেছো। মারা চলবে না। না মেরে অন্য ভাবে ওর মুখ বন্ধ করতেই হবে।

শ্রীকাকম্ ॥ এ ব্যাপারে কঠোরম্ হওয়া একটু মুশ্‌কিল আছে। কারণ ব্যক্তিটির দেশে ও বিদেশে যথেষ্টম্ খ্যাতি আছে। তাই ওঁর উপর অত্যাচারম্ হলে প্রতিক্রিয়াম্ হতে পারে।

মহামন্ত্রী ॥ হুম্—এটাও ভাববার কথা। এমন কিছু করতে হবে যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।

শ্রীকাকম্ ॥ হ্যাঁ, স্যার। লোকটিকে পূর্বক্ষেত্রের প্রজাগণম্ এক বিশেষ চোখে দেখে। তাই খুব সাবধানে অগ্রসরম্ হতে হবে। লোক জানাজানি হলে বিদ্রোহের আশঙ্কাম্ রয়েছে।

২য় অমাত্য ॥ ওকে পাগল বলে পাগলা-গারদে পুরে রাখলেই হয়।

শ্রীকাকম্ ॥ তা কি করে হয়। সুস্থম্ লোককে হঠাৎ পাগলম্ বললেই লোকে বিশ্বাসম্ করবে কেন?

১ম অমাত্য ॥ তা হলে এক কাজ করা হোক—খানিকটা সিমেণ্ট গুলে ওকে খাইয়ে দেওয়া হোক। খানিক পরে কংক্রীট হয়ে গেলে বাছাধনের মুখ দিয়ে আর কথা বেরোবে না। ব্যস্, মহামন্ত্রীর নিন্দে করাও শেষ হবে।

মহামন্ত্রী ॥ বাঃ! খাসা বুদ্ধি! শুভস্য শীঘ্রম্। প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হোক। প্রতিহারী এক বালতি সিমেণ্ট গুলে নিয়ে এসো আর শ্রীকাক, তুমি সেই বেয়াদপ লোকটিকে এখানে এনে হাজির করো।

শ্রীকাকম্ ॥ কিন্তু স্যার, একটা কথাম্…

মহামন্ত্রী ॥ কোন কথা নয়। হাজার বার তোমাদের বলেছি না, এই সঙ্কটকালে কথা কম কাজ বেশী। যাও, আদেশ পালন করো।

শ্রীকাকম্ ॥ তব আজ্ঞাম্ শিরোধার্য্যম্, স্যার।

[শ্রীকাকম্ ও প্রতিহারী চলে যায়। মহামন্ত্রী পদচারণা করতে থাকেন]

২য় অমাত্য ॥ সিমেণ্ট খাওয়ালে হবে তো? যদি হজম করে ফেলে কিংবা বমি করে বার করে দেয়?

১ম অমাত্য ॥ তা কেন হবে? মুখ চেপে ধরে রাখতে হবে।

২য় অমাত্য ॥ এক কাজ করলে হয় না? ওকে তুক্‌তাক্ করে বোবা করে দিলেও তো হয়।

১ম অমাত্য ॥ তাও হয়। সিমেণ্টে কাজ না হলে তখন না হয় ওঝা ডেকে তুক্‌তাকের ব্যবস্থা করা যাবে। চুপ,—ঐ তো আসছে—

[প্রতিহারী এবং শ্রীকাকমের সঙ্গে প্রবেশ করে সৌম্য দর্শন এক আগন্তুক। পরনে ধুতি পাঞ্জাবী, গায়ে পাটকরা চাদর। সুন্দর পাকা গোঁফদাড়ি, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। চোখে মুখে দৃঢ়তার ছাপ অথচ মুখে হাসিটি লেগে আছে। আগন্তুক ধীর পদক্ষেপে মধ্য মঞ্চে সামনের দিকে এসে দাঁড়ায়]

মহামন্ত্রী ॥ (আগন্তুককে দেখে চমকে ওঠেন) একি! তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। অথচ…!

আগন্তুক ॥ অথচ চিনতে পারছো না, কেমন? তাহলে শোন আমার পরিচয়। আমাকে তুমি সব সময়ই দেখতে পাচ্ছ তোমার অন্তরাত্মায়। কিন্তু ভাঁওতার কুয়াশা সৃষ্টি করে নিজেই তার জালে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছো। তাই দেখেও দেখ না।

মহামন্ত্রী ॥ (শ্রীকাকম্‌কে) ওরে বাবা! এতো মহাসংঘাতিক লোক! কি সব উদ্ভট আর বিচ্ছিরি কথাবার্তা বলছে। প্রতিহারী! যাও তাড়াতাড়ি সিমেণ্ট গোলা নিয়ে এসো। আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। হয়তো আরও কি সব বলে ফেলবে। প্রতিহারী—শিগ্‌গীর যাও।

শ্রীকাকম্‌ ॥ কিন্তু আমার মনে হয়, ও সিমেণ্টও হজম করে ফেলবে।

মহামন্ত্রী ॥ কি বাজে বকছো?

শ্রীকাকম্‌ ॥ বাজে নয়, স্যার। একদম খাঁটি কথাম্‌। আপনি হয়তো জানেন না কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী জানেন।

মহামন্ত্রী ॥ ন্যাকামি রেখে কি জানে তাই বলো?

শ্রীকাকম্ ॥ গত কয়েক বছরম্ রাজ্যবাসীকে কাঁকর মিশ্রিত খাদ্যম্ বণ্টন করা হচ্ছে। প্রজাগণম্ সেই খাদ্যম্ হজম করতে পারছে না বটে কিন্তু কাঁকর হজম করতে অভ্যস্থম্ হয়ে গেছে। তাই এর পক্ষে সিমেণ্ট হজম করা মোটেই অসাধ্যম্ নয়। তাই স্যার…

মহামন্ত্রী ॥ তাই তো বটে! যে কাঁকর হজম করে ফেলে তাকে সিমেণ্ট গোলা খাইয়ে কি হবে। দূর! বাজে মতলব। এখন কি করা যায়!

শ্রীকাকম্ ॥ আমার মনে হয়, লোকটিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, লোভ দেখিয়ে কিংবা আদর-আপ্যায়নের দ্বারা বশীভূতম্ করতে হবে। আমরা তো অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সবই ব্যর্থম্। ও একেবারেই বাঁকা বিহারীম্ অর্থাৎ বাঁকা পথে বিহারম্ করে। এখন আপনি যদি—

মহামন্ত্রী ॥ আমি আদর করলে হবে?

১ম অমাত্য ॥ কেন হবে না, স্যার। আপনার আদরে বরফ গলে যায়, ও ছার!

মহামন্ত্রী ॥ তাহলে তোমরা বলছো? তাহলে আদর করি, এ্যাঁ?

২য় অমাত্য ॥ হ্যাঁ, স্যার করুন। আপনি আদর করলেই আমরা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেব।

মহামন্ত্রী ॥ বেশ তবে তাই করি। (এক গাল হেসে আপ্যায়ন করেন) হেঁ, হেঁ, হেঁ…এই শোন…

আগন্তুক ॥ আবার কোন নতুন ভাঁওতা মাথায় এসেছে বুঝি? কিন্তু সাবধান, যতই তুমি ভাঁওতা দেবে, ঐ ভাঁওতাগুলো ততই তোমাকে পেঁচিয়ে ধরবে আর একদিন ঐ ভাঁওতাগুলোই তোমাকে শেষ করবে।

মহামন্ত্রী ॥ আচ্ছা, তুমি এত অবুঝ আর বেখাপ্পা কেন? আমি তোমাকে আদর করছি বুঝতে পারছো না?

আগন্তুক ॥ না। কারণ ওটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মহামন্ত্রী ॥ সেকি! কিন্তু আমি যে তোমাদের জন্যে এবং দেশের জন্যে যে প্রাণপাত করছি?

আগন্তুক ॥ ওটা ভাঁওতা। আসলে ক্ষমতা দখলে রাখার জন্যেই তুমি প্রাণপাত করেছো।

মহামন্ত্রী ॥ ভুল ধারণা। যদি হতো তবে রাজ্যের উন্নতি হতো না।

আগন্তুক। থামো। রাজ্যের উন্নতি? ওটা তো তোমার প্রচণ্ড ভাঁওতা।

মহামন্ত্রী ॥ যাচ্চলে। তাহলে প্রজাদের দুঃখ মোচন?

আগন্তুক ॥ ওটাও ভাঁওতা।

মহামন্ত্রী ॥ শিল্প বাণিজ্যের চরম উন্নতি?

আগন্তুক ॥ চরম্ ভাঁওতা।

মহামন্ত্রী ॥ দ্রব্যমূল্য হ্রাস?

আগন্তুক ॥ সুন্দর ভাঁওতা।

মহামন্ত্রী ॥ আরে! বলছো কি! তাহলে আমি কিছুই করিনি?

আগন্তুক ॥ অনেক করেছো। ক্ষমতা দখলে রাখতে যা যা করণীয় তা সব করেছো। বাক্‌স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে আর বিচার ব্যবস্থাকে বানচাল করে মহাআইন জারী করেছো। সারা দেশটাকে কয়েদখানায় পরিণত করেছো। সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের টুঁটি চেপে ধরেছো যাতে সত্য ঘটনা না প্রকাশ পায়।

মহামন্ত্রী ॥ কিন্তু এ সবই দেশের স্বার্থে। ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতেই হবে।

আগন্তুক ॥ আহা-হা দেশের জন্যে তোমার নিদ্রায় বড়ই ব্যাঘাত ঘটছে। তাই বুঝি দেশেব অবনতিকে ঢাকতে অবিরাম উন্নতি উন্নতি বলে চিৎকার করে যাচ্ছো? তবে হ্যাঁ, তোমার ভাগ্য ভাল। রাজ্যের বেশির ভাগ মানুষ সরল আর অশিক্ষিত তাই তোমার ভাঁওতা ধরে ফেলতে দেরি হচ্ছে। তাই বলে ভেব না কোনদিন ধরা পড়বে না। দিন আসছে………

মহামন্ত্রী ॥ যাক্‌গে, তা সে যা হবার হয়েছে। রাগ্ কোর না, সোনা মানিক! এবার আমি সত্যি সত্যিই উন্নতির ব্যবস্থা করবো। এক কাজ করো না—তুমি আমায় মন্ত্রীসভায় এসো। আমাকে সহায়তা করো—দেখবে একদিন এই দেশ সোনার দেশ হয়ে যাবে।

আগন্তুক। তুমি আমাকে লোভ দেখিয়ে বশ করতে চাও? কিন্তু তোমার এই ভাঁওতাতে আমি ভুলব না। তুমি আমাকে রাজা করে দিলেও

সহায়তা পাবে না। আমি সহায়তা করব মানুষের—সাধারণ মানুষের, বঞ্চিত মানুষের—যাদের ঠকিয়ে তুমি ক্ষমতার চূড়োয় বসে আছো।

মহামন্ত্রী॥ আরে! এ তো সাংঘাতিক লোক! অমাত্যগণ, আদরে কাজ হচ্ছে না যে—কি করা যায়?

১ম অমাত্য॥ অনাদর করুন, স্যার। চরম অনাদর।

মহামন্ত্রী॥ হ্যাঁ, চরম অনাদরই করতে হবে। তার মানে, সোজা কথায়, একে খতম করে দেওয়াই বিধেয়। কি বল হে অমাত্যগণ?

অমাত্যগণ॥ সঠিক সিদ্ধান্ত! অভাবনীয় সমাধান!

আগন্তুক॥ আমাকে খতম্ করে কোন ফল হবে না। সত্যকে খতম করা যায় না। সত্য চিরকাল সত্যই থাকে।

অমাত্যগণ॥ ওহে বাপু! কেন ঝামেলা করছো? মহামন্ত্রীর কথা শোন, ওঁকে সহায়তা কর—মঙ্গল হবে।

আগন্তুক॥ থামো। চাটুকার, ক্লীবের দল! তোমাদের মঙ্গল অমঙ্গল ঐ শঠ্ মহামন্ত্রীর কৃপায় হয়। আমার মঙ্গল আমি নিজেই তৈরী করতে জানি। সুতরাং উপদেশ দিতে যেও না। তোমরা যতই কৌশল কর না কেন, মিথ্যাকে আমি মিথ্যাই বলব। শুধু আমি কেন, সবাই বলবে। সেদিন আর বেশি দূরে নয়।

প্রতিহারী॥ স্যার, আর দেরি নয়। খাঁড়া দিয়ে একে দু'টুকরো করে ফেলি। আমার খাঁড়ায় দারুণ ধার আর হাতটাও নিস্‌পিস্ করছে। আদেশ করুন স্যার, এক কোপে কেটে ফেলি। এই সুযোগে একবার রণমূর্তি ধরি।

আগন্তুক॥ বীরত্বটা একটু বেশি দেখিয়ে ফেললে যে প্রতিহারী মশাই। সারা জীবন গোলামী করে করে মাথাটা নীচু করতেই শিখেছো। মাথা উঁচু করে রণমূর্তি ধরবে কি করে? তাছাড়া তোমাদের মাথার উপর কালের অমোঘ খাঁড়া ঝুলছে, তা কি দেখতে পাচ্ছ? কখন যে নেমে আসবে তা যে জানতেও পারবে না।

[এই সময় মঞ্চের নেপথ্যে বিভিন্ন কোণ থেকে চাপা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন শোনা যায়। সবাই সচকিত হয়। আবার পাগলা ঘন্টা বেজে ওঠে]

মহামন্ত্রী ॥ একি! কোলাহল কিসের! প্রতিহারী—

[প্রতিহারী দ্রুত চলে যায় এবং পরক্ষণেই ফিরে আসে।]

প্রতিহারী ॥ উত্তর ক্ষেত্রের প্রজাগণ বিক্ষুব্ধ হয়েছে। প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা চিৎকার করে বলছে—সব ভাঁওতা। ভাঁওতাবাজী চলবে না। ওরা খুবই উত্তেজিত।

মহামন্ত্রী ॥ সেনাবাহিনীকে খবর দাও। ওদের মোকাবিলা করুক।

প্রতিহারী ॥ খবর তো দেব, কিন্তু যাব কি করে? প্রাসাদের সিংহদ্বার পর্যন্ত ওরা এসে গেছে যে……।

মহামন্ত্রী ॥ তাহলে হট-লাইনে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

প্রতিহারী ॥ সেখানে যেতে গেলেও তো ওদের মুখোমুখি পড়তে হবে। সে কি করে হবে স্যার? তার চেয়ে আপনিই চলুন, আমরা না হয় আপনার পিছন পিছন……

মহামন্ত্রী ॥ (প্রচণ্ড ধমক দিয়ে) আহাম্মক কোথাকার! ওদের সামলানোর দায়িত্ব কি আমার? রাজকার্য সামলাবে তাহলে কে? তুমি না সেনাধ্যক্ষ?

অমাত্যগণ ॥ তাহলে এখন কি করা যায়, স্যার?

আগন্তুক ॥ করার কিছুই নেই। একমাত্র জবাবদিহি করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই।

মহামন্ত্রী ॥ অ্যাঁ—কিছুই করার নেই? তবে কি ওরা সবাই বিদ্রোহ করেছে?

আগন্তুক ॥ না। ওরা ওদের ক্ষমতা বুঝতে পেরেছে। তাই তোমাদের সৃষ্টিছাড়া ভাঁওতার মোহজাল ছিন্ন করে ওদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ওরা এগিয়ে আসছে। এখন দিন বদলের পালা।

১ম অমাত্য ॥ তার মানে, আমাদের পালাতে হবে, স্যার।

২য় অমাত্য ॥ আর দেরি করবেন না, স্যার।

[আর এক কোণে ক্রুদ্ধ গুঞ্জন শোনা যায়। ঘণ্টা বাজে। শ্রীকাকম্ ছুটে বেরিয়ে যায় এবং পরক্ষণেই ফিরে আসে।]

শ্রীকাকর্॥ (উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে) দক্ষিণ ক্ষেত্রের প্রজারাও ঐ একইভাবে আগুয়ান। ওরা কাঁধে কাঁধম্ রেখে একতালে এগিয়ে আসছে। ব্যাপারম্ সুবিধের নয়, স্যার।

মহামন্ত্রী॥ যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। পালানোই ভাল। চলো সবাই পালিয়ে যাই।

[মঞ্চের মাঝে পালাবার জন্য সবাই পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। আগন্তুক কেবল স্মিতহাস্যে মধ্যমঞ্চে দাঁড়িয়ে ওদের সকৌতুকে লক্ষ্য করেন। নেপথ্যে বিস্ফোরণের শব্দ হয়। প্রতিহারী ছুটে যায় এবং ফিরে এসে খবর দেয়।]

প্রতিহারী॥ পশ্চিম ক্ষেত্র, মধ্য ক্ষেত্র সব ক্ষেত্রের অগণিত প্রজারা এগিয়ে আসছে, স্যার। আর নিস্তার নেই স্যার। দূর থেকে মনে হ'ল সেনাবাহিনীও ওদের সাথে যোগ দিয়েছে। তাই প্রাসাদের বাইরে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

[এই সময় ঘন ঘন বিস্ফোরণের আওয়াজ এবং সেই সাথে জনগণের ক্রুদ্ধ কোলাহল শোনা যায়। মহামন্ত্রী ও অন্যান্যরা পালাবার জন্য মরিয়া হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে।]

১ম অমাত্য॥ মহামন্ত্রী—আমাদের বাঁচান!

২য় অমাত্য॥ আমাদের রক্ষা করুন!

প্রতিহারী॥ যা হোক কিছু একটা করুন—নতুবা এবার মারা পড়বে যে।

মহামন্ত্রী॥ আপনি বাঁচলে বাপের নাম। যে যার নিজের ভাবনা ভাব। আমি আগে নিজেকে বাঁচাই তারপর তোমাদের। তাইতো কি করি? কি করি? যাই ঐ দিক দিয়ে পালাই—

[একদিকে পালাতে যায় কিন্তু একজন প্রজা প্রবেশ করে বাধা দেয়।]

১ম প্রজা॥ পাপের শাস্তি নেবে না? পালাবে কোথায়?

মহামন্ত্রী ॥ ওরে বাবা! এ তো দেখছি একেবারে ঢুকেই পড়েছে। তাহলে ঐ দিক দিয়ে পালাই—

[অন্য দিকে যায়। সেখানেও একজন ঢুকে বাধা দেয়]

২য় প্রজা ॥ জুলুমের কৈফিয়ৎ দেবে না? যাবে কোথায়?

মহামন্ত্রী ॥ মরেছে! এদিকেও এসে গেছে। তবে ওদিকে যাই—

[অন্যদিকে গেলে সেখানেও একজন বাধা দেয়।]

৩য় প্রজা ॥ এখানেও আছি। পালাবার সব পথ বন্ধ।

মহামন্ত্রী ॥ নাঃ। পালানো গেল না। বুদ্ধির সব খেলাই শেষ। কিন্তু খেলার কি আর শেষ আছে!

[ইতিমধ্যে আরও ২।৪ জন প্রজা এসে ঢোকে এবং হাত ধরাধরি করে ওদের চারপাশে বৃত্ত রচনা করে। এবার ঐ বৃত্ত সঙ্কুচিত হতে থাকে। মহামন্ত্রী এবার আজগুবী ভঙ্গীতে নাচের ছন্দে ছোটদের 'হাত কাটাকাটি' বা 'কুয়ো কুয়ো' খেলা শুরু করে দেন।]

মহামন্ত্রী ॥ (ছড়ার সুরে) এই হাতটা কাটলাম…

১ম প্রজা ॥ লাঠি দিয়ে মারলাম।

মহামন্ত্রী ॥ এই হাতটা কাটলাম……

২য় প্রজা ॥ ছুরি দিয়ে মারলাম।

মহামন্ত্রী ॥ এই হাতটা কাটলাম……

৩য় প্রজা ॥ গলা টিপে মারলাম।

মহামন্ত্রী ॥ এই হাতটা কাটলাম……

৪র্থ প্রজা ॥ আগুনে পুড়িয়ে মারলাম।

মহামন্ত্রী ॥ তাহলে তো সব শেষ। আর কোন আশা নেই। পালাবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ! হায়রে!

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ। তোমাদের দিন শেষ। দেখতে পাচ্ছ না তোমাদের বৃত্ত ছোট হয়ে আসছে। দিন বদলের খেলায় এইবার ধীরে ধীরে তোমরা বিন্দুতে পরিণত হবে। তারপর একদিন মুছে যাবে নিজেদের অজান্তে।

[প্রজাগণের বৃত্ত সংকুচিত হয়ে মহামন্ত্রী ও অমাত্যগণকে জাপ্‌টে ধরে। সমস্ত মঞ্চের আলো এলোমেলোভাবে ঘুরতে শুরু করে। উত্থান-পতনের ইঙ্গিতসূচক সঙ্গীত শোনা যায়। এর মাঝে আগন্তুক বাদে আর সকলে চলে যায়। আলো স্তব্ধ হয়। আগন্তুক চারিদিকে কাকে যেন খুঁজতে থাকে।]

আগন্তুক। কিন্তু রাজা কোথায়? মহারাজ! মহারাজ! (কি যেন চিন্তা করে) তবে কি আমাদের আশঙ্কাই সত্যি! রাজাকে কি তবে...! (চীৎকার করে ডাকে) মহারাজ! মহারাজ!

[প্রজাগণ ফিরে আসে। ওরাও খুব উত্তেজিত।]

১ম প্রজা॥ আমাদের রাজা কোথায়? তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে। চল আমরা খুঁজে বার করি।

২য় প্রজা॥ রাজাকে খুঁজে বার করে শুধাবো তিনি থাকতে কেন এই দুর্দশা?

৩য় প্রজা॥ আমাদের উপর যে অত্যাচার অবিচার হয়েছে তার প্রতিকার চাই।

৪র্থ প্রজা॥ রাজাকে নিশ্চয়ই ঐ শয়তান মহামন্ত্রী বন্দী করে রেখেছে কিংবা......

১ম প্রজা॥ কালক্ষেপ না করে চলো আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখি। প্রাসাদের কোথায় রাজাকে লুকিয়ে রেখেছে। চলো, আর দেরি নয়—

[ওরা সবাই বিভিন্ন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরে একজন ভৃত্য ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মঞ্চে প্রবেশ করে কিন্তু আগন্তুককে দেখে হঠাৎ পালাতে গেলে আগন্তুক ওকে ধরে ফেলে।]

আগন্তুক॥ এ কি! পালাচ্ছ কেন? ভয় কি—তুমিও তো সাধারণ মানুষ। তোমার ভয় কি? তুমিই রাজার প্রধান ভৃত্য—না? তোমাকেই খুঁজছি। তুমিই বলতে পার, রাজা কোথায়। বলো, রাজা কোথায়? বলো, কোন ভয় নেই তোমার।

ভৃত্য॥ (সভয়ে চারিদিক দেখে) কিন্তু ওঁরা যদি জানতে পারেন, তাহলে

আমাকে শেষ করে ফেলবেন! আমি কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দাও।

আগন্তুক॥ কাদের কথা বলছো? কাদের ভয়ে তুমি এত ভীত?

ভৃত্য॥ ঐ যে আমাদের মহামন্ত্রী, অমাত্যগণ, প্রতিহারী…এই সব রাজপুরুষরা…

আগন্তুক॥ হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি দিন বদলের আভাষ জানতে পার নি? অগণিত অত্যাচারিত মানুষের জাগরণের গান শুনতে পাও নি? মহামন্ত্রী, অমাত্যগণ, প্রতিহারী এরা সব তারাদের মত সূর্যের উজ্জল আলোয় বিলীন হয়ে গেছে। ওদের দিন শেষ। ওরা বিদায় নিয়েছে। আর আসবে না। তুমি নির্ভয়ে বলো।

ভৃত্য॥ তাহলে ওরা আর আসবে না? আঃ! বাঁচলাম! এতদিন পরে আজ প্রাণ খুলে সব কথা বলতে পারব! আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে! আনন্দে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! আঃ! আমি আজ সব বলব, সব বলব—

আগন্তুক॥ হ্যাঁ, সব বলবে! বল, রাজার সব কথা বল।

ভৃত্য॥ কিন্তু—কিন্তু বলব কি করে? কান্নায় আমার চোখ ফেটে জল আসছে। বুক ফেটে যাচ্ছে। আমাদের রাজাকে—(কান্নায় ভেঙে পড়ে)

আগন্তুক॥ একি! তুমি কাঁদছো কেন? কেঁদো না, বল রাজার কথা। কি হয়েছে রাজার?

ভৃত্য॥ আমাদের রাজাকে ঐ শয়তান মহামন্ত্রী আর তার দলবল ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধীরে ধীরে মেরে ফেলেছে। চোখের সামনে রাজাকে মরতে দেখেছি। ওদের ভয়ে আমরা মুখ খুলতে পারি নি। লুকিয়ে চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নি।

[এই সময় প্রজাগণ আবার ফিরে আসে।]

১ম প্রজা॥ নাঃ! কোথাও পাওয়া গেল না। আমাদের রাজা নেই।

২য় প্রজা॥ সমস্ত প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম কিন্তু কোথাও নেই আমাদের রাজা।

৩য় প্রজা॥ রাজা বোধ হয় কোথাও চলে গেছেন।

আগন্তুক ॥ মিথ্যেই তোমরা রাজাকে খুঁজে ফিরছো—রাজা নেই।

১ম প্রজা ॥ রাজা নেই? কি হয়েছে তাঁর?

২য় প্রজা ॥ আমরা জানতে চাই রাজার খবর।

আগন্তুক ॥ রাজাকে হত্যা করা হয়েছে। রাজা মৃত।

৩য় প্রজা ॥ এঁ্যা! রাজা মৃত! হত্যা করা হয়েছে!

ভৃত্য ॥ ঐ শয়তান মহামন্ত্রীর কাজ। ওদের ভয়ে এ সব খবর কেউ প্রকাশ করতে পারে নি।

২য় প্রজা ॥ কিন্তু আমরা যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে রাজার খবর পেতাম। ছবি ছাপা হ'ত—রাজার বাণী প্রকাশিত হত?

১ম প্রজা ॥ পাংশুবাণীতে রাজার কণ্ঠস্বর শুনতে পেতাম?

আগন্তুক ॥ বলি নি? ও সবই ভাঁওতা। মিথ্যে প্রচার। কৌশল মাত্র।

ভৃত্য ॥ হঁ্যা। সবই সাজানো। সবাইকে বোকা বানানোর জন্যে ওরা ঐ সব মতলব বার করেছিল। যারা জানতো, তারা ভয়ে বোবা হয়েছিল। আজ তোমরা এলে, ওদের দিন শেষ হ'ল। তাই আজ সব জানা গেল। অনেক দিন পরে যা এতদিন মনের মধ্যে লুকানো ছিল, বলতে পেরে বুকটা হালকা হলো।…(কাঁদ কাঁদ স্বরে) জান গো! ওরা যখন রাজাকে তিল তিল করে মেরে ফেলল, আজীবন নুন খেয়েও তখন আমরা সেই নুনের দেনা শোধ করতে পারিনি। ঐ আফসোস মরলেও যাবে না গো…নুনের দেনা যে শোধ হ'ল না…নুনের দেনা…

[কাঁদতে কাঁদতে ভৃত্য চলে যায়। প্রজারা আগন্তুকের চারপাশে এসে দাঁড়ায়। ওরা বিমূঢ়।]

১ম প্রজা ॥ আমাদের রাজা নেই! তাহলে এই রাজত্ব চলবে কি করে?

২য় প্রজা ॥ আমরা কার নির্দেশ মেনে চলব?

৩য় প্রজা ॥ বিধিনিয়ম কার আদেশে নিয়ন্ত্রিত হবে?

৪র্থ প্রজা দশের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল কে বিধান করবে?

আগন্তুক আচ্ছা—যদি রাজা নাই থাকে তো কি হয়?

সকলে ॥ তা কি করে হবে?

১ম প্রজা ॥ রাজা-বিনা-রাজ্য—এ আবার কেমন কথা?

২য় প্রজা ॥ রাজা বিনা সব রসাতলে যাবে।

আগন্তক ॥ এতদিন তো রাজা ছিল কিন্তু কি সুখে ছিলে তোমরা ?

সকলে ॥ সত্যিই তো! আমরা সুখে ছিলাম না।

আগন্তক ॥ তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে এসো আমরা রাজা ছাড়াই রাজ্য চালাই।

সকলে ॥ কিন্তু রাজা ছাড়া রাজত্ব…!

[ওরা পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে।]

আগন্তক ॥ (হেসে) না হে না—রাজা থাকবে। এখন থেকে তুমি, আমি সবাই রাজা। প্রজা আর কেউ থাকবে না। আমাদের শাসন আমরাই করব। আমাদের মঙ্গল আমরাই ভাবব। সুখের দিনে একসাথে হাসব, আর দুঃখে একসাথে কাঁদব। এখন থেকে আমরাই আমাদের রাজা—কেমন ?

১ম প্রজা ॥ (হেসে ওঠে) হিঃ হিঃ হিঃ! আমরা সবাই রাজা। এ যে দারুণ মজার ব্যাপার!

আগন্তক ॥ হ্যাঁ, এখন থেকে আমরা আমাদের এই রাজ্যকে মজার রাজত্বে পরিণত করবো। এখানে রাজা-প্রজা, উঁচু-নীচু, ধনী-গরীব কেউ থাকবে না। সবাই আমরা সমান। আমরা সবাই রাজা।

সকলে ॥ (আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে ওঠে) কী মজা! কী মজা! আমাদের রাজত্বে এখন থেকে আমরা সবাই রাজা!

[ওরা আগন্তুকের পিছন পিছন নাচতে নাচতে চলে যেতে উদ্যত হলে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে। পর্দা নেমে আসতে শুরু করলে পূর্বোক্ত সেই ঢাকী ঢাক নিয়ে আবার ছুটে আসে পাদপ্রদীপের সামনে। পর্দা নেমে যায়।]

ঢাকী ॥ দাঁড়ান, দাঁড়ান! বাবু মশাইরা, চলে যাবেন—আমার দু' একটা কথা ছেলো যে—(গড় করে) পেন্নাম হই বাবু মশাইরা! ঢাকের বাদ্যি শেষ হয়েছে। আর আমাকে ঢাক বাজাতে হবে না। এই দেখুন, ঢাকটা একেবারে ফেঁসে গেছে। বাঁচা গেছে! তাছাড়া, আমি আর

বাজাবো কেন, বলুন? দেখলেন তো—আমিও রাজা হয়েছি। আমাদের এই রাজত্বে আমরা যে সবাই রাজা। (গান গাইতে গাইতে পর্দার মধ্যে ঢুকে যায়)

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই মজার রাজত্বে।
ঢাকের বাদ্যি শেষ হ'ল আর বাজবে কি করতে?
আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা…

[ঢাকী চলে গেলে পর্দা সম্পূর্ণ পড়ে এবং প্রেক্ষাগৃহের সব আলো জলে ওঠে।]

[এ নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। কেবল মাত্র নীচের ঠিকানায় নাট্যকারকে আমন্ত্রণলিপি পাঠালেই চলবে।

৪৬ বেনিয়াপাড়া লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী]

পুরুষানুক্রম

অনুপম দত্ত

'পুরুষানুক্রম' একটি আইডিয়ায় দৃশ্যমান রূপের নাটক। চরিত্রগুলিতে কালক্রমের যে ধারা দেখান হয়েছে তা নির্ভর করছে অভিনয়দক্ষতা ও পরিচালনার উপর।

বিনীত আকাঙ্ক্ষা কোথাও কোনো গোষ্ঠি যদি এই নাটক মঞ্চস্থ করেন তাহলে নাট্যকার যেন তার সংবাদটুকু অন্তত পায়।

'শিক্ষকাবাস'
শ্রীশ্রীসারদাবিদ্যাপীঠ
দুবরাজপুর/বীরভূম

চরিত্র

হীরেন	বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ
সৌমেন	বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ—চেহারায় অতিবৃদ্ধ, খঞ্জ, বধির
জীবন	পঁয়তাল্লিশ অতিক্রান্ত বয়স—চেহারায় প্রৌঢ়, সৌমেনের বাবা
জনার্দন	বয়স শতাধিক—চেহারায় যুবক, সৌমেনের পিতামহ
ঈশ্বর	বয়স সহস্রাধিক—সুপুরুষ কান্তিময় চেহারা, সৌমেনের প্রপিতামহ
জগু	চাকর
ব্রাহ্মণ	বিগত পৃথিবীর উদারহৃদয় মানুষ ···ঈশ্বরের দ্বিতীয় ভূমিকা
শিকারী	বিগত পৃথিবীর বীরহৃদয় পরের জন্ম উৎসর্গীকৃত প্রাণ।
কণ্ঠস্বর	

পর্দা উঠলে দেখা যাবে স্থির চিত্রের মত ক্রুশবিদ্ধ যিশু। তাঁকে একজন ভীষণদর্শন মূর্তি বিশাল হাতুড়ির ঘায়ে

বিদ্ধ করছে এমন ভঙ্গী। পায়ের তলায় প্রার্থনারত শিশু। আলো মৃদু থেকে উজ্জ্বল। রঙ লাল। আবহসঙ্গীতে করুণ মূর্চ্ছনা। এই স্থিরচিত্রের পট-ভূমিকায় কণ্ঠস্বর :

—"আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে যে মহান পুরুষ জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন—যিনি মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে মানুষের কু-সংস্কারে, হিংসায়, লোভ-লালসায় হয়েছিলেন ক্রুশবিদ্ধ—সেই মহান পুরুষ যিশুখ্রীস্টের উদ্দেশ্যে নাটক পুরুষানুক্রম নিবেদিত।

আমরা আমাদের সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে প্রত্যেকদিন মুহূর্তে মুহূর্তে ক্রুশবিদ্ধ করে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি নাটকটি সেই দিকে আঙুল নির্দেশ করে দেখাচ্ছে।

প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, পুত্রদের মানসিক চেহারার যুগ পটভূমিকায় যে পরিবর্তন তারই দৃশ্যমান রূপের ঘাত-প্রতিঘাতের এই নাটক পুরুষানুক্রম।

বর্তমান যুগের জটিলতায় অল্প বয়সেই কেন আমরা পক্ককেশ, লোলচর্ম, মানসিকভাবে বধির, অন্ধ, পঙ্গু, তারই উত্তর এই নাটকের উপজীব্য বস্তু।

নাটকটি তলস্তয়ের 'the grain that was like an egg" নামে আশ্চর্যসুন্দর গল্পটির কাছে আবিষ্টতার ঋণ স্বীকার করছে।"

আলো নিভলে আরম্ভিক আবহসঙ্গীত বাজে পাশ্চাত্ত্য স্বরের চটুলতায় এবং আলো জ্বললে দেখা যায় বেশ অবস্থাপন্ন মানুষের একটি সাজানো গোছান ড্রইং-রুম। এই দৃশ্যপটটি এমন হ'বে যাতে প্রয়োজনে একটি পর্দা টানলে মুহূর্তে এই দৃশ্যসজ্জা আড়ালে চলে যায়।

ড্রইংরুমের দৃশ্যে সোফা, সেণ্টার টেবিল যেমন আছে তেমনি বইভর্তি আলমারি, দেয়ালে আধুনিক ছবি। পাশ্চাত্ত্য স্বরের চটুল পটভূমিকায় চাকর জগু একটা টাওয়েল নিয়ে প্রবেশ করে। সকালের ঘুম তাড়ানর আড়িমুড়ি ভাঙে। হাই তোলে। চোখ কচ্লায়। তারপর টেবিল সোফা পরিষ্কারের কাজে লাগে। এমন সময় বাইরে কলিংবেল বেজে ওঠে।

জগু॥ [মোছা থামিয়ে দরজার দিকে ভ্রূকুটি করে] এই সকাল বেলাতেই কে বাবা! খেয়েদেয়ে কাজকম্ম নেই, চলে এসেছো পরের বাড়ি। ডাক—ডাক খানিকক্ষণ, তারপর খুলব। [আবার কাজে মন দিয়ে] এই সকাল থেকে শুরু হ'ল এখন সেই রাত বারোটা পর্যন্ত। এ আসছে তো সে, সে আসছে তো এ। [আলমারির কাঁচ মুছতে রত হয়। একটু পরে আবার কলিং বেল বাজে। কাজ থামিয়ে] এ্যাহ্ একেবারে ঘোড়ায় জিন্ চাপিয়ে চলে এসেছে। আরে বাবা, কলিং বেল বাজিয়ে খানিকক্ষণ থাম্, ছাখ্। তা নয়, এই টিপলাম তো ঐ টিপলাম। যা খুলব না, কানে শুনব না। কি করবি কর্। [আবার কাজে মন দিতে যায়। কিন্তু আবার কলিং বেল বাজে। বিরক্তিতে] যাহ্ বাবা, জালিয়ে খেল দেখছি!

[বলতে বলতে জগু এগিয়ে এসে দরজা

খোলে। প্রবেশ করে একজন যুবক। স্যুট-
কোট পরা। হাতে এ্যাটাচি। চোখে সান্
গ্লাস। যুবক প্রবেশ করেই সোজা এগিয়ে
ঘরের মধ্যে আসে। এদিক-ওদিক পরিচিত
পরিবেশ দেখার মত তাকায়।]

জগু ॥ কাকে চাই আপনার ?

যুবক ॥ সৌমেন, আই মিন্, সৌমেনবাবু আছেন ?

জগু ॥ [যুবকের আপাদমস্তক দেখে] কি নাম বলব আপনার ?

যুবক ॥ আমার নাম ? ও—হ্যাঁ, বলবে দাস, আই মিন্ হীরেন দাস।

জগু ॥ অ. হীরেন দাস। ঠিক আছে, আপনি বসুন, আমি ছোটবাবুকে খবর দিচ্ছি। [যাবার জন্যে একটু এগোয়]

যুবক ॥ হ্যাঁ, শোনো। বলবে...আচ্ছা থাক্। কিছু বলতে হবে না। নামটা বললেই যথেষ্ট হবে। যাও।

জগু ॥ [বিস্ময়ে] নামটা বললেই যথেষ্ট হবে ? কিন্তু যদি না হয় তখন কি বলব ?

হীরেন। [একটা সোফায় বসতে বসতে] হবে হে, হবে। আমরা বহুকালের পুরোনো বন্ধু, সেই ছোটবেলা থেকে। তুমি যাও, বলে দেখো—

জগু ॥ [দ্বিধায় এবং বিস্ময়ে] বহুকালের পুরোনো বন্ধু ! ছোটো বেলার থেকে—কিন্তু...

হীরেন ॥ [একটা সিগারেট ধরিয়ে] হ্যাঁ হে, হ্যাঁ। যাও, বলে দেখ—

জগু ॥ কিন্তু...

হীরেন ॥ [বিরক্তিতে] আচ্ছা মুশকিল তো! তোমার এত ভাববার কি আছে ! তুমি যাও না। গিয়ে খবরটাই দাও, দিয়ে দেখ—

জগু ॥ [তবু দ্বিধায়] ঠিক আছে, তাই যাই। [যেতে গিয়ে আর একবার
ঘুরে দেখে, তারপর চলে যায়। হীরেন
একটুক্ষণ সিগারেট টানায় নিমগ্ন থাকে,
তারপর এপাশ ওপাশ তাকিয়ে ঘরটা দেখতে
থাকে আর নেপথ্যে জগুর কণ্ঠস্বর শোনা

যায়। যেন পাশের ঘর থেকে কথাগুলো আসছে, কিন্তু জগু খুব চিৎকার করে একটা কথা বার বার বলছে। যাকে বলছে তিনি ভীষণ বধির। কথাগুলো হীরেনের কানে গেলে সে ভ্রূকুটি করে নেপথ্যে তাকিয়ে থাকে। নেপথ্যে কথা হয়—]

জগু॥ আপনাকে ডাকছে।

সৌমেন। এঁ্যা?

জগু॥ ডাকছে, আপনাকে ডাকছে।

সৌমেন॥ ফোন বাজছে?

জগু॥ না না, আপনাকে একজন ভদ্রলোক ডাকছে।

সৌমেন॥ এক ডজন ভদ্রলোক! ওরে বাবা, সে কি রে, এত কেন? এঁ্যা, এত লোক!

জগু॥ আচ্ছা মুশকিলয়ে বাবা! এ কালা-কালাকে নিয়ে প্রাণটা ঝালাপালা হয়ে গেল! [গলা চড়িয়ে] বলি, ডাকছেন—ডাকছেন—ডাকছেন। এক—একজন ভদ্রলোক।

সৌমেন॥ অ। একজন ডাকছেন।

জগু॥ হঁ্যা।

সৌমেন॥ অ। তা কে, কে তিনি?

জগু॥ আজ্ঞে নাম বললেন হীরেন, হীরেন দাস।

সৌমেন॥ ধীরেন! ধীরেন দা! সে আবার কে রে বাবা!

জগু॥ যাহ্ বাবা! [চিৎকার করে] ধীরেন দা নয়, ধীরেন দা নয়। হীরেন, হীরেন, হীরেন দাস।

সৌমেন॥ অ, হীরেন। তাই বল্, ধীরেন ধীরেন করছিস্ কেন, এঁ্যা? ধীরেন ধীরেন করছিস্ কেন তখন থেকে? তা কি বলছে কি?

জগু॥ বলছে আপনার বন্ধু—

সৌমেন॥ বন্দুক! বন্দুকটন্দুক আমি কাউকে দিই না। বলে দে, হবে না।

জগু ॥ কি জ্বালায় পড়া গেল রে বাবা ! [চিৎকার করে] না না, বন্দুক নয়, বন্দুক নয়, বন্ধু। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়—দেখা—

সৌমেন ॥ অ। দেখা ! তা চল্…চল্…

[ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন একজন অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তার দুই বগলে ক্রাচ। কানে ইয়ার-ফোন। কুঁজো হয়ে এগোন। পেছনে জগু তাঁকে সাহায্য করে। পোশাক তাঁর অত্যাধুনিক। এগুতে এগুতে—]

সৌমেন ॥ কৈ রে জগু, কৈ কোথায় ?

জগু ॥ এই যে বাবু, চলুন, এই যে—

[হীরেন সহসা উঠে দাঁড়ায়। সৌমেন এসে হীরেনকে দেখে। হীরেন সিগারেট জুতোর তলায় চাপবার ভঙ্গীতে দাঁড়ায়। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ ফ্রিজ হয়ে যায়। তারপর—]

সৌমেন ॥ [একটু এগিয়ে ক্ষীণ দৃষ্টির জন্যে মুখের কাছে মুখ এনে] অ। আপনার কি দরকার ?

হীরেন ॥ দরকার মানে—আমি সৌমেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সৌমেন ॥ এ্যাঁ, কি বলছেন ? আম ঠিক ভাল রকম শুনতে পাই না কি না। এই কানের কাছে জোরে জোরে বলুন [বলতে বলতে ইয়ার-ফোনের রেগুলেটার বের করে ভ্যলুম বাড়ায়]

হীরেন ॥ [কানের কাছে মুখ নিয়ে] আমি সৌমেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সৌমেন ॥ [বিস্ময়ে] কি বললেন, সৌমেন ?

হীরেন ॥ হ্যাঁ।

সৌমেন ॥ কিন্তু সৌমেন…সৌমেন তো আমারই নাম।

হীরেন ॥ [বিস্ময়ে] আপনার নাম !

জগু ॥ হ্যাঁ বাবু, উনিই তো সৌমেন রায়।

হীরেন॥ সৌমেন রায়! কিন্তু আমার বন্ধু সৌমেন আমারই বয়সের···

সৌমেন॥ [একটা সোফায় বসতে বসতে] জানেন বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয়। এই পা দুটো একদম অকাজের হয়ে গেছে। তাছাড়া [জগুকে] কৈ রে জগু, ধর—

জগু॥ [সাহায্য করতে করতে] হ্যাঁ হ্যাঁ, বসুন বাবু, বসুন—

সৌমেন॥ [বসে] হ্যাঁ, তাছাড়া নানা ব্যাধি—এই চোখ, কান, হাত, পা—তা যাক্‌গে, বলুন আপনার কি দরকার—

হীরেন॥ [কি বলবে ভেবে পায় না] দরকার···মানে, দরকার [সহসা সৌমেনের কাছে এগিয়ে তার কাছাকাছি বসে জোরে] দেখুন, আমার বন্ধু সৌমেন রায়—সে এ বাড়িতে থাকত। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

সৌমেন॥ আপনার বন্ধু সৌমেন রায়!

হীরেন॥ [উৎসাহে] হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব।

সৌমেন॥ এ্যাঁ, কি বলছেন? [আবার যন্ত্রের ভ্যলুম বাড়ায়]

হীরেন॥ ছোট···ছোটবেলার বন্ধু। তারা এখানে—এই বাড়িতেই থাকত—এখন—

সৌমেন॥ ছোটবেলার বন্ধু!

হীরেন॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। এইটাই ওদের বাড়ি ছিল।

সৌমেন॥ ছিল! ছিল কি, এখনো আছে। আমি...আমিই তো সৌমেন রায়। আমার বাবা জীবন রায়, ঠাকুরদা জনার্দন রায়, ঠাকুরদার বাবা ঈশ্বর রায়—পুরুষানুক্রমে আমরা এই বাড়িতেই আছি। কিন্তু আপনি... আপনাকে তো—

হীরেন॥ [বড় বিব্রত অবস্থায়] আপনি, মানে আমার বন্ধু সৌমেন—তার বয়স ধরুন, এই আমার.. আমারই মত পঁচিশ ছাব্বিশ···দারুণ স্বাস্থ্য ছিল তার...ভরাট মুখ, ঝকঝকে চোখ—

সৌমেন॥ ছিল, আমারই তো ওসব ছিল। আর বয়স?

হীরেন॥ হ্যাঁ, এই আমারই মত পঁচিশ-ছাব্বিশ—

সৌমেন॥ কি বললেন, পঁচিশ-ছাব্বিশ! হ্যাঁ, ওই হবে, ছাব্বিশ বছর তিনমাস

এখন চলছে। মানে, প্রত্যেকদিন হিসেবটা খাতায় লিখে লিখে রাখি কি না। আজকে আমার বয়স ঠিক—

হীরেন ॥ আপনি...মানে তুমি, তুমিই সেই সৌমেন! আশ্চর্য! একি চেহারা তোমার হয়েছে! মনে হচ্ছে ষাট বছরের বুড়ো! কি করে এমন হ'ল সৌমেন?

সৌমেন ॥ এ্যাঁ? কি বলছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। শব্দগুলো সব কানের ভেতর জড়িয়ে গিয়ে গম্‌গম্‌ করে বাজছে। কেটে কেটে বলুন। স্পষ্ট করে।

হীরেন ॥ [নিদারুণ হতাশায়] আমি হীরেন দাস। আমাকে চিনতে পারছ?

সৌমেন ॥ হীরেন! ও—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। ঐ নামে যেন আমার এক বন্ধু ছিল।

হীরেন ॥ হ্যাঁ। আমি ..আমিই সেই।

সৌমেন ॥ [বিস্মিত তাকিয়ে] আপনি! কিন্তু সে যে চীন না জাপান কোথায়—

হীরেন ॥ আমেরিকা—আমেরিকায় ছিলাম, চার—চার বছর। [আঙুলের ভঙ্গী করে দেখায়]

সৌমেন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, চার বছর।

হীরেন ॥ সেই তো বলছি। চার বছরের মধ্যে এমন তোমার কি করে হ'ল?

সৌমেন ॥ [হাসতে চেয়ে] চার বছর। হয়ে গেল! [কথা পাল্টে] তাহলে তুমিই হীরেন! ভাল আছ?

হীরেন ॥ হ্যাঁ।

সৌমেন ॥ কবে এলে?

হীরেন ॥ কাল। কাল-ই ল্যাণ্ড করেছি। তারপর পুরোন বন্ধুদের মধ্যে তোমার কাছেই আজ প্রথম এলাম।

সৌমেন ॥ অ। ভালই করেছো। চা-টা খাবে?

হীরেন ॥ না, চা খেয়েই এসেছি। কেবল তোমাদের সঙ্গে দেখা, তোমাদের খবরাখবর—

সৌমেন ॥ তা বেশ। [পা ছড়িয়ে একটু আয়েস করে বসে। তন্দ্রায় চোখ বুজে যায়। হাই তোলে।]

হীরেন ॥ [এরপর কি বলবে ঠিক বুঝতে না পেরে] সৌমেন !

সৌমেন ॥ [শুনতে পায় না। নাক ডাকার আওয়াজ হয়। ঘাড় একপাশে কাত্ হয়ে যায়।]

হীরেন ॥ [বিস্ময়ে] সৌমেন—[জগুর দিকে তাকায়]

জগু ॥ ছোটবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন বাবু।

হীরেন ॥ ঘুমিয়ে !

জগু ॥ হ্যাঁ বাবু, এমনিই তো হয়। বাবু ঘুমিয়ে যেতে পারেন যখন তখন।

হীরেন ॥ কিন্তু এমন কি করে হ'ল ! আশ্চর্য ! কোনো কঠিন অসুখ-টসুখ ?

জগু ॥ না বাবু। উনি এমনি। ধরুন, আজ চার বছর ধরে তো দেখছি। তা উনি এমনিই। বরং আমাদের কত্তাবাবু, মানে, ছোটবাবুর বাবা ধরেন বয়েস তো কম হ'ল না। এই আপনার গিয়ে—

হীরেন ॥ মানে সৌমেনের বাবা, মানে জীবন কাকাবাবুর কথা বলছ ?

জগু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু। আপনি তো তাঁকে চেনেন দেখছি। তাঁকে ডেকে দেব বাবু ?

হীরেন ॥ কাকাবাবুকে ডাকবে ? তিনি ভাল আছেন তাহলে ? যাক্, ভালই হ'ল। তাঁকেই ডাক। এ তো দেখছি কাজের বাইরে হয়ে গেছে। তবু কাকাবাবুর সঙ্গে দু'একটা কথা বলা যাবে।

জগু ॥ হ্যাঁ বাবু, তাই ডাকি। আপনি বসুন [প্রস্থান]

হীরেন ॥ [ঘুমন্ত সৌমেনের দিকে একটু ক্ষণ স্থিরভাবে তাকিয়ে থেকে] স্ট্রেঞ্জ !

[প্রবেশ করেন জীবনবাবু। মাথার চুল কাঁচা-পাকা। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। এক বগলে তাঁর একটা ক্রাচ মাত্র। তবে হাঁটায় দৃঢ়তা আছে। পরনে সেই ইংরেজ যুগীয় বাঙালীর পোশাক।]

জীবন ॥ [প্রবেশ করতে করতে] আরে ! হীরেন যে !

হীরেন ॥ [উঠে এসে প্রণাম করে] ভাল আছেন কাকাবাবু ?

জীবন ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। তা তুমি কেমন আছ বাবা হীরেন ?

হীরেন ॥ ভাল, ভাল আছি কাকাবাবু। আপনি ?

জীবন ॥ ঐ চলে যাচ্ছে। বস বস। [দুজনে দু'টো সোফায় বসে। হীরেন ঘুমন্ত সৌমেনের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যায় কিন্তু তার আগেই—]

জীবন ॥ তুমি না আমেরিকা গিয়েছিলে হীরেন ?

হীরেন ॥ হ্যাঁ কাকাবাবু।

জীবন ॥ বাহ্, বেশ। তা সেখান থেকে যে ফিরে এলে ?

হীরেন ॥ একটা কোর্স ছিল ওখানে চার বছরের কাকাবাবু। এরপর ভাবছি দেশের কাজেই লাগব।

জীবন ॥ ভেরী গুড্, ভেরী গুড্। এইটাই তো চাই। তোমাদের মত লোক যদি বিদেশে রয়ে যায় তাহলে দেশের কি হ'বে বল। খুব ভাল করেছ। খুব ভাল—

হীরেন ॥ হ্যাঁ কাকাবাবু—কিন্তু সৌমেন—

জীবন ॥ [যেন এতক্ষণে ঘুমন্ত সৌমেনকে দেখে] ও, সৌমেন এখানে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে ! খুব ক্লান্ত কি না। আসলে কি জান···[বলতে গিয়ে থেমে যায়। সৌমেনের কাছে এসে গা ছুঁয়ে] সৌম···ও সৌম, মাই বয় ওঠ—

সৌমেন ॥ [সহসা ঘুম ভেঙে জীবনবাবুকে দেখে] ড্যাডি !

জীবন ॥ হ্যাঁ মাই বয়, ডোণ্ট স্লিপ্, তোমার বন্ধু হীরেন এসেছে—ওঠ, ওর সঙ্গে গল্প-টল্প কর। কদ্দিন পর এলো—

সৌমেন ॥ [কিছু শুনতে না পেয়ে একবার জীবনবাবু ও একবার হীরেনের দিকে তাকিয়ে] ড্যাডি, তুমি কখন এলে ?

জীবন ॥ এই তো এক্ষুণি। ডোণ্ট স্লিপ্ [হীরেনকে] তারপর বল হীরেন, তুমি ওখান থেকে কিসের কোর্স কমপ্লিট করে এলে।

[সহসা 'জীবন জীবন' করে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে জনার্দন রায়। সে একজন যুবক।

উজ্জ্বল চোখ, চমৎকার স্বাস্থ্য। পরনে পুরোনো দিন অর্থাৎ শতবর্ষ আগের বাঙালী পোশাক।]

জনার্দন ॥ জীবন, তুমি এখানে! আর আমি...[বলতে গিয়ে হীরেনকে দেখে থেমে যায়]

জীবন ॥ [উঠে দাঁড়িয়ে] আপনি আমাকে খুঁজছিলেন? আমি—এই যে সৌমেনের বন্ধু—আচ্ছা আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন হীরেন দাস সম্প্রতি আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। সৌমেনের ছোটবেলার বন্ধু।

জনার্দন ॥ [যুক্ত করে] ও আচ্ছা, নমস্কার।

হীরেন ॥ [উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়ায়, দু'জনে হাত ধরে]

জীবন ॥ [জনার্দনকে দেখিয়ে] আর বুঝলে হীরেন, উনি হচ্ছেন আমার ফাদার শ্রীযুক্ত জনার্দন রায়।

হীরেন ॥ [প্রচণ্ড বিস্ময়ে হাত ছেড়ে] ফা-ফাদার! আই মিন্, বাবা!

জীবন ॥ হ্যাঁ হীরেন, আমার জন্মদাতা, আমার বাবা শ্রীযুক্ত জনার্দন রায়।

হীরেন ॥ [বিস্ময়াঘাতে] স্ট্রেঞ্জ! আশ্চর্য!

জীবন ॥ আশ্চর্যই বটে। বসুন বাপি।

জনার্দন ॥ হ্যাঁ। এই যে বসি বাবা। [সোফায় বসে]

জীবন ॥ [বসতে বসতে] বুঝলে হীরেন, সেই যে তুমি শুনেছিলে আমার বাপি বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল—হ্যাঁ, তা প্রায় বছর চল্লিশ হবে, নয় বাপি?

জনার্দন ॥ [হেসে] হ্যাঁ বাবা, ঐ রকমই হবে।

জীবন ॥ হ্যাঁ, তা বুঝলে হীরেন, বাপি তো চলে গেলেন। আমরা তখন আর কত বড়। সমস্ত সংসার আমার ঘাড়ে পড়ল। ধর, বাবার শোকে পাগল প্রায় মা, তিনটি বোন-[সহসা কথা পাল্টে] আচ্ছা বাপি, আপনি কেন হঠাৎ অমন বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কৈ কখনো তো বলেন নি। কতবার জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু কথাটা আপনি বার বার এড়িয়ে গেছেন। আজ কিন্তু আপনাকে বলতেই হবে বাপি। বিশেষ

করে সৌমেনের বন্ধু যখন আমাদের সামনে রয়েছে। [আব্দারের গলায়] বলুন, বলুন না বাপি, কেন গিয়েছিলেন ?

জনার্দন ॥ [হেসে] ধুর্‌ পাগল। কেন গিয়েছিলাম সে কি আর মনে আছে! গিয়েছিলাম এইটাই জানি। তারপর আবার তো ফিরে এসেছি। কি বল হীরেন ?

হীরেন ॥ [বিভ্রান্ত গলায়] হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই। কিন্তু...

জনার্দন ॥ না না। এর মধ্যে আর কিন্তুর কিছু নেই হীরেন। এইটাই ঠিক। চলে গিয়েছিলাম, আবার ফিরে এসেছি। এই যেমন ধর, আমিও ফিরিয়ে এনেছি আমার বাবাকে—

হীরেন ॥ [বিস্ময়াঘাতে উঠে দাঁড়িয়ে] আপনার বাবা! তাঁকে ফিরিয়ে এনেছেন!

জনার্দন ॥ কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? আশ্চর্য, সৌম বাবাজী তোমাকে কিছু বলেনি ? আর বলবেই বা কি ? [সৌমেনকে একটু দেখে। তার নাক ডাকছে। সামান্য হেসে] আমার নাতি সাহেব তো এখন রিটায়ার্ডম্যানের যাবতীয় গুণাবলীতে ভূষিত—কেবল ঘুম আর ঘুম। যাক্‌গে, শোনো, আমার বাবা অর্থাৎ এই জীবনের ঠাকুরদা কিংবা বলতে পার, সৌমের প্রপিতামহ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরভূষণ রায়—

হীরেন ॥ [দুর্বোধ্য অধীরতায়] কিন্তু...কিন্তু আপনারা—

জনার্দন ॥ [থামিয়ে দিয়ে] আরে শোনো শোনো। অত অধীর হলে চলে ? শোনোই না ব্যাপারটা। তা বুঝলে, সেই আমার পিতাঠাকুর মশায় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরভূষণ রায়কে আমি কখনো দেখিনি।

হীরেন ॥ [বিভ্রান্ত গলায়] দেখেননি!

জনার্দন ॥ হ্যাঁ। দেখবো কি করে। আমার বাবা কতদিন আগের থেকে নেই জানি না। হয়তো আমার ভূমিষ্ঠ হবার আগের থেকেই নেই।

হীরেন ॥ ভূমিষ্ঠ হবার আগের থেকেই নেই! আশ্চর্য রকম সব কথা বলছেন আপনারা! নেই মানে কি মারা গিয়েছিলেন ?

জনার্দন ॥ [উঠে দাঁড়িয়ে] জানি না। মারা যেতে পারেন, চলে যেতে পারেন, কিংবা একেবারে কখনো নাও থাকতে পারেন। সেটা আমার

ভাববার বিষয় নয়, বুঝলে। বরং সেই শৈশব ছেড়ে আমি যত বাড়ছিলাম ততই আমার মনে হচ্ছিল আমি আমার বাবাকে ফিরিয়ে আনব, নিশ্চয়ই একদিন ফিরিয়ে আনব।

হীরেন ॥ ফিরিয়ে আনবেন!

জনার্দন ॥ হ্যাঁ, সে ভাবনাটা মানে আইডিয়াটা, আমার কাছে এত ধ্রুব, এত গভীর সত্য হয়ে উঠেছিল যে কি বলব তোমাকে হীরেন, আমার কোনো কাজে মন লাগত না। সব সময় প্রায় একা একা বসে থাকতে চাইতাম। কখনো চোখ বুজে, কখনো চোখ খুলে। আর তারই মধ্যেখানে বাবার চেহারাটা আমার কাছে প্রত্যক্ষ হ'ত। কি সরল নিষ্পাপ মুখ, কি আলোকদীপ্ত সে চেহারা। যেন, যেন—জান হীরেন, সেই বেদমন্ত্রে যাঁর বর্ণনা আছে, সেই যে 'আদিত্য বর্ণং...'

হীরেন ॥ আদিত্য বর্ণং!

জনার্দন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তেমনি, ঠিক তেমনি। দুটো বিশাল ঝকঝকে চোখ, পেশল বাহু, উদার উন্নত চেহারা। যেন সেই তপোবনের ঋষি। আমার বাবাকে দেখলে তুমি অবশ্যই বিশ্বাস করবে হীরেন যে আমি একবিন্দু বানিয়ে বলছি না—

হীরেন ॥ আপনারও বাবাকে আমি দেখবো!

জনার্দন ॥ নিশ্চয়ই। এসে পড়বেন যে কোনো সময়ে। সেই যে হীরেন জান, উষামন্ত্র 'ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাস কাশ্যপেয়ম মহাদ্যুতিম, ধ্বান্তারিম সর্ব পাপঘ্নম্'—সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি যে বেরিয়ে যান তারপর বন-বনান্তর, কিংবা নির্জন নদীর তীরে তীরে একা, একাকী ঘুরে বেড়ান। পাখীদের প্রভাত বন্দনায় সুর মেলান, হরিণ ময়ূর এদের সঙ্গে ছোটেন, কখনো বা নাচতে থাকেন।

হীরেন ॥ কি বলছেন আপনি এসব! উনি, মানে, মাথায় ওঁর—

জনার্দন ॥ [মৃদু হেসে] তুমি পাগল বলতে চাইছ তো? আরে না না, পাগল নন। খুব আত্ম-তন্ময়, আত্মভোলা মানুষ। কখনো হয়তো দেখবে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। একমনে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে চলেছেন।

হীরেন ॥ আশ্চর্য।

জনার্দন ॥ হ্যাঁ আবার কখনো বা কোনো অনাথ দুঃস্থের সেবায় এমন মেতে উঠেছেন যে খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে নেই। দিনরাত্রির কোনো জ্ঞান নেই। এমনি. আমার বাবা এমনি। তা কি বলব তোমাকে হীরেন, এই বাবাকে আমি ফিরিয়ে আনব এমন যে বিশ্বাসের দিনগুলো—সেইসব গভীর বিশ্বাস, হ্যাঁ, শোনো, সেই কথাটা তোমাকে বলি। [সহসা হীরেন দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল হতেই] আরে—বোসো না, বোসো। ওহো দেখতো সেই কখন থেকে তুমি এসেছো এক কাপ চা-ও দেয়নি। [জীবনকে] ছি ছি, জীবন, তোমরা যে দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছ! ঘরে এসেছে তার যথাযোগ্য মর্যাদা—

জীবন ॥ [লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে] আমার ভুল হয়ে গেছে বাপি। আমি ভেবেছিলাম সৌমর বন্ধু যখন—

জনার্দন ॥ কি জানি বাবা, তোমরা যে কি সব ভাব আজকালকার ছেলেরা। যাক্‌গে, জগু কোথায় গেল? [গলা চড়িয়ে] জগু, অ জগু—

জগু ॥ [নেপথ্যে] আজ্ঞে যাই কর্তা। [প্রবেশ করে জনার্দনকে] কর্তা!

জীবন ॥ আমাদের জন্যে জলখাবার নিয়ে এসো। আর সৌমর ওষুধের সময় হ'ল না?

জগু ॥ [জীবনকে] হ্যাঁ বড়বাবু।

জনার্দন ॥ হ্যাঁ রে, বাবা ফিরেছেন?

জগু ॥ না কর্তা, বড় মালিক তো এখনো ফেরেন নি।

জীবন ॥ আবার বড় মালিক বলে, জানিস না ঠাকুরদা ওসব শব্দগুলো একেবারে পছন্দ করেন না, বিরক্ত হন। তবু তুই—

জনার্দন ॥ স্বভাব, স্বভাব জীবন। তুমি আমি কি করব বল। ওর স্বভাবে দাসত্ব একদম ঘুন পোকার মত ঢুকে গেছে। বাবা চেষ্টা করলে আর কি হবে। [জগুকে] শোন্, বাবা ফিরলেই ওঁকে আমাদের এখানে নিয়ে আসবি।

জগু ॥ হুঁ্যা হুঁ্যা, কর্তা মশায় ফিরিলেই ওঁকে এখানে আনব।

জনার্দন ॥ হা হা হা। শুনছ জীবন, জগু কর্তা মশায় বলছে, হা হা হা।

বলি বাবা, আবার তো একটু পরে ভুলবি। আবার বড়মালিক বলবি, আবার বকুনি খাবি।

জগু॥ [মাথা চুলকে] কি করব কর্তা, ভুলে যাই। বার বার মুখস্থ করি আর ভুলে যাই।

জনার্দন॥ যাক্‌গে, শোন, আমাদের চা-টা এখানে দিয়ে যা। ওটা আবার ভুলিস না, বুঝলি?

জগু॥ আচ্ছা কর্তা। [প্রস্থান]

জনার্দন॥ বস বস হীরেন। [হীরেনকে পাশে বসিয়ে পকেট থেকে এলাচ দানা বের করে মুখে দিয়ে] তা বুঝলে হীরেন, আমার ঐ অবস্থা মানে ভাবান্তর দেখে সবাই হয়তো মনে করেছিল আমি সংসারবিরাগী হয়ে-টয়ে যাব। তাই একটা বিয়ে দিয়ে দিল। কিন্তু জানই তো যে যা সত্য বলে মানে--অর্থাৎ বুকের গভীরে যার যা ধ্যান তার থেকে কেউ কখনোই কাউকে সরিয়ে রাখতে পারে না। তেমনি আর কি, আমার বাবাকে ফিরিয়ে আনব···ফিরিয়ে আনব···[বলতে বলতে আবেগে উঠে দাঁড়িয়ে]···ফিরিয়ে আনব ভাবতে ভাবতে একদিন কোথায় যে চলে গেলাম···কোথায়···

হীরেন॥ [অধৈর্য হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে] ট্রাস্‌, সমস্ত বাজে, বোগাস্‌। হয় এরা সবাই···সবাই পাগল, নয়···নয়তো আমাকে এরা ট্রিক করেছে, একটা আবোল-তাবোল কথা-বার্তা। আমি চলে যাব--এখ্‌খুনি এখান থেকে—

সৌমেন॥ [হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে] এঁ্যা, কি বলছ? তুমি কি বলছ, থেকে যাবে এখানে? এই আমাদের ঘরে?

হীরেন॥ [চিৎকার করে] না। আমি চলে যাব। তোমাদের এই ভণ্ডামি আমি বিশ্বাস করি না। যতসব আজগুবী কথা—

সৌমেন॥ এঁ্যা, কি বলছ? আমি যে শুনতে পাচ্ছি না। আরো, আরো জোরে বল। কথা না বুঝতে পারলে আমার ভীষণ রাগ হয়। রাগ হলে হাত পা আরো কাঁপে। বুকের মধ্যে কি রকম করে। আমি নিশ্বাস নিতে পারি না। উহ্‌···নিশ্বাস··নিশ্বাস নিতে কি কষ্ট···

জীবন ॥ [এগিয়ে গিয়ে ধরে'] মাই বয়, মাই বয়! বি কোয়ায়েট প্লিজ। শান্ত হও। শান্ত হও মাই বয়…

[এই মুহূর্তে প্রবেশ করে ঈশ্বরভূষণ রায়। অত্যন্ত সুপুরুষ কান্তিময় চেহারা। বিশাল উন্মুক্ত বক্ষ। কপালে চন্দনের ফোঁটা। কাঁধে উত্তরীয়। পরনে কৌষেয় বস্ত্র। স্বভাব ধীর স্থির। সৌমেনের অবস্থা দেখে ধীর পায়ে এগিয়ে—]

ঈশ্বর ॥ জীবন, জনার্দন, কি ব্যাপার তোমাদের? সৌমেন অমন করছে কেন?

জনার্দন ॥ বাবা!

জীবন ॥ ঠাকুরদা!

ঈশ্বর ॥ হ্যাঁ। তোমরা সবাই বসবার ঘরে এমনভাবে! সৌমেন অমন করছে, কি হয়েছে কি তোমাদের?

জনার্দন ॥ কিছু হয়নি বাবা, আপনি বসুন। [হীরেনকে] দেখ হীরেন, আমি বলিনি, আমার বাবাকে দেখলে তোমার আর কোন সংশয় থাকবে না। সব কথাগুলো এবার মিলিয়ে নাও—দেখ, কি সরল নিষ্পাপ মুখ, কি জ্যোতির্ময়, কি আলোকদীপ্ত চেহারা—

ঈশ্বর ॥ [জনার্দনের পিঠে হাত রেখে] জনার্দন, ওসব থাক। তোমাকে আর পিতৃ প্রশংসা করতে হবে না। [হীরেনকে নির্দেশ করে] তা এ ছেলেটি কে?

জনার্দন ॥ এ তো সৌমেনের বন্ধু বাবা, হীরেন দাস।

ঈশ্বর ॥ অ। সৌমেনের বন্ধু। তা অমন করে দাঁড়িয়ে কেন? তোমরা বসতে বল নি বুঝি?

জীবন ॥ না ঠাকুরদা, ও তো বসেই ছিলো। কিন্তু বাবার—[জনার্দনকে নির্দেশ করে] গল্পগুলোকে বিশ্বাস করতে না পেরে ও রেগে উঠেছে, আর সেই রাগের মানে বুঝতে না পেরে সৌম—

ঈশ্বর ॥ [এগিয়ে এসে হীরেনের হাত ধরে] তুমি রাগ করেছ?

হীরেন ॥ [সহসা থিতিয়ে গিয়ে] না না, রাগ নয়। আসলে…আসলে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সবটাই কেমন যেন পাগলামী বলে মনে হচ্ছে।

ঈশ্বর ॥ অ, বুঝতে পারছ না! [মৃদু হেসে] সব বুঝতে নাই বা চাইলে হীরেন। আর বোঝাবার এমন কিই বা আছে! [হাত ধরে] এস, এস, আমরা দু'জনে পাশাপাশি ওখানে বসি। [বসতে বসতে] আচ্ছা হীরেন তোমার বয়স এখন কত হ'ল?

হীরেন ॥ [একটু দ্বিধায় সৌমেনকে দেখতে দেখতে] আজ্ঞে মানে ঐ পঁচিশ-ছাব্বিশ আর কি।

ঈশ্বর ॥ [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] হ্যাঁ, আমার সৌমেন, ঐ যে একদম বুড়িয়ে গেছে, আমার…আমার পৈ-নাতি বলতে পার, ওরও বয়স ঠিক তোমারই মত পঁচিশ-ছাব্বিশ।

হীরেন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটাই তো—

ঈশ্বর ॥ শোনো, শোনো। আর আমার ঐ নাতি জীবন, ধর, ওর বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরুল—

হীরেন ॥ অথচ সৌমেন আর উনি, মানে বয়সের এই পার্থক্য, তবু—

ঈশ্বর ॥ [কথা শেষ করতে না দিয়ে] আর আমার এই ছেলে জনার্দন তার বয়স, ধর, শতাধিক।

হীরেন ॥ শতাধিক। অথচ—

ঈশ্বর ॥ [মৃদু হেসে] কিছু না। মেনে নাও, জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে। আর যদি না মান তাহলে মনের ভেতর প্রশ্ন, প্রশ্ন আর প্রশ্ন, প্রশ্নগুলো কুরে কুরে খাবে। তোমাকে জ্বালাবে, ক্লান্ত করবে।

হীরেন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই করছে আমাকে। আপনার ছেলে ঐ জনার্দনবাবু, দেখতে যিনি যুবক, তাঁর বয়স যদি শতাধিক হয়, তাহলে, তাহলে আপনার বয়স কত? সহস্রাধিক?

ঈশ্বর ॥ সহস্র, সহস্রাধিক বলতে পার। তারও বেশী ভাবতে পার। মনে পড়ে—[আবেগে তন্ময় হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে]

"মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত-প্রাচীন—
পূরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।
রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি, যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রনা লাগি— স্রোতস্বিনী তীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাত বায়ে, ঋষি কন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ককেশ জালে
ত্যাগের মহিমা জ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।"

হীরেন ॥ [চঞ্চল ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে] এতো, এতো রবীন্দ্রনাথের লেখা সেই তপোবন কবিতা আপনি আবৃত্তি করছেন।

ঈশ্বর ॥ রবীন্দ্রনাথ! হবে হয়তো। যুগ-যুগান্তের চৈতন্য, ভাবানুষঙ্গ কোথায় কিভাবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় যে বয় তা কে বলতে পারে! কে বলতে পারে সেই তপোবনের ঋষির গভীর অনুভবগুলি যুগ ধারায় প্রবাহিত হয়ে তোমাদের রবীন্দ্রনাথে এসে নতুনকালের নতুন ভাষায় আবদ্ধ হয় নি? ছিলেন না তিনি সেই উপনিষদের যুগের কোনো আত্মতন্ময় ঋষি? আর সেই যুগ, সেই কাল, তপোবনের সেই দিনগুলি তাঁর সদাজাগ্রত চৈতন্যে বয় নি? বইতে বইতে আমাদের, হ্যাঁ, আমাদের সেই তপোবনের শান্ত, নিরুদ্বেগ, আত্মসমাহিত কালের কথা বাণীবদ্ধ হয়ে তোমাদের কবিতা হয়ে উঠল না?

হীরেন ॥ আশ্চর্য, আশ্চর্য আপনার কথাগুলি।

ঈশ্বর ॥ কিছুই আশ্চর্য নয়। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ধারা, প্রার্থনার ধারা, অনুভবের ধারা কোন দিন মিথ্যে হয় না হীরেন, হয় না। হয়তো

সাময়িক একটা ভ্রান্তি, কিছুকালের জন্যে ভুল পথে হাঁটা। কিন্তু একদিন যখন প্রশ্ন জাগবে, আত্মচেতনা জাগবে, সেদিন আমরা নিশ্চয়ই বুঝব কোথায় যেন, কোথায় যেন আবাদের সেই ক্রম উদ্ভিদ্যমান ব্যক্তিত্বে সেই সুপ্ত স্মৃতি, সেই লুপ্ত সুর জেগে উঠছে, বেজে উঠছে—

হীরেন ॥ কিন্তু, কিন্তু…

ঈশ্বর ॥ কোনো কিন্তু নেই হীরেন। কবিরা যুগাতীত, কালাতীত চৈতন্যের অধিকারী, তাই অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ এবং সে কথা তাঁরা তাই সহজে বলতে পারেন। কিন্তু এসব কথা থাক্ হীরেন। বরং যা দেখছো মেনে নাও। তারপর এসো খানিকটা গল্প করা যাক। গল্প না ভাল লাগে চল [হীরেনের হাত ধরে] চল তোমাতে আমাতে খানিকটা খোলা মাঠে বেড়িয়ে আসি। আকাশ দেখি, ফুল দেখি। দেখতে দেখতে সেই শ্যামলসুন্দর বনভূমি, স্নিগ্ধ প্রবাহিত নদী—

হীরেন ॥ [আবেগে তন্ময় হয়ে মন্ত্রের মত উচ্চারণ করে] শ্যামল সুন্দর বনভূমি স্নিগ্ধ প্রবাহিত নদী…

ঈশ্বর ॥ নদী পেরিয়ে বিদর্ভ, বিরাট, অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী, দেশ-দেশান্তর—

হীরেন ॥ আশ্চর্য, আশ্চর্য সেইসব প্রাচীন ভারতের নগর! কতকাল, কতকাল আগের সে সব দেশ, সে সব স্নিগ্ধ শান্ত নিষ্কলুষ জীবনধারা— ভুলে গেছি, ভুলে যাচ্ছি আমরা আজকের মানুষ…আপনি, আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন—

জনার্দন ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমার বাবা আমাকেও সেখানে নিয়ে যাবেন বলেছেন হীরেন। কিন্তু বাবার সেই স্বপ্নের সোনালী দেশটার প্রতি আমার সংশয় আছে হীরেন। যেমনভাবে একদিন তীব্র বিশ্বাসে বাবার অস্তিত্বকে আমি মনের মধ্যে পেয়েছিলাম বাবার গল্পের দেশটাকে আমি তেমনভাবে পাই না…পেতে চাই তবুও পাই না…[গভীর হতাশায় ভেঙে পড়ে]

জীবন ॥ [বিরক্তির চঞ্চলতায়] আরম্ভ হয়ে গেল ছেলেমানুষী। ঠাকুরদার হয়েছে এই একটা দোষ—কেবল মিথ্যে কল্পনা-বিলাস। তার সঙ্গে বাবার রোমান্টিকতা। অথচ কত বেলা হয়ে গেল। সকালের কত কাজ

এখনও বাকী। কারখানায় আজ স্ট্রাইক হবার সম্ভাবনা আছে। পুলিশের সাহায্য নিতে হবে—

সৌমেন ॥ [সহসা অস্বাভাবিক চিৎকার করে ওঠে] চালাও, গুলি চালাও, গুলি—

[সহসা দপ্ করে আলো নিভে যায়। একটু ক্ষণ পর আলো জ্বললে দেখা যায় একই ভাবে সবাই বসে। কেবল সেণ্টার টেবিলে এঁটো থালা, শূন্য গেলাস, চায়ের কাপ ইত্যাদি। দেখে বোঝা যায় খাওয়া শেষ হয়েছে। এবং ক্ষুধা-তৃপ্তির চিহ্ন সবারই মুখে আঁকা। জগু এঁটো থালা কাপ ডিস্-গুলো গোটাচ্ছে।]

জনার্দন। তাহলে বল হীরেন, আমার বাবা এই শ্রীযুক্ত ঈশ্বরভূষণ রায়কে যে আমি ফিরিয়ে এনেছি অতীত কালের এক বিস্মৃত যুগথেকে সেকথা তুমি বিশ্বাস করছ ?

জীবন ॥ বিশ্বাস না করার কি আছে বাপি ? উনি, মানে, ঠাকুরদা তো হীরেনের সামনেই আছেন। এতক্ষণ কথা বললেন, আলাপ হ'ল। এরপর বিশ্বাস না করার কোনা প্রশ্নই উঠতে পারে না।

জনার্দন ॥ না, তা তো পারেই না বরং যেটা সত্য, চোখের সামনে প্রত্যক্ষ—

জীবন ॥ হ্যাঁ, সেটাকে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে। কি বল হীরেন ?

হীরেন। [বিব্রত অবস্থায়] হ্যাঁ, তা তো বটেই কাকাবাবু। কিন্তু সব কথা মেনে নিতেও একটা কালানৌচিত্য দোষ ; আই মিন্, যাকে বলে অ্যানাক্রনিজম্—কাল পর্যায়ের একটা ভ্রান্তি সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে আমাকে পীড়িত করছে বার বার। আর সেইটাই প্রশ্নের খোঁচা হয়ে আমাকে বিদ্ধ করতে চাইছে। তা কি করে হয়, কি করে হয় !

ঈশ্বর ॥ কি, কি করে হয় হীরেন ?

হীরেন ॥ এই বয়সের এমন বিরাট ব্যবধান—চেহারার এমন পার্থক্য ! [বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়] তাই কখনো হতে পারে ? আর তাই

যদি হয় তাহলে তো কাল সম্পর্কে আমাদের ধারণাই উল্টে-পাল্টে যায়! যায় না কি জনার্দনবাবু? আপনিই বলুন। আপনি তো এখন প্রায় আমার সমবয়সী বলে মনে হচ্ছে। আর বাকীরা অদ্ভুতভাবে আমার সমগোত্রের বাইরে। এক আপনি ছাড়া আমি তো কাউকে কোনো সম্বন্ধে বা সম্বোধনে রাখতেই পারছি না। তাই আপনিই বলুন জনার্দনবাবু, এমন সব অসঙ্গতি এমন সব এলোমেলো ঘটনা কি ভাবে মেনে নেওয়া যায়? কি ভাবে মেনে নেব আমি?

ঈশ্বর॥ [সহসা দাঁড়িয়ে প্রাজ্ঞ গলায়] হীরেন, তাহ'লে তুমি সব বুঝতে চাও, জানতে চাও?

হীরেন॥ হ্যাঁ চাই, নিশ্চয়ই চাই। নইলে আমি সুস্থির হতে পারছি না।

ঈশ্বর॥ ঠিক আছে হীরেন, আমি সব বলছি। কিন্তু জেনো, সমস্ত বলতে বলতে একটা ট্রাজেডি ঘনিয়ে আসবে চারদিকে, একটা নিদারুণ শূন্যতা, ভীষণ একটা অসহায়তা বোধ। তখন তুমি নিজেকে কোথায় রাখবে ভেবে পাবে না, তোমার পায়ের তলার মাটি তখন সরে গেছে, দু'হাত বাড়িয়ে ধরবার কোনো সহায় নেই। সে সব সহ্য করতে পারবে হীরেন?

হীরেন॥ [অধীরতায়] পারব, সব পারব। কেবল—কেবল এই প্রকাণ্ড রহস্যটা আমার কাছে প্রকাশ হোক, আপনি অনুগ্রহ করে তাই করুন··· প্লিজ ···

ঈশ্বর॥ [একটু দূরত্ব সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে] ঠিক আছে। তবে তাই হোক। শোনো, আমি মুহূর্তে এখানে দাঁড়ান স্তব্ধ হয়ে থাকা সমস্ত কালের, সমস্ত সময়ের বাণ্ডিলটাকে [একটা অলৌকিক গলা, ভঙ্গী এবং উচ্চারণে] দু হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবো। আর তা করতে গিয়ে প্রথমে একটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এগিয়ে আসবে···ঐ এগিয়ে আসছে··· এল···

[বলতে বলতে মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যাবে। আর তারই মধ্যে অলৌকিক এক গমগমে গলা বেজে উঠবে—]

কণ্ঠস্বর। এই অন্ধকারে আলো জ্বললে দেখবে হীরেন, গতকাল—যার নাম অতীত, যেখানে আমি ছিলাম, আমরা ছিলাম—সেই পৃথিবী। সে পৃথিবীতে আমাদের জীবন সহজ সরল। সেখানে আমাদের সারাদিনের কাজ সহযোগিতায়, সহৃদয়তায়। মাঠের বুক জোড়া ফসলের সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তুলতে চেয়ে আমরা হাল দিই, বীজ বুনি, ফসল কাটি। মাথার উপর বর্ষা, রৌদ্রের আড়াল দেবার জন্যে ঘর গড়ি হাতে হাত মিলিয়ে। আর সারাদিন ক্লান্তির পর সন্ধ্যায় শান্তির ঘরে ফিরি। তখন তপোবনে উচ্চারিত হয় সেই বেদমন্ত্র...

[মঞ্চে আবছা আলো ফোটে। দেখা যায় হীরেন একাকী স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে। দৃশ্যপটে শুধু শূন্যতা। নেপথ্যে ধ্বনিত হয় সম্মিলিত গলায়—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥"

প্রবেশ করে এক সৌম্যমূর্তি। ঈশ্বরের হাতে তার খাবার, অন্য হাতে জল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে হাতে কিছু নেই। সমস্তটাই প্রতীকি। প্রথমে সে দেবতার উদ্দেশ্যে খাদ্য পানীয় নিবেদন করে। তারপর কোথাও কেউ ক্ষুধার্ত আছে এমন আহ্বান জানায় সমভাগে ভাগ করে খাওয়ার জন্যে। সব শেষে এপাশে ওপাশে যেতে গিয়ে দেখতে পায় স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা হীরেনকে। খাদ্যের অর্ধেক ভাগ হীরেনকে দেয়। জলের

পাত্র তুলে ধরে তার দিকে। তারপর যে মুহূর্তে নিজে খাদ্য গ্রহণে রত হয়ে যায় ঠিক তখনই দৃপ্তভঙ্গীতে ছুটে আসে একজন যুবা-পুরুষ। কাঁধে ধনুক, তূণ ভরা তীর। এরও প্রতীকি ভঙ্গী মাত্র থাকবে। শিকারী সে। বনে বনে শিকার করে ক্লান্ত। সে থমকে দাঁড়ায় মঞ্চে। তাকে দেখে সৌম্যমূর্তি আবার খাবারের অর্ধাংশ তুলে ধরে। শিকারী করে ধনুক তূণ নামিয়ে রেখে ক্ষুধার্ত ভঙ্গীতে খাবার খায়, জল খায়। অবশেষে সৌম্যমূর্তি বাকী খাবার খেয়ে বিশ্রামের জন্যে অতিথিদের ডাক দেয়। হীরেন ও সৌম্য-মূর্তি বিশ্রামের ভঙ্গী করে। যুবা সশস্ত্র প্রহরায় চলা-ফেরা করে। পটভূমিতে এতক্ষণ বেজে চলা সেতারের সঙ্গীত পরিবর্তিত হয় একটা রোমাঞ্চকর ধ্বনিতে। দ্রুত লয়ের এই যন্ত্রসঙ্গীত উচ্চ পর্দায় উঠে। শিকারী চঞ্চল হয়। পটভূমিতে বাঘের গর্জন ওঠে ভয়ংকরভাবে। শিকারী ছুটে বেরিয়ে যায়। সমস্ত কিন্তু মূখাভিনয়ের ভঙ্গীতে হয়। নেপথ্যে বেজে ওঠে বাঘের ভয়ংকার ডাক, শিকারীর আর্তনাদ। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আবার আলো জ্বলে। কিন্তু আলো কেমন ম্লান। দেখা যায় হীরেন একাকী স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে। নেপথ্যে অলৌকিক কণ্ঠস্বর ভাসতে থাকে, দূরাগত অথচ স্পষ্ট ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহে প্রতিধ্বনিত হয়।]

কণ্ঠস্বর। "এই দিবা রাত্তি আকাশ-বাতাস নহে, একা কারো নহে।
এই ধরণীর যাহা সম্বল,
বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল,
সু-স্নিগ্ধ মাটি, সুধা-সম-জল, পাখীর কণ্ঠে গান,—
সকলের এতে সম-অধিকার…"

আমাদের পৃথিবীতে সম অধিকার একদিন ছিল, অতিথি-অভ্যাগতদের সঙ্গে আমরা ভাগ করে খেয়েছি অন্নপান, এক ছাদের তলায় নিয়েছি বিশ্রাম। আর ছিল পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা; মানুষের প্রতি মানুষের একান্ত ভরসা, বিশ্বাস। তাই অপরের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে অকাতরে দিয়েছে বীর নিজ প্রাণ—আত্মদান। হীরেন, তারপর…তারপর পাল্টাল যুগ, মানুষের মনের ভিতর জেগে উঠল বনের হিংস্রতা। মুখটা হয়ে গেল মুখোস। দেখ, কি সাংঘাতিকভাবে আমাদের পরিবর্তিত জীবন—

[সহসা মঞ্চে প্রবেশ করে জীবন। এখন তার বগলে ক্রাচ নেই। চলায় গতিতে প্রচণ্ড অহংকার। সেই অহংকারের মত্ততায় হাঁটতে হাঁটতে হীরেনকে দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। মঞ্চে রহস্যময় আলো-অন্ধকার। তারই মধ্যে হীরেনকে—]

জীবন। এই যে এসেছো! কি বলছে তোমার দল?

হীরেন। [মন্ত্রচালিতের মত] না, ওরা মানবে না। ওরা বলছে ওদের পরিশ্রমের রক্তে বোনা ফসলের অর্ধেক ভাগ কেবল আপনার মালিকানা সর্ত বলে দেবে না।

জীবন। হুঁ, আর কি বলছে?

হীরেন। ওরা বলছে ওদের শক্তিতে আপনার কারখানা চলে উৎপাদন হয় দ্রব্য, ওরাও তার মুনাফা নেবে। বাড়াতে হবে মজুরী, দিতে হবে বোনাস।

জীবন। হুঁ, আর কি বলছে?

হীরেন। "শুধু শ্বেতদ্বীপে
যোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে
সাদা রবে সবাকার টুঁটি টিপে এ নহে তব বিধান।"

জীবন ॥ আর?

হীরেন ॥ "চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চশির।
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি, ভেঙেছে কারাপ্রাচীর"

জীবন ॥ ও! আর তুমি—তুমি কি বলছ নিপীড়িতের দলপতি? [পকেট থেকে টাকার বাণ্ডিল বের করে দোলাতে থাকে]

হীরেন ॥ [সেদিকে লোভাতুর ভঙ্গীতে তাকিয়ে] আমি—আমি প্রভু—[বিনয়ে ভেঙে পড়ে]

জীবন ॥ হাঁ, তোমার বউ ছেলেমেয়ে—

হীরেন ॥ বড়, বড় দুঃখী তারা হুজুর। ভাল খেতে পায় না, পরতে পায় না—

জীবন ॥ [টাকার বাণ্ডিল নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে] তোমার ভবিষ্যৎ—

হীরেন ॥ অন্ধকার প্রভু, বড় অন্ধকার—একবিন্দু আলো নেই—

জীবন ॥ যদি আলো জ্বালিয়ে দিই তোমার ভবিষ্যতে তাহলে তুমি কি দিতে পারবে?

হীরেন ॥ [ব্যাকুলতায়] আমার সব, আমার সমস্ত সত্তা। [নতজানু হয়]

জীবন ॥ না। তোমার কিছু আমি চাই না। কেবল ওদের স্বপ্নটায় আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে তোমাকে। পুড়িয়ে ছাই করে দিতে হবে। পারবে?
[দ্রুত প্রস্থান]

হীরেন ॥ পারব, নিশ্চয়ই পারব প্রভু। শুধু শুধু একটা বিশ্বাসঘাতকের দেশলাই কাঠি চাই—[চিৎকার করে] একটা দেশলাই কাঠি, বিশ্বাসঘাতকের দেশলাই কাঠি আমাকে দয়া করে দিন প্রভু—একটা কাঠি—

[হঠাৎ থেমে যায়। চারপাশে উদ্‌ভ্রান্তের দৃষ্টিতে তাকায়। দেখে কেউ কোথাও নেই, মঞ্চে সে একা দাঁড়িয়ে। তার চারপাশে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত আলোর ফলা উদ্যত। সেই আলো দেখে নিদারুণ হতাশায় কেঁদে ওঠে—]

না না, এসব—এসব আমি কি বলছি! মিথ্যে, সব মিথ্যে! আমি কখনো এমন বিশ্বাসঘাতক হইনি। না, কখ্খনো না। [উঠে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত উত্তেজনায়] এ সমস্ত একটা চক্রান্ত, একটা গভীর ষড়যন্ত্র যেখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে কয়েকজন চক্রান্তকারী তাদের কোনো গোপন উদ্দেশ্যসিদ্ধি করতে চাইছে। [বাইরের দিকে এগিয়ে] আমি চলে যাব এখান থেকে। চলে যাব—

[যাবার জন্যে এগোয়, এমন সময় প্রবেশ করে সৌমেন। এখন তার বগলে ক্রাচ নেই। হীরেনের সমবয়স্ক চেহারা।]

সৌমেন ॥ দাঁড়াও হীরেন।

হীরেন ॥ [স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর মুখ ফিরিয়ে সৌমেনকে একটু দেখে ধীরে তার কাছে এগিয়ে এসে বিস্মিত গলায়] কে! সৌমেন!

সৌমেন ॥ হ্যাঁ। চলে যাবে বলছিলে! কোথায় যাবে তুমি?

হীরেন ॥ এই গোলকধাঁধাঁর বাইরে। চক্রান্তের বাইরে। এখানে, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে সৌমেন। এখানকার এইসব অসঙ্গতি, এইসব এলোমেলো ঘটনা—আমাকে···আমাকে তোমরা একটা চক্রান্তের মধ্যে ফেলেছ সৌমেন।

সৌমেন ॥ [ভয়ঙ্কর হেসে] চক্রান্ত! আমরা তোমাকে ফেলেছি!

হীরেন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা—তোমরাই ম্যাজিক দেখিয়ে পুরুষানুক্রম দেখাচ্ছ, অতীত বর্তমানের কোন নিয়ম না মেনে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে আমাকে তার মধ্যে ফেলে মিথ্যে একটা ভূমিকায় অভিনয় করাচ্ছ। [সহসা গলা পাল্টে] অথচ—অথচ বিশ্বাস কর সৌমেন, কাল বিদেশ থেকে ফিরে তোমার, তোমারই জন্য সর্বপ্রথম আমার মন ছটফট করেছিল। তাই আজ সকাল না হতেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি—কেবল একবার, আমার অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু তুমি, তোমাকে দেখবো—তোমার সঙ্গে গল্প করব, হাসব—এই, এইমাত্র। [হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে] কিন্তু তুমি, তোমরা—

সৌমেন ॥ [কঠিন গলায়] না, তুমি কেবলমাত্র সেইজন্যে আসনি হীরেন।

হীরেন ॥ [দুর্বোধ্যতায়] সৌমেন !

সৌমেন ॥ হ্যাঁ, না এসে তোমার উপায় নেই।

হীরেন ॥ উপায় নেই !

সৌমেন ॥ কোনো উপায় নেই, ছিল না। কেননা, যে সমাজের থেকে তুমি পালিয়ে থাকার জন্তে আমেরিকায় চার বছর কাটিয়ে এলে, সেই সমাজে ফিরে যাবার সমস্ত পথ তোমার বন্ধ হীরেন। সেখানে গেলে তোমার সমস্ত শরীর টুকরো টুকরো হয়ে পথে ছড়িয়ে যাবে। তাই আমার কাছে আসা ছাড়া তোমার কোনো গতি ছিল না।

হীরেন ॥ [আতঙ্কে] সৌমেন !

সৌমেন ॥ তোমার মধ্যবিত্ত মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, তোমার বউ অতি সাধারণ—গ্রামের মেয়ে, অতি সাধারণ মেধা তোমার দু'টি ছেলে, একটি মেয়ে, তোমার সেই গ্রামের পাড়া-প্রতিবেশী—তাদের থেকে তুমি আলাদা হতে চেয়েছিলে মনে পড়ে, হীরেন ? তুমি সেই জীবনকে ঘৃণা করতে—

হীরেন ॥ এখনো করি। কেননা সেখানে জীবনের কোনো সার্থকতা নেই, ঔজ্জ্বল্য নেই। সে জীবন পশুর মত। কেবল খাওয়া, ঘুম, বংশবৃদ্ধি—

কণ্ঠস্বর ॥ [নেপথ্যে অলৌকিক স্বরে] তারা তোমাকে ভালবেসে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনে নিয়ে গিয়েছিল। তোমার দুঃখে তাদের সহানুভূতি ছিল, তোমার অসুখে তাদের সেবা, তোমার সুখে তাদের উৎসব। তারা ভেবেছিল তুমি তাদেরই একজন। তাই তারাও আশা করেছিল তাদের দুঃখে শোকে তোমার সহানুভূতি, তাদের আনন্দে তোমার উৎসাহ। কিন্তু তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের ঘৃণা করেছ —আর ঘৃণায় সরে থাকতে থাকতে—

সৌমেন ॥ [কণ্ঠস্বরের গলা কেড়ে নিয়ে] আমার ওষুধের ভেজালের কারখানার লাভের টাকা তোমার পকেটে কি নেই হীরেন ?

হীরেন ॥ সৌমেন !

কণ্ঠস্বর ॥ (নেপথ্যে) সেই তোমার জন্মভূমির গ্রামে সে-বার কলেরার মহামারী লেগেছিল, তোমার মনে আছে ?

হীরেন ॥ [কণ্ঠস্বরের উদ্দেশ্যে] সেটা ওদের অজ্ঞতার দোষ। অপথ্য কুপথ্য খেয়ে—

কণ্ঠস্বর ॥ ঠিক। কিন্তু তাদের আরোগ্যের ওষুধ সাপ্লাই করার জন্যে তুমিই টেণ্ডার নিয়েছিলে। তারপর যত ভেজাল ওষুধ সরবরাহ করেছিলে। তোমার মনে পড়ে হীরেন? সে সব ওষুধে কোনো কাজ হয়নি। মরে ছিল তোমার বউ ছেলে মেয়ে, মনে পড়ে? মনে পড়ে?

হীরেন ॥ [চিৎকার করে] আমি জানি না। আমি জানি না।

সৌমেন ॥ হীরেন!

হীরেন ॥ [ভেঙে যাওয়া এক মানুষের মত নিথর দাঁড়িয়ে থাকে।]

কণ্ঠস্বর ॥ সে-বার গ্রামের মাঠে উপচে পড়া ফসল দেখে তোমার চোখ লোভে লালসায় চক্‌চক্‌ করে উঠেছিল। রাতের অন্ধকারে অন্ধকারে টাকার বাণ্ডিল খুলে ছড়িয়ে দিয়েছিলে তুমি, তোমারই গাঁয়ের মানুষদের সামনে। তারপর পথে বিপথে সমস্ত চাল দ্রুত কোথায় চলে গিয়েছিল হীরেন? কোথায় সেগুলো নিয়ে গিয়েছিলে?

হীরেন ॥ আমি জানি না। জানি না।

সৌমেন ॥ আমার গুদামের গোপনতায়। তার লাভের অংশ তোমার শরীরে, রক্তে, সভ্যতায়, কৃষ্টিতে মিশে আছে হীরেন। [অলক্ষ্যে প্রস্থান]

কণ্ঠস্বর ॥ আর তোমার ভাই-বোন, তোমার মা-বাবা শহরের পথে পথে তোমারই বিশ্বাসঘাতকতায় একটু ফ্যান চাইছে, একমুঠো ভাত চাইছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে...

হীরেন ॥ [উদ্‌ভ্রান্তের মত] থামাও...থামাও ঐ কণ্ঠস্বর সৌমেন। আমি... আমি আর সহ্য করতে পারছি না। সৌমেন ..ঐ কণ্ঠস্বর ..থামাও—আমি ...আমি...

[বলতে গিয়ে থেমে যায়। দেখে কোথাও কেউ নেই। কেবল তীক্ষ্ণ অস্ত্রফলকের মত আলোর রেখাগুলি চারদিক থেকে তাকে বিদ্ধ করছে। তারই মধ্যে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ভেঙেপড়া হীরেন এদিক ওদিক করে।

পটভূমিতে অনিশ্চিত চঞ্চল বাজনা বাজে।
মঞ্চের আলো নিভে যায়।
আলো জ্বললে দেখা যায় সেই আগের টেবিল চেয়ার সোফা সজ্জিত দৃশ্য। সোফায় বসে অতিবৃদ্ধ সৌমেন, প্রৌঢ় জীবন আর বৃদ্ধের মতই কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে বিধ্বস্ত হীরেন। একটু ক্ষণ স্তব্ধতা। পটভূমিতে সব হারানোর করুণ সুরমূর্চ্ছনা।]

হীরেন॥ তাহলে এই!

সৌমেন॥ [শুনতে না পেয়ে] এঁ্যা, কি বলছ?

জীবন॥ [আত্মগতভাবে] হ্যাঁ, এই।

সৌমেন॥ কি বললে নেই? কে? কে নেই? কি নেই?

হীরেন॥ আমাদের সেই চেহারা, আমাদের সেই শরীর আর নেই সৌমেন। আমাদের মন জরাগ্রস্ত—তাই আমাদের এই শরীর ব্যাধিতে জীর্ণ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু—আর তারই প্রকাশ আমাদের চেহারায়। বুঝেছি, আমি সব বুঝতে পেরেছি।

জীবন॥ [বিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়ে] পেরেছ? সব বুঝতে পেরেছ?

হীরেন॥ হ্যাঁ।

জীবন॥ [ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে এসে] আমার বাবার চলে গিয়ে কেন ফিরে আসা বুঝেছ?

হীরেন॥ না।

জীবন॥ আমার ঠাকুরদার ঐ ধরনের কথাবার্তা, ব্যবহারের কারণ তুমি বুঝেছ?

হীরেন॥ না।

জীবন॥ তাহলে? তাহলে তুমি কি বুঝেছ?

হীরেন॥ বুঝেছি তাঁরা কেউ ফিরবেন না এ যুগে আর।

জীবন॥ এঁ্যা—ফিরবেন না! সেকি, কোথায় গেলেন তাঁরা?

হীরেন॥ অতীতে। জীবনবাবু, এখন তাঁরা অতীতে।

জীবন ॥ অতীতে!

হীরেন ॥ হ্যাঁ। এখন আমাদের সামনে বর্তমান। বর্তমানের মনের চেহারা আমাদের শরীরে। আমরা বিশ্বাসঘাতক, তাই আমাদের বধিরতা—

সৌমেন ॥ এ্যাঁ, কি বলছ? আমি, আমি যে শুনতে পাচ্ছি না। আরো... আরো জোরে বল...

হীরেন ॥ আমরা স্বার্থপর তাই পঙ্গু—

সৌমেন ॥ [দুই ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার প্রচণ্ড প্রচেষ্টায় রত হতে হতে] আমাকে, আমাকে তুলে দাও...আমি...আমি যে উঠতে পারছি না...

হীরেন ॥ আমরা ছল, ক্রূর। তাই আমাদের অল্প বয়সেই পক্ককেশ, লোল চর্ম—

জীবন ॥ তাহলে?

সৌমেন ॥ [সহসা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ক্রাচ দুটো দূরে ছিটকে যায়। আর্ত গলায়] তোলো, আমাকে তুলে ধর...আমার ক্রাচ্...ক্রাচ্ দুটো এগিয়ে দাও...ক্রাচ্...আমার ক্রাচ্।

জীবন ॥ [দ্রুত এগিয়ে সৌমেনকে তুলে ধরতে ধরতে] মাই বয়···মাই বয়···

হীরেন ॥ [জীবনকে বাধা দিয়ে গম্ভীর গলায়] না জীবনবাবু, না। অমনি তোলা নয়। অমনভাবে আমরা আমাদের তুলে ধরতে পারব না। আমরা কেউ কাউকে তুলে ধরতে পারি না অমনভাবে। বরং আসুন একসঙ্গে আমরা বলি আমাদের পিতামহদের উদ্দেশ্যে : [একটু এগিয়ে দু'হাত প্রসারিত করে আবেগে] হে আমাদের পিতামহরা! তোমরা দাও, আমাদের ফিরিয়ে দাও সেই জীবন, আমাদের ফিরিয়ে দাও সেই মন। আমাদের তোমরা তুলে ধর···তুলে ধর···তুলে [জীবনকে চুপ করে থাকতে দেখে] কৈ, কি হল জীবনবাবু, বলুন, একসঙ্গে কোরাসের গলায় বলুন—

জীবন ॥ [হঠাৎ চমক ভেঙে] এ্যাঁ, বলব?

হীরেন ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমরা বলব। না বললে যে আমাদের মুক্তি নেই এই জড়ত্ব থেকে, পতন থেকে। বলুন—

সৌমেন ॥ [এই পটভূমিকায় মাটিতে উবু হয়ে খুঁজতে খুঁজতে] আমার ক্রাচ, ক্রাচ দুটো…আমার ক্রাচ…

জীবন ও হীরেন ॥ [সৌমেনের দুপাশে দাঁড়িয়ে, সামনের দিকে হাত প্রসারিত করে সমবেত গলায়] হে আমাদের পিতামহরা, তোমরা ফিরিয়ে দাও আমাদের সেই জীবন, ফিরিয়ে দাও সেই মন, আমাদের সেই শরীর, সেই দিন, সেই পৃথিবী। আমাদের তোমরা তুলে ধর…তুলে ধর…তুলে ধর…

[মন্ত্র উচ্চারণের মত এই পটভূমিকায় সৌমেনের আর্তকান্না বড় বিচিত্র করুণ ধ্বনিতে মিশে থাকে এবং 'তুলে ধর' শেষ শব্দটা নিয়ে সৌমেন শেষ মুহূর্তে আর্তনাদ করে ওঠে—]

সৌমেন ॥ আমাকে তুলে ধর…তুলে ধর…তুলে ধ—

[সহসা দুই হাত উর্ধে উৎক্ষিপ্ত নতজানু সৌমেন রুদ্ধবাক হয়ে যায়। ফ্রিজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তিনটি চরিত্র। আবহ-সঙ্গীত করুণ মূর্চ্ছনায় ধ্বনিত হয়। আস্তে আস্তে পর্দা নামে।]

কার্জন পার্ক সাক্ষী

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

চরিত্র

চক্রবর্তী	১ম চাষী
জগা	২য় চাষী
ভদ্রলোক	৩য় চাষী
নিবারণ	কেশব
গোপাল	সরকার
সমর	পুলিশ

[পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সুসজ্জিত ঘরে দ্রুত ক্রশবেল্ট খুলতে খুলতে চিৎকার করে পুলিশ অফিসার চক্রবর্তী ডাকে তার চাকর জগাকে।]

চক্রবর্তী॥ জগা—জগা—এই জগা—

জগা॥ যা—ই (দ্রুত ঢুকে) এজ্ঞে ?

চক্রবর্তী॥ এখনো তোর চা হলো না ?

জগা॥ এজ্ঞে, জল গরম হতি সময় লাগে, এজ্ঞে—

চক্রবর্তী॥ (টেবিল থেকে রুলকাঠ তুলে শাসিয়ে) এটা তোর মুখে পুরে তোর ঐ এজ্ঞে বলা ঘুচিয়ে দেব। এজ্ঞে ? চা চেয়ে আধ ঘণ্টা হয়ে গেল—

জগা॥ মুখের কথা বার করতি না করতি ··(বলতে বলতে চলে যায়। নেপথ্য থেকে শোনা গেল) জল গরম হতি সময় লাগে।

চক্রবর্তী॥ (শান্ত গলায়) কোথেকে যে জোটে সব আমার কপালে—

(টেবিলে রাখা রুলটা হঠাৎ নিচে পড়তেই চমকে ওঠে) কে? (আপনমনে হেসে রিভলবারটা টেবিল থেকে তুলে দেখে টেবিলের উপরের রুলটা নিচে পড়ে আছে। রিভলবারটা টেবিলের উপর রেখে হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে হাই তুলল।)

[জগা ঘরে ঢুকে চক্রবর্তীর সামনের টুলে চা রাখে। চায়ে চুমুক দিয়ে আড়চোখে চক্রবর্তী জগার দিকে তাকিয়ে তার মেজাজ বোঝার চেষ্টা করে। জগা রুলটা তুলে টেবিলের উপর রাখে।]

চক্রবর্তী॥ জগা—

জগা॥ এজ্ঞে?

চক্রবর্তী॥ পাশের ঘরে কে আছে?

জগা॥ এজ্ঞে, কেউ নেই।

চক্রবর্তী॥ এপাশে ওপাশে কেউ আছে?

জগা॥ নেই এজ্ঞে।

চক্রবর্তী॥ বাড়ির সামনে পেছনে?

জগা॥ এজ্ঞে না।

চক্রবর্তী॥ না। কখন দেখেছিস?

জগা॥ এজ্ঞে, আপনার ঘরে ঢোকার সময় দেখেছি।

চক্রবর্তী॥ রাসকেল। আমার ঘরে ঢোকার সময় দেখেছে। যা এখন দেখে আয়। (জগা চলে যায়) এমনভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে যেন কেউ টের না পায়। (চমকে) কে?

জগা॥ (ফিরে এসে) কই কেউ নেই তো কর্তা।

চক্রবর্তী॥ (রুলটার দিকে তাকিয়ে) কেউ নেই। (হাই তোলে) বাইরের হাওয়া কোন্ দিকে বইছে রে জগা?

জগা॥ হাওয়া! এজ্ঞে, হাওয়া বইছে।

চক্রবর্তী॥ হাওয়া তো বইছে। কিন্তু হাওয়া কোন্ দিকে বইছে তা বলতে পারিস? পারিস বলতে?

জগা॥ এজ্ঞে?

চক্রবর্তী ॥ কই বের কর। বের কর, প্যাকেটটা বের কর তাড়াতাড়ি। (টেবিলের ওপর থেকে একটা মোড়ক বের করে খুলে তার ভেতর থেকে দুটো ঝাণ্ডা বের করে। তেরঙা ঝাণ্ডা ও লাল কাপড়) লাঠি কই? (জগা তিনহাত লম্বা দুটো লাঠি দেয়) হুঁ। ঢোকা। (জগা একটাতে তেরঙা পতাকা ঢোকায় আর একটায় লাল কাপড় ঢোকাতে গিয়ে থেমে যায়) কিরে কি হল?

জগা ॥ এজ্ঞে, ঢোকানো যাবে না।

চক্রবর্তী ॥ ঢোকানো যাবে না মানে? কত বড় বড় দেশদ্রোহীর ইয়েতে আস্ত রুল ঢুকিয়ে দিয়েছি আর এই ঝাণ্ডাতে ঢোকাতে পারব না! কই দে আমার হাতে। (হাতে লাল কাপড় নিয়ে) বুঝলি জগা জীবনে এই প্রথম হাতে লাল ঝাণ্ডা নিয়েছি। কেমন দেখাচ্ছে রে আমাকে? (রুলটা আবার টেবিল থেকে পড়ে যেতেই চিৎকার করে) কে? (লাল কাপড় গুটিয়ে ফেলে)

জগা ॥ এজ্ঞে, রুলকাঠ।

চক্রবর্তী ॥ তুলে রাখ। কই লাঠিটা দে। (লাঠি নিয়ে লাল কাপড় লাঠিতে পরাতে গিয়ে তেরঙার দিকে তাকিয়ে) এক রঙার চেয়ে তেরঙাটাই ভাল। তবে এটাও মন্দ নয়। (পরাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে) কইরে লাঠি ঢোকানোর ইয়েটা কোথায়?

জগা ॥ (জিভ কামড়ে) এজ্ঞে, সেলাই করিয়ে আনতে হবে। (জগা রুলটা আবার তুলে রাখে)

চক্রবর্তী ॥ কেন, রেডিমেড লালঝাণ্ডা পাওয়া যায় না?

জগা ॥ এজ্ঞে, না।

চক্রবর্তী ॥ পাওয়া যাবে কোত্থেকে? আমাদের দেশে ছোটখাটো ব্যবসাদারদের দূরদৃষ্টি আছে নাকি? জানিস, যাদু একটাই। কঠোর পরিশ্রম, দূরদৃষ্টি—দূর—এ·ই আর দুটো কিরে? যা—বাবা, এখনই ভুলতে বসেছি!

জগা ॥ দিন, সেলাই করিয়ে আনি।

চক্রবর্তী ॥ আনিসনি কেন? সব ব্যাপারে তোকে আর কত বলব? এ ঘর

থেকে ফোন সরিয়েছিস ? (পতাকা দুটো ফাইলের তলায় চাপা দেয়)

জগা ॥ এজ্ঞে, কাল রাত্রেই ফোন সরিয়ে ফেলেছি।

চক্রবর্তী ॥ অ্যাঁ! কাল রাত থেকে কোন ফোন আমি পাইনি ? এরকম তো হয় না। হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে রে জগা ? (কলিং বেল বেজে ওঠে) যা কোন্ বানচোৎ এসেছে দেখ। আর শোন্, লালকাপড়টাকে তাড়াতাড়ি সেলাই করিয়ে নিয়ে আয়। আজকেই তো সব আউট হবে। কি হয় কে জানে। আর হ্যাঁ শোন্, কারও সঙ্গে কোন বাড়তি কথা বলবি না। বুঝেছিস ?

জগা ॥ এজ্ঞে, হ্যাঁ। (লাল কাপড়টাকে কাগজে মুড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে)

চক্রবর্তী ॥ কি হল ? যা।

জগা ॥ এজ্ঞে বাবু, এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন ? (আবার কলিং বেল বাজে)

চক্রবর্তী ॥ ঐ, আবার শালা বাজাচ্ছে। যা, দরজা খুলে দে। (জগা চলে যায়) তুই ওটা সেই সেলাই করতে চলে যাবি। (একজন বয়স্ক লোক ঢুকতেই) ও, আপনি। বসুন।

ভদ্রলোক ॥ কি ব্যাপার বাবা ? এত ঘামছ কেন ?

চক্রবর্তী ॥ গরম লাগছে না ? এবার শীত যেন পড়লই না। তা কি ব্যাপার আপনার মেয়ে কাল যায়নি ?

ভদ্রলোক ॥ যাবে না কেন—মেয়ের মুখে শুনলাম—

চক্রবর্তী ॥ কি শুনেছেন ?

ভদ্রলোক ॥ দেশের হাওয়া বদলাতে পারে শুনে তুমি নাকি বাবা একটু ঘাবড়ে গেছ ? তুমি তো সরকারের হুকুম তামিল করেছ। এত ঘাবড়ে যাওয়ার কি আছে ?

চক্রবর্তী ॥ ঘাবড়ে গেছি কে বলল ? ঘাবড়াব কেন ?

ভদ্রলোক ॥ আমাকে আবার কে বলবে ? আর অন্যলোকে বললেই বা আমি শুনবো কেন ? মেয়ের মুখে শুনে কাল রাত্রেই আসতাম। নেহাৎ ও বারণ করল তাই।

চক্রবর্তী ॥ (হাই তুলে) আমি কত বারণ করেছি, ওসব Confidential ব্যাপার অন্তের কানে তুলো না।

ভদ্রলোক ॥ দেখ বাবা, মেয়ে বাবা-মাকে বলবে না, আর কাকে বলবে বল? আমার কথা হল, তুমি তো Order মত ডিউটি করে গেছ—

চক্রবর্তী ॥ Order—Order—খালি Order—Order কি কেউ লিখে দেয়? এই যে সারা দেশে সাট্টা খেলা হয়, আমরা যে ধরি না এর কি কোন লিখিত Order আছে? চোরাই মদ ধরি না এর কি কোন Order খাতায় লেখা আছে? গত উনিশ মাসে ছাপ্পান্নজনকে World থেকে despatch করে দিয়েছি এর কি কোন Order খাতায় পাবেন?

ভদ্রলোক ॥ তাহলে কিভাবে হয়?

চক্রবর্তী ॥ ওসব Confidential ব্যাপার। তবে শুনে রাখুন, এসব অনেক Order ফোনে হয়, লেখা নিষেধ।

ভদ্রলোক ॥ ও। আচ্ছা, তাহলে সমরের মৃত্যুও কি—

চক্রবর্তী ॥ কোন্ সমর?

ভদ্রলোক ॥ ঐ যে কার্জন পার্কে নাটক দেখতে আসত ফি শনিবার।

চক্রবর্তী ॥ ও হো—হ্যাঁ হ্যাঁ সমর দত্ত। হ্যাঁ ওর ব্যাপারটা নিয়ে কাগজে কাগজে একটু হৈ-চৈ হয়েছে বটে। তা আপনারও কি বিশ্বাস যে ওকে আমি মেরেছি?

ভদ্রলোক ॥ আমার বিশ্বাস বলছ কেন বাবা। মেয়েতো আর বাপের কাছে মিথ্যা কথা বলতে যাবে না—

চক্রবর্তী ॥ দেখুন, কয়েকটা শনিবার ওদের নাটক আমরা দেখেছি। আমার ধারণা হয়েছে, একশটা বড় বড় নেতার ভাষণ যা না করতে পারে, একটা নাটক তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারে। অথচ দেশের লোক নাটক ভালবাসে। তাই ঠিক করলাম ওদের নাটকের সমর্থকদের খতম করতে পারলে নট নাট্যকার পালাবে। প্রাণের ভয়ে আর আসবে না নাটক করতে। তাই বেছে বেছে যারা মদত্ যোগায় তাদের সরানোর প্রোগ্রাম নিতে হল।

ভদ্রলোক ॥ সমর দত্ত মরার সঙ্গে সঙ্গে দেশ থেকে কি নাটক উঠে গেল?

চক্রবর্তী॥ উঠে যায়নি তবে কিছুদিনের জন্যে মিইয়ে গেছে তো। আর বাংলাদেশের লোকও তেমনি। দেশ বিপন্ন হলেও নাটক দেখা চাই। কী নাটক পাগল লোকরে বাবা! (জগা কাগজের মোড়ক নিয়ে ঢুকতেই) ওটা টেবিলের ওপর রাখ। (জগা রেখে বেরিয়ে যায়)

ভদ্রলোক॥ কি ওটা?

চক্রবর্তী॥ ওটা কিছু নয়। (কথাটা শেষ হতে না হতেই ভদ্রলোক সেটা খুলে লালঝাণ্ডা দেখে ফেলে) মানে বলা যায় না তো। হাওয়া যে—

ভদ্রলোক॥ এঁ্যা! তুমি কি নিশ্চিত যে এরাই—

চক্রবর্তী॥ না নিশ্চিত ঠিক নই। (বলে অন্য মোড়ক ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে হাই তুলে বসে)

ভদ্রলোক॥ (মোড়ক খুলে তেরঙা দেখে, হেসে) এই না হলে আজকালকার দিনে চলে? কখন যে কাকে লাথি মারতে হবে আর কাকে বাবা বলতে হবে কেউ বলতে পারে না। বেশ করেছ। না, তুমি যে তত ঘাবড়ে যাওনি এটাই তার প্রমাণ। আর হ্যাঁ, এক কাজ কর, দু-একটা ছবি টাঙিয়ে দাও। এই রামকৃষ্ণ—শরৎ—রবীন্দ্র—

চক্রবর্তী॥ রবীন্দ্র-টবীন্দ্র টাঙাতে পারব না। পঞ্জাবে গুলি চললে যে লোকটা এখানে প্রতিবাদ জানায় তার ছবি আর যাই হোক পুলিশ লাইনের লোক রাখতে পারে না। আমি দুটো ক্যালেণ্ডার একটা ফ্রেমে বাঁধাতে দিয়েছি। জগাটা যদি এখন বুদ্ধি করে আনে দেখতে পাবেন। আমাদের লাইনের কাজে এত ঝামেলা যে কি বলব। আমার অবশ্য বিশ্বাস, যে দল ছিল সেই দলই জিতে আসবে।

ভদ্রলোক॥ ছাই আসবে। তোমার ধারণা অত্যন্ত ভুল। আজকের কাগজগুলো পড়েছ? সব কাগজ সুর পাল্টে ফেলেছে। কাল যাকে রাজা বলেছে আজ তাকে ফকির বলছে। কাল যাকে সাধু বলেছে আজ তাকে চোর বলছে। আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলো বরাবর বড়লোকদের পক্ষে। আর বড় লোকদের মত হাওয়া বুঝে চলতে আর কেউ পারে না। ওরা বাতাসে গন্ধ পায়। তাছাড়া ওদের নিজেদের হাতেও দল থাকে। আজ পর্যন্ত কেউ বের করতে পেরেছে কোন্

ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোন্ দল কত চাঁদা পেয়েছে। কেউ জানে, কোন্ দল কোন্ জমিদারের কাছে কত নিয়েছে—এসব কেউ জানে না। তবে একদিন জানবে। সত্য চিরকাল ঢাকা থাকে না।

জগা॥ (দ্রুত ঢোকে। হাতে ছবির ফ্রেম। ফ্রেমের দুদিকে দুটো ছবি) এজ্ঞে এই যে, ফেরেমটাও এনেছি। ওই ঝাণ্ডাটা সেলাই করতে করতে দর্জিটা হাসল। পয়সা নিল না। বলে কিনা তোর বাবু যখন লালের দিকে টলছেন, এ তো বড় ভাল খবর। এতে পয়সা নেব না।

চক্রবর্তী॥ হুঁ। তোর দর্জি ব্যাটা দেখছি বেশি বুঝে ফেলেছে। (ভদ্রলোককে) এই যে বাবা, আপনাকে যে ফ্রেমের কথা বলছিলাম, এটাই সেটা। আগের দল জিতলে এই দিকটা ঘুরিয়ে টাঙাবো। আর নতুন দল জিতলে অন্য দিকটা টাঙাবো।

ভদ্রলোক॥ এতে মাত্র দুটো দলের ব্যবস্থা রেখেছ। যদি তৃতীয় দল জেতে? ওদের ঝাণ্ডা তো আবার দো রঙা। ওটাও একটা রেখে দাও। কে বলতে পারে দো রঙা দলও তো জিততে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমার অবশ্য ধারণা ঐ লালরাই এবারে জিতবে।

চক্রবর্তী॥ এখানে আমরা দো রঙাকে হিসেবে ধরিনি। আমাদের ধারণা হয় তেরঙা আর না হয় এক বগ্গা দল জিতবে।

জগা॥ তাহলে ফেরেমখান টাঙিয়ে দেবো?

চক্রবর্তী॥ দে।

জগা॥ কোন্ দিকটা দেখাবো? (টুলের ওপর উঠে ফ্রেম ঝুলিয়ে ধরে) দেয়ালের দিকে ফেরেমের কোন্ দিকটা রাখবো?

চক্রবর্তী॥ না জগাই আমাকে পাগল করে ফেলবে। আরে কোন্দিকটা দেয়ালের দিকে রাখবি সেটা আমি কি করে বলব?

জগা॥ না বললে আমি কি করে টাঙাবো? সব কথায় আমার উপর রাগ করলে আমার—

চক্রবর্তী॥ হাবাগোবার মত কথা বললে রাগ করব না?

জগা॥ আমি তো হাবাগোবা। হাবাগোবারা হাবাগোবার মতই কথা বলবে। হাবাগোবা না হলে খেটে মরি আর গালমন্দ খাই? আমার বাবা পই

পই করে বলে গেছে, ওরে শোন্ (কাঁদো কাঁদো হয়ে) হাবাগোবারা খেটে মরে, চালাক চতুররা গুছোয়। আমার ঠাকুরদা নাকি হাবাগোবা ছিল। সারাদিন খেটে মরত। ঐ খাটতে খাটতেই জমিজায়গা হারাল। আমার বাবা তার বাচ্চা। হাবাগোবার বাচ্চা হাবাগোবা—আমি আমার বাবার বাচ্চা। হাবাগোবার বাচ্চা।

চক্রবর্তী ॥ (চিৎকার করে) তুই নাব ওখান থেকে।

জগা ॥ ফেরেমটা তাহলে কি করব ?

চক্রবর্তী ॥ কিছু করতে হবে না। নাব। বুদ্ধু কোথাকার !

জগা ॥ (টুল থেকে নামতে নামতে) ঐ যাকে বলে বুদ্ধু তাকেই বলে হাবাগোবা। যার বাপ হাবা—

চক্রবর্তী ॥ (হাই তোলে) ফ্রেম বাঁধাতে কত নিয়েছে ?

জগা ॥ এই যা ! ফেরেম বাঁধানোর টাকাটাতো দিইনি।

চক্রবর্তী ॥ টাকাটা দে। আমি ওকে দিয়ে দেব।

জগা ॥ হেঁ। আপনার কাছে ও টাকা নেবে ? আপনার ফেরেম বাঁধাই করে ও টাকা নিতে পারে ? (পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে এতবড় জিভ বের করে দাঁড়িয়ে থাকে)

চক্রবর্তী ॥ কি হল মা কালী হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? টাকাটা কি হাওয়ায় উড়ে গেল না পকেটমার হয়ে গেল !

জগা ॥ এজ্ঞে।

চক্রবর্তী ॥ এজ্ঞে, কি এজ্ঞে ? আজ্ঞে বলতে পারিস না ? (বলতে বলতে তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলে) বল আজ্ঞে।

জগা ॥ আ-আ-জ্ঞে।

চক্রবর্তী ॥ (নাক কুঁচকে) উঃ। সক্কালবেলা খেয়ে এসেছিস্। তোকে আমি চাবকে শেষ করে ফেলবো। উঃ কি দুর্গন্ধ !

ভদ্রলোক ॥ থাক্ ওকে ছেড়ে দাও। এখন ওকে যত ভাল কথাই বল না কেন ওর মাথায় ঢুকবে না।

চক্রবর্তী ॥ আপনি জানেন না, এ ব্যাটা কত সুন্দর ছেলে ছিল। খাঁটি ছিল। বছর দুয়েক যেতে না যেতেই দেখুন এর কি অবস্থা হয়েছে।

ভদ্রলোক ॥ মানুষ পরিবেশের দাস।

চক্রবর্তী ॥ সাত সকালে ধেনো মদ গিলে আসবে!

ভদ্রলোক ॥ সত্যি, ইদানিং যেন প্রত্যেক পাড়ায় ধেনো মদের আড্ডা বসে গেছে।

চক্রবর্তী ॥ হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। (জগাকে) তুই হাঁ করে এখানে দাঁড়িয়ে কি শুনছিস? বাবাকে দেখতে পাচ্ছিস না? জলযোগের ব্যবস্থা কর।

জগা ॥ (ফ্রেম দেখিয়ে) তাহলে এটা কি করব?

চক্রবর্তী ॥ কিছু করতে হবে না। রাখ এখানে। যা।

জগা ॥ যাচ্ছি। (ফ্রেম সেখানেই রেখে দিয়ে) হুঁ। খেটেও মরব, কথাও শুনব। সাধে কি আর আমি হাবাগোবা।

চক্রবর্তী ॥ তুই আজকে বড্ড বকছিস তো। দাঁড়া তোর—(জগা চলে যায়)

ভদ্রলোক ॥ থাক্ এখন ওকে কিছু না-বলাই ভাল।

চক্রবর্তী ॥ ধেনো মদ খেয়ে এত লোক মারা যাচ্ছে তবু এরা খাবে।

ভদ্রলোক ॥ অল্প পয়সায় এত নেশা পাবে কোথায়? তোমরা এর বিরুদ্ধে স্টেপ নাও না কেন?

চক্রবর্তী ॥ নিতে বললে নিই।

ভদ্রলোক ॥ নিতে বলেনি?

চক্রবর্তী ॥ তা বলেছে। তবে বলার মধ্যে একটা হেরফের আছে তো। লিখে বলে একটা, ফোনে বলে অন্যটা। (হঠাৎ) তাহলে এই ছবিটা মানে কোন্ ছবিটা দেওয়ালের দিকে রাখা যায়?

ভদ্রলোক ॥ যে দল পেছোতে পেছোতে দেয়ালে ঠেকে যাবে—ওদের নেতাকে দেয়ালের দিকে রাখ।

চক্রবর্তী ॥ বা, বেশ বলেছেন। কিন্তু কে যে দেওয়ালে ঠেকবে?

ভদ্রলোক ॥ এক কাজ কর, যারা ইলেকশনে লড়েছে তারা প্রত্যেকেই হিংসার বিরুদ্ধে বলেছে। হিংসার বিরুদ্ধে মানেই তো অহিংসা? আর অহিংসা মানেই বুদ্ধ অথবা গান্ধী। তবে বুদ্ধের প্রভাব এখন এখানে নেই। অতএব তাকে রাখার দরকারও নেই। তুমি গান্ধীকে রাখতে পার। যেই জিতুক গান্ধী চলে যাবে।

চক্রবর্তী ॥ যাক্। একটা সমস্যার সমাধান হল। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে কোনটাই তো গান্ধী নয়। তাহলে তো আর একটা বাঁধাতে হবে।

ভদ্রলোক ॥ হ্যাঁ, তাই বাঁধাও। ঐ দো-রঙা দলের নেতার একটা, আর গান্ধীর। এই দুটো ছবি এভাবে বাঁধিয়ে নিতে পার।

চক্রবর্তী ॥ তাহলে দো-রঙা ঝাণ্ডাও একটা লাগবে।

ভদ্রলোক ॥ হ্যাঁ, তা অবশ্য লাগবে। তবে তুমি যদি বাবা 'গোল্ডেন রুল' মেনে চল, তাহলে তোমাকে কোনদিন কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না।

চক্রবর্তী ॥ গোল্ডেন রুল আবার কি ?

ভদ্রলোক ॥ এই তোমাদের—মানে পুলিশ ইন্সপেক্টরদের কিভাবে চলা উচিত সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভাইপোকে সাতটা উপদেশ লিখে দিয়েছিলেন। সেই উপদেশগুলোকে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'গোল্ডেন রুল' বলেছেন। এটা ১৩৫৮ সালের শ্রাবণ মাসে প্রবাসীতে বেরিয়েছিল। এই—এই যে—আমি পড়ছি। তুমি শোন—এই এক নম্বর (শুনতে শুনতে চক্রবর্তী মাঝে মাঝে হাই তোলে) এক—প্রথম প্রয়োজনীয় কথা। সত্য ভিন্ন কখনও মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখনও মিথ্যা নির্গত না হয়, তাহা হইলে চাকরি থাকে না। নিতান্ত পক্ষে কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মে। অবিশ্বাস জন্মিলে আর উন্নতি হয় না।

চক্রবর্তী ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ? মানে 'আনন্দমঠ, বন্দে মাতরমের' ইয়ে ?

ভদ্রলোক ॥ হ্যাঁ। দুই—দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা। পরিশ্রম। বিনা পরিশ্রমে কখনও উন্নতি হয় না। কখনও কোন কাজ পড়িয়া না থাকে। তিন—উপরওয়ালাদের আজ্ঞাকারী তাঁহাদের নিকট বিনীত ভাব। চাকরি রাখার পক্ষে এবং উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্ক করিও না। চার—আপনার কাজের রুলস্ অ্যাণ্ড ল্জ বিশেষরূপে অবগত হইবে। কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিশের লোক আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে তা না হইলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্ত। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখনও করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকেও করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে। (হঠাৎ মাথা তুলে জামাই

বা চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে দেখেন যে সে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ গলা ঝেড়ে জোরে জোরে পড়তে থাকেন) ছয়—সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে ব্যবহারের দ্বারা বশীভূত করিবে। কেহ শত্রু না হয়। কর্তব্যকর্মের অনুরোধে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়, তাহার উপায় নাই। দোষীর অবশ্য দণ্ড হওয়া চাই। সাত —নিষ্কারণে ভীত হইবে না। (ভীত শুনেই চক্রবর্তী চোখ খোলে)

চক্রবর্তী ॥ (কলিং বেলের শব্দ) জগা? কে এসেছে দেখ। জগা?

জগা ॥ (নেপথ্য থেকে) এজ্ঞে যাই।

চক্রবর্তী ॥ আসতে হবে না। কে এসেছে দেখ।

জগা ॥ (দ্রুত ঢুকে) নিবারণবাবু এসেছেন।

চক্রবর্তী ॥ ও-ঘরে বসতে বল।

জগা ॥ জরুরী দরকার বলছেন।

চক্রবর্তী—বল্ না বসতে। আমি বাবার সঙ্গে কথা সেরে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক ॥ জরুরী যখন, ওর সঙ্গেই আগে সেরে নাও।

জগা ॥ (ভদ্রলোককে) বাবু আপনি চা-টা খাবেন আসুন।

ভদ্রলোক ॥ বা, জগা তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে। কে বলে জগা হাবাগোবা।

জগা ॥ আবার কে? যে চেনে সেই বলে।

চক্রবর্তী ॥ (চিৎকার করে) তুই যাবি?

জগা ॥ (ঝট করে চলে গিয়ে বলে) নিবারণবাবু আসছেন।

নিবারণ ॥ (দ্রুত ঢুকে) নমস্কার, স্যার।

চক্রবর্তী ॥ নমস্কার। কি ব্যাপার?

নিবারণ ॥ বড়কর্তা ডেকেছেন।

চক্রবর্তী ॥ কি ব্যাপার? এই তো ভোররাত্রে ফিরলাম, বাবা। চাকরি নয়তো, একেবারে গোলামী। এত হাঁকপাকানি কিসের? কিছু হয়েছে?

নিবারণ ॥ (চারদিক দেখে নিয়ে) হাওয়া বোধ হয় উল্টোদিকে বইবে, স্যার। তাই বড়কর্তা ডকুমেণ্টগুলো সরিয়ে রাখতে চান।

চক্রবর্তী ॥ এসব কথা তোমার সামনে আলোচনা হয়েছে?

নিবারণ ॥ আমার সামনে হয়নি। তবে অনুমান। গতবারে দেখেছি তো—

চক্রবর্তী ॥ ঢের হয়েছে, চুপ কর। গতবারের সঙ্গে এবারের অনেক তফাৎ। গতবারে ছিল ফিকে লাল, গাঢ় লাল সব মিলে—আর এবারে ফিকে লাল নেই। অনেক তফাৎ। ওসব তুমি বুঝবে না। যাও, যাচ্ছি।

নিবারণ ॥ আপনার কি খুব দেরি হবে?

চক্রবর্তী ॥ (বিরক্ত হয়ে) কেন বলত? আজ তুমি এত প্রশ্ন করছ কেন? তোমাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করতে কেউ বলেছে?

নিবারণ ॥ না। মানে এক্ষুণি গেলে আপনার গাড়িতে চলে যেতাম।

চক্রবর্তী ॥ আমার গাড়ি। আমার গাড়ি কোথায়?

নিবারণ ॥ আজ্ঞে, আপনি যে গাড়িতে যাতায়াত—

চক্রবর্তী ॥ ওটা আমার গাড়ি নয়।

নিবারণ ॥ নয়।

চক্রবর্তী ॥ না, নয়। (ভদ্রলোককে দেখিয়ে) এঁর।

নিবারণ ॥ আমি জানতাম—

চক্রবর্তী ॥ ভুল জানতে। ওরকম অনেক ভুল ধারণা অনেকের থাকে।

নিবারণ ॥ তাহলে আসি।

চক্রবর্তী ॥ হ্যাঁ এসো। আর শোন, বলবে আধ ঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি।

নিবারণ ॥ আজ্ঞে বলব। (নমস্কার করে চলে যায়। ওর যাওয়ার দিকে বিরক্তির সঙ্গে চক্রবর্তী তাকিয়ে থাকে)।

ভদ্রলোক ॥ বিশেষ কিছু ঘটেছে নাকি?

চক্রবর্তী ॥ বুঝতে পারছি না। তবে এক্ষুণি বেরোতে হবে।

ভদ্রলোক ॥ লোকটা এলো কেন?

চক্রবর্তী ॥ বড়কর্তা ডাকছেন, জানাতে।

ভদ্রলোক ॥ ফোনে কি ওরা বলতে পারে না? আমাদের দেশের লোক এখনও ফোন ব্যবহার করতে পারে না।

চক্রবর্তী ॥ ফোন যে ডেড হয়ে আছে। আচ্ছা, আপনি তাহলে বিশ্রাম করুন। আমি যাই, দেখি কি অবস্থা!

ভদ্রলোক ॥ আমিও তাহলে উঠি।

চক্রবর্তী ॥ আপনি কি যেন বলছিলেন ?

ভদ্রলোক ॥ বলা মানে, ঐ সাবধানে বুঝে শুনে থাকো। হাওয়া যে কোন্ দিকে কখন গড়ায়—তবে খুব বেশি ওলট-পালট হবে বলে আমার মনে হয় না। ও! তোমার দেরি হয়ে যাবে। এসো।

চক্রবর্তী ॥ আমি তাহলে আসি। জগা—এই জগা—

জগা ॥ (চা নিয়ে দ্রুত ঢুকে) এজ্ঞে।

চক্রবর্তী ॥ উনি আছেন, দেখিস কোন অসুবিধা যেন না হয়।

জগা ॥ এজ্ঞে কী যে ব-লে-ন। (ভদ্রলোকের সামনে চা রাখে)।—

চক্রবর্তী ॥ কিছুই বলছি না। বলার আগেই তো তুমি বুঝতে পেরেছ। আর তোমার যে এখন কি অবস্থা তাও আমি বুঝতে পারছি।

ভদ্রলোক ॥ আ। ওর ওপর আর চটাচটি করো না. আমার কোন অসুবিধা হবে না। তুমি এসো। ও আমার যথেষ্ট যত্ন করে। (বলে হাসিমুখে জগার দিকে তাকান। চক্রবর্তী ভেতরের ঘরে ক্রশবেল্ট নিয়ে চলে যায়। ভদ্রলোক জগার কাছে গিয়ে বলে) হ্যাঁরে জগা, তোর বাবু এত ঘন ঘন হাই তুলছে কেন ? কাল রাত্রে গাদা গাদা পত্র পত্রিকা ঘেঁটে 'প্রবাসী' বের করে 'গোল্ডেন রুল' এনে পড়লাম। আর তোর বাবু হাই তুলতে তুলতে কি যে শুনলো মা গঙ্গাই জানেন। অত ভাল ভাল উপদেশ পড়ে পড়ে শোনালাম—

জগা ॥ এজ্ঞে ঐ তো বাবুর দোষ। ওসব ধম্ম কথা একেবারেই কানে তোলেন না। আজ ভোর থেকেই বাবুর মেজাজ টঁ হয়ে আছে।

ভদ্রলোক ॥ কেন ? সকালের চা-টা কি বেশ কড়া করে করিস্ নি ?

জগা ॥ এজ্ঞে, সকাল কি বলছেন ? সারারাত শেষ করি ভোররাত্রে এসেই চা—চা করে একেবারে দক্ষযজ্ঞ—

চক্রবর্তী ॥ (ইউনিফর্মের উপরে বেল্ট আঁটতে আঁটতে ঘরে ঢুকে কড়া মেজাজে জগাকে বলে) ভোরে এসেছি তো কি হয়েছে. উ ? সারারাত কি আমি ফুর্তি করে বেড়িয়েছি নাকি ? এঁ্যা ? কিরে ? তোর মা আমাকে বলে ব'লে তুইও আমাকে বলবি। তোরা পেয়েছিস কি ? এঁ্যা ? শোন্ জগা, এই শেষবারের মত তোকে বলে দিচ্ছি, এই বাড়িতে থাকতে হলে

আমার কাজের সমালোচনা করে থাকা চলবে না। আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে শুনতে হবে। না যদি শুনিস দূর করে দেবো। মনে রাখিস, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। (বেল্ট কষে বেঁধে বেল্টের কেসে রিভলবার পুরে হাতে রুল নিয়ে দ্রুত চলে যায়)

জগা ॥ (কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোককে) দেখলেন তো বাবু, আপনার জামাইয়ের কাণ্ড, নিজের চোখে দেখলেন তো? না! আর আমি এ বাড়িতে থাকব না। মা আজ আসুক—

ভদ্রলোক ॥ রাগ করছিস কেন? সারারাত ডিউটি করলে কি মেজাজ ঠিক থাকে। হ্যাঁরে জগা, সকাল সকাল তুই মদ খাস কেন? কি, বলবি না? তুই না বললে আমি জানব কি করে? তোর কিসের দুঃখ রে? কোন্ দুঃখ ভুলতে চাস তুই? নিশ্চয় আছে কোন দুঃখ। তা না হলে তুই এসব খেতিস না। কিরে, চুপ করে আছিস কেন? আমি তোকে এত কথা বলেছি, কেন বলেছি? কারণ আমি তোকে বিশ্বাস করি। অথচ তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না তাই না? কিরে, আমি ঠিক বলছি কিনা বল?

জগা ॥ এজ্ঞে, আপনাকে বিশ্বাস করি বাবু। আমার বড় দুঃখ বাবু। আপনি লেখাপড়া জানা লোক, অনেক খবর জানেন। কি বলব বাবু, না খেতে পেয়ে ধান তোলার আগে আমার পেথম বাচ্চাটা পেটে নিয়ে বউ মরে গেল। আর আমার কেউ নেই। এখানে আসি, আপনার নাতিরে নিয়ে ভুলে ছিলাম। তা কত্তাবাবু ওরেও নকশাল বলে গুলি করে মারল। তারপর থেকে আমার বাঁচতি ইচ্ছা করে না বাবু। বাঁচতি ইচ্ছা করে না। (কেঁদে ভেঙে পড়ে) ?

ভদ্রলোক ॥ (কিছুক্ষণ পরে) হ্যাঁরে জগা, সমর দত্তকে আমার জামাই মেরেছে কিনা জানিস? নিজের ছেলেকে মেরে যে নিজেকে বীর ভাবে, সে যে অন্যের ছেলেকে মেরে এত ভেঙে পড়ে কি করে তাই ভাবি। তুই এর হদিস পেয়েছিস? জামাই নাকি যখন তখন চমকে ওঠে তুই লক্ষ্য করেছিস? দেখেছিস?

জগা ॥ কেন দেখব না এজ্ঞে। সর্বক্ষণ বাড়িতে থাকি বাবু। কত কিছু তো

দেখি। আমরা চাকরবাকর মানুষ। সব আমাদের চোখে পড়ে। মুখ বুজে থাকি। বলি না। বললে সংসার ছারখার হয়ে যায়। আপনার নাতি মারা যাওয়ার পর থেকে এ সংসারে আর কোন বাঁধন নেই, এজ্ঞে। ঐ সময়ের মরার পর থেকে বাবুরও মেজাজ খারাপ থাকে। বাবু আর সে বাবু নেই, এজ্ঞে।

ভদ্রলোক॥ (সিগারেট ধরিয়ে) জগা, মেয়ের মুখে শুনলাম, সময় দত্তকে মারার দিনে তুই কার্জন পার্কে ছিলি, কি হয়েছিল রে?

জগা॥ কি হয়েছিল? (মঞ্চ অন্ধকার হয়। পরক্ষণেই গাছপালার ছায়া পড়ে মঞ্চে। মাতাল অবস্থায় জগা ও তার বন্ধু গোপালকে দেখা যায়)

জগা॥ কে যায়?

গোপাল॥ ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌ রাধেশ্যাম চৌধুরী।

জগা॥ ইলেক্‌শানে জিতল কে?

গোপাল॥ ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌ রাধেশ্যাম চৌধুরী।

জগা॥ জমিদারের পোঁ ধরে কে?

গোপাল॥ ডুগ্‌ ডুগা ডুগ্‌ রা—ধেশ্যাম চৌ—ধুরী।

জগা॥ জমিদারের টাকায় ইলেক্‌শানে লড়ে কে?

গোপাল॥ ডুগুর ডুগুর রাধে—শ্যাম চৌধু—রী।

জগা॥ জমিদারকে বিপদ থেকে বাঁচায় কে?

গোপাল॥ ডুগ্‌ ডুগ্‌ রা—ধেশ্যাম চৌ—ধুরী।

জগা॥ থানায় পুলিশ আনে কে?

গোপাল॥ ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌ রাধে—শ্যাম চৌধু—রী।

জগা॥ লেঠেল জোগাড় করে কে?

গোপাল॥ ঢাক্ ডুগ্‌ ডুগ্‌ রা—ধেশ্যাম চৌ—ধুরী।

জগা॥ দালালি করে বেড়ায় কে?

গোপাল॥ ডুগ ডুগা ডুগ রাধে—শ্যাম চৌধু—রী।

জগা॥ পরের ধনে পোদ্দারি করে কে?

গোপাল॥ ডু-উ-গ্‌ ডু-উ-গ্‌ রা—ধেশ্যাম চৌ—ধুরী।

জগা॥ কোর্ট-কাছারি করে কে?

গোপাল ॥ চ্যাম্ চ্যাম্ চ্যাম্ রাধে—শ্যাম চৌধু—রী।

জগা ॥ তোরে গেরাম থেকে তাড়াল কে ?

গোপাল ॥ (কেঁদে ভেঙ্গে পড়ার ঢং করে) র‍ াঁ—ধেঁ—শ্যা—মঁ চৌ—ধুঁ—রীঁ।

জগা ॥ তোর বাপকে ভিটেমাটি ছাড়া করল কে ?

গোপাল ॥ (রেগে গিয়ে) রাধেশ্যাম চৌধুরী।

জগা ॥ রাধেশ্যাম চৌধুরী মাইকী ?

গোপাল ॥ (জগাকে কোলে তুলে নিয়ে) জয়! জয়! জয়!

জগা ॥ তাহলে তুই আমার কথা মানলি ?

গোপাল ॥ মানলাম।

জগা ॥ সত্যি মানলি ?

গোপাল ॥ বলছি তো সত্যি মানলাম।

জগা ॥ মা কালীর দিব্যি মানলি ?

গোপাল ॥ মা কালীর দিব্যি মানলাম।

জগা ॥ তাহলে তুই আর আমি হাবাগোবা। হ্যাঁ, তুই ভোর কটায় উঠিস ?

গোপাল ॥ চারটে। তুই ?

জগা ॥ (চিৎকার করে) এই হাবা আগে জানবি তো ক-টায় ঘুমোতে যাই। আমার কর্তার রাতদিন জ্ঞান নেই। একবার দরজার বেল বাজলেই উঠে যেতে হবে। বউ যাবে না। ওটা ওর ডিউটি নয়। (গোপালের পাছায় লাথি মেরে) এ্যাই শালা—তুই ওরকম করছিস কেন ? শুনছিস আমার কথা ? এ্যাই—

গোপাল ॥ ধ্যাৎ—এই করেই নেশাটা ছুটিয়ে দেবে। পয়সা খরচ করে নেশা করব আর এই জগা বান্‌চৎ লাথি মেরে নেশা ছুটিয়ে দেবে।

জগা ॥ আমি তো শালা তোকে মেরেছি, নেশাকে মেরেছি যে ছুটে যাবে ?

গোপাল ॥ ঐ আমাকে মারা আর—আচ্ছা, তুই তো বললি তোর বাবা ছিল হাবাগোবার বাচ্চা। আর তুই হলি তোর বাবার বাচ্চা।

জগা ॥ তাহলে তুই মনে রেখেছিস। সত্যি কথা কিনা বল ?

গোপাল ॥ সত্যি কথা মানে! লাখ কথার এক কথা।

জগা ॥ তাহলে তুইও হাবাগোবা।

গোপাল ॥ হুঁ। হাবাগোবার বাচ্চা যদি হাবাগোবা হয়, তাহলে হাবাগোবার বন্ধুও হাবাগোবা। তুই আমার বন্ধু। তুইও হাবাগোবা!

জগা ॥ হাবাগোবা, খেটে মরে মাতব্বরে খায়।

গোপাল ॥ হুঁ লাখ কথার এক কথা। হাবাগোবা খেটে মরে মাতব্বরে খায়।

জগা ॥ আমি হাবাগোবা, রাত জেগে বসে থাকি। তুই হাবাগোবা, ভোর থেকে খেটে মরিস। আমার কর্তার গাড়ি আছে, গয়না আছে। তোর কর্তার বাড়ি আছে, দুটো ছুঁড়ি আছে আর একটা গাড়িও আছে। তোর কর্তা আমার কর্তা দুজনাই চালাক চতুর।

গোপাল ॥ ঠিক বলেছিস। লাখ কথার এক কথা। হাবাগোবা খেটে মরে মাতব্বরে খায়।

জগা ॥ তাহলে তুই হাবাগোবা, তোর বাবা হাবাগোবা—তার বাবা—

গোপাল ॥ তুই আমার বাপ মারে হাবাগোবা বললি? তবে যা। তোকে আমার কত্তাগিন্নীর একটা গোপন কথা বলব না।

জগা ॥ (তার কাছে এগিয়ে এসে) কি কথা রে?

গোপাল ॥ আছে।

জগা ॥ বল।

গোপাল ॥ কারটা শুনবি? কত্তার না গিন্নীর?

জগা ॥ গিন্নীর।

গোপাল ॥ না। আগে কত্তার বলব?

জগা ॥ তাই বল।

গোপাল ॥ বলব?

জগা ॥ (অধৈর্য হয়ে) ব-ল।

গোপাল ॥ কানে কানে বলব।

জগা ॥ (কানটা তার মুখের কাছে রেখে) তাই বল। (কিছুক্ষণ পরে অধৈর্য হয়ে) ব-ল।

গোপাল ॥ বলছি, বলছি। না, কত্তারটা বলব না, গিন্নীরটা বলব।

জগা ॥ (উৎসাহিত হয়ে) তোরে তো আগেই বললাম। গিন্নীরটা বল। ব-ল। এ-ই বল।

গোপাল ॥ বলব? কাউরে বলবি না তো?

জগা ॥ না বলব না। বল।

গোপাল ॥ কানে কানে বলব।

জগা ॥ ঢং করিস না. বল।

গোপাল ॥ সত্যি বলছি, বলব। কানে কানে বলব।

জগা ॥ ঠিক বলবি তো?

গোপাল ॥ ঠিক।

জগা ॥ ঠিক? (তার মুখের কাছে কান রেখে) বল। ব-ল।

গোপাল ॥ বলতেছি। কত্তাবাবুর আপিস যাওয়ার পর না—

জগা ॥ (অধৈর্য হয়ে) বল।

গোপাল ॥ না। লজ্জা করে।

জগা ॥ ধ্যাৎ শালা, বল না। আমিও তোরে মজার কথা বলব।

গোপাল ॥ তোরে একটা কথা বলি জগা…

জগা ॥ তুই শালা মাল খেয়েছিস। মাল খেয়ে কেউ একটা কথা বলে না। তুই দশটা বল। না, একশটা বল।

গোপাল ॥ ভগবান মাইনষের হাত দিয়েছেন, কেন? কাজের জন্যি। তোর এতবড় গতরখান আছে, কেন? কাজের জন্যি। আর সেই গতরটারে তুই পার্কে পার্কে রাখিস। এই তোর জন্যি আমার পার্কে ঘোরার অভ্যেস হল। তুই আমারে মাল খাওয়া শেখালি।

জগা ॥ ওরে শালা, আমি শেখালাম? তুই না বলেছিলি তোর বাবা—

গোপাল ॥ (রেগে গিয়ে) ছাখ বাপ তুলবি না বলে দিলাম! বাপ তুললি আমার মেজাজ গরম হয়ে যায়।

জগা ॥ আচ্ছা বেশ। বাপ তুলব না। তোর পেরাণ না চায় আসবি না।

গোপাল ॥ আসব না তো কি করব। বসি বসি ওদের খাওয়া দেখব। শালার কত্তাগিন্নী কি খাওয়ান খেতে পারে!

জগা ॥ অত হিংসে করিস কেন। তোরে দেয় না?

গোপাল ॥ বাবুরা আজকাল কিপ্‌টেমি শিখেছে। বেথায় প্রাণভরে দেয় না। চণ্ডীবাবু বলে, এই মাছ দিয়ে যা, রাখালবাবু বলে, কইয়ে দইয়ের নতুন হাঁড়ি নিয়ে আয়। কিন্তু চেয়ে দেখ, ধারে কাছে কেউ নেই। শালারা ক্রিয়াকর্মে খরচ করে না, এরা কি মানুষ!

জগা ॥ তুই থাম, বাবুরা আবার মানুষ ছিল কবে? কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন কেন রাখে জানিস?

গোপাল ॥ না।

জগা ॥ যাতে পেথম চোটেই সে যে কানা তা যাতে ধরতে না পারে। ঐ ছোটলোকগুলারে ভদ্রলোক নাম রেখেছে। শহরে আইলেই সব বাবু। গাঁয়ে থাকলি চাষা। বুঝলি?

গোপাল ॥ গেরামের জমিদারগুলোও কিপটের হদ্দ। আগে পূজাপাব্বণে যাত্রা তাত্রা করাত। এখন ওসব বন্ধ। বাড়িতে কাজকম্ম হয়—খরচ করবে না। শালা, খরচ করবি না, চাষাগুলোরে লুটেপুটে খাবি। অত টাকা রাখবি কোথায়? জানোয়ার—একেবারে জানোয়ার।

জগা ॥ জানোয়ারগুলারে তাড়াতি লাগে। ফিস্ ফিস্ করি বললি হয় না।

গোপাল ॥ চিল্লাতি হয়?

জগা। হুঁ চিল্লাতি হয়। লাঠিসোটা নে চিল্লাতি হয়!

গোপাল ॥ ওরে বাবা, লাঠিসোটা নিলে জমিদার বন্দুক নেবে।

জগা ॥ বন্দুক নেলে আম্‌মো বন্দুক নেব। আমার বাবুর বন্দুক আছে। তুই আমারে বলবি, আমি তোরে বন্দুক দেব।

গোপাল ॥ অত বন্দুক তুই পাবি কোথায়? জমিদার বন্দুক ধরবে। তারে আগলাতি পুলিশ বন্দুক ধরবে। পুলিশরে আগলাতি মিলিটারি বন্দুক ধরবে। মিলিটারি বন্দুক ধরলি সেবারে আমার বাবা মরেছিল। সারা গেরামে জানোয়ারদের সে কি দাপাদাপি।

জগা ॥ তোরা শালা ভেড়ুয়া ছিলি। বাবা বলেছিল, জানোয়ার তাড়াতি জানোয়ার হওয়া লাগে।

গোপাল ॥ হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। জানোয়ার তাড়াতি জানোয়ার হওয়া লাগে। জানোয়ার হতি পারলে জানোয়ারের সঙ্গে লড়া যায়।

জগা ॥ হ্যাঁ। জানোয়ার তাড়াতি জানোয়ার হওয়া লাগে। (মুখটা হাঁ করে গোপালের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে) হাঁ—আ—হাঁ—আ।

গোপাল ॥ (একইভাবে) আমো জানোয়ার। হাঁ—আ!

জগা ॥ (হেসে উঠে) এই গোপাল, তুই খাঁটি হাবাগোবা। তোর মধ্যি ভেজাল নেই। আমার শালা বাবা হাবাগোবা ছিল, মা ভাল ছিল। আমার মা সাক্ষাৎ দেবী ছিল। একদিনের জ্বরে মরে গেল। স্বর্গে গেল। (জোড়হাত করে ওপরের দিকে তাকায় এবং পরমুহূর্তে চিৎকার করে বলে) কিন্তু তুই শালা ষোলআনা—মানে তোর বাবা মা দুজনেই হাবাগোবা ছিল।

গোপাল ॥ আবার? এবার তোর মাথা ফাটিয়ে দেবো শালা।

জগা ॥ তোর বাবাও পারবে নারে শালা। জানিস আমি কার বাড়িতে চাকরি করি! আমার কর্তার ছেলে নকশাল ছিল বলে নিজের ছেলেকে গুলি করেছে? (বুক ঠুকে) আর আমি তার বাড়ির চাকর। ইচ্ছে করলে তোর ইয়েতে রুল ঢুকিয়ে দিতে পারি। জানিস, আমি কে? (হঠাৎ একদল যুবক ঢুকে ওদের পিঠে হাত দিয়ে বলে)

সমর ॥ দাদা, আপনারা একটু ওদিকে যান।

জগা ॥ কেন? এটা কা-র বাপের জমি? সরবো কে—ন?

সমর ॥ আমরা এখানে একটা নাটক করব।

জগা ॥ অ্যাই বাপ্। ওরে গোপাল, দেখছিস এই শালারাও মাল খেয়েছে।

গোপাল ॥ কি হয়েছে?

জগা ॥ দেখছিস ইস্টেজ নেই, রাত হয়নি, লাইট নেই। বলে কিনা নাটক করব। নেঘ্‌ঘাৎ ব্যাটারা মাল খেয়েছে।

সমর ॥ না দাদা, আমরা মালটাল খাইনি। আমরা এখানে একটা নাটক করব। আপনারা দয়া করে সরুন।

জগা ॥ ধ্যেৎ। মাল খায়নি! মাল না খেলে এরকম নেশা ধরে? আর নেশা না ধরলে মাঠে কেউ নাটক করে?

সমর ॥ হ্যাঁ দাদা, ঠিক ধরেছেন। আমাদের নেশা ধরেছে। তবে সেটা মদের নেশা নয়। নাটকের নেশা। জনগণের স্বার্থে নাটক করার নেশা।

জগা ॥ (চিৎকার করে) এ্যাই গোপাল! এরা আমার কথা মেনে নিয়েছে রে। এদের নেশা ধরেছে। তুইও এবার মেনে নে।

গোপাল ॥ নেবো। বেশ, আমি একটা হাবাগোবা। এই জগা, এদের নেশাটা কেমন দেখি না।

জগা ॥ বেশ দেখ।

গোপাল ॥ তুইও দেখ।

জগা ॥ না, তুই দেখ।

গোপাল ॥ না তুই—(বলে জগাকে বসাতে গিয়ে নিজেও ধপাস্ করে বসে পড়ে। মঞ্চের মাঝখানে সমর দাঁড়িয়ে বলে)।

সমর ॥ বন্ধুগণ, আপনারা জানেন, আমরা এখানে যে নাটক করি তা ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থে নয়, জনগণের স্বার্থে। আমরা মনে করি, নাটক জনগণেরই শিল্প। পৃথিবীর যে কোন শিল্প যেমন জনগণের স্বার্থেই হওয়া উচিত তেমনি নাট্যশিল্পও জনগণের জন্যই নিবেদিত। আপনারা আমাদের নাটক দেখুন। আপনারা আমাদের নাটকের বিচার করুন। আপনারা আমাদের সমালোচনা করুন, আমাদের সংশোধন করুন। আমাদের আজকের নাটকের নাম 'প্রতিরোধ'। বন্ধুগণ, যে চাষীর গতর খাটানো ফসল আমরা সারা বছর খাই তার ঘরে বৃষ্টির জল ভরে যায়। তার ঘর ছাওয়ার খড় সে পায় না। (আলো নিভে জলে ওঠে)

সরকার ॥ এই তো, এই তো সব খড় পড়ে রয়েছে। আবার কায়দা করে আড়ালে রাখা হয়েছে।

কেশব ॥ এজ্ঞে এটুকু খড় দে আপনার কিসসু হবে না বাবু। এটুকুন দে ঘরটা ছাউলি পোয়াতি বউটা পেরাণে বাঁচবে।

সরকার ॥ হুঁ, ব্যাটার শখ কত। নিজের পেট চালানোর মুরোদ নেই আবার বে করে। শালা ক্ষেতটারে একেবারে ন্যাংটো করে ছাড়লো। তোর সাহস তো কম নয়! তুই ব্যাটা আমাদের ক্ষেতের খড় চুরি করিস। এ্যাঁ। জলে বাস করি কুমীরের গায়ে খোঁচা মারিস!

কেশব ॥ সরকার বাবু, ক্ষমা করেন সরকারবাবু। এবারকার মত মাপ করেন…সরকারবাবু, এগুলো নেবেন না। আপনার পায়ে ধরতেছি,

এ খড়গুলা ছেড়ে দেন। যা দাম হয় খেটে শোধ করে দেব। ভবল শোধ করে দেব। জান ছেড়ে। জান বাবু, টান দেবেন না। (সরকার খড় ধরে নিয়ে যাওয়ার অভিনয় করে) বাবু, বাবু মায়ের নামে কিরা কাড়তেছি। ওগুলো নেবেন না হুজুর।

সরকার॥ (চিৎকার করে) চোপ্, হারামজাদা। শুয়োরের বাচ্চা। ফের কথা বলবি তো পুলিশে দেব। (লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে) গাঁ ছাড়া করে দেব। তোরে কেটে গাঙে ভাসিয়ে দেব। তোরে আমি— তোরে আমি—(কেশব ঝট করে তার পা জড়িয়ে ধরে। ছাড় শালা! ছাড়! (লাথি মেরে খড় নিয়ে চলে যায়)।

সময়॥ (কিছুক্ষণ অন্ধকারের পর আলো জ্বলে) কয়েকজন চাষীর সঙ্গে ধানকাটার ব্যাপার নিয়ে জমিদারের সরকার দরকষাকষি করছে।

সরকার॥ অত কথা শোনার আমার সময় নেই। ফসল তুলতে হবে লোকের দরকার, তোরা রাজী? কিরে তোরা রাজী?

১ম চাষী॥ প্রায় আধা-রোজ বলতেছেন যে!

সরকার। আধা-পুরা বুঝি না। যে দরে আমার মজুর মুনিষ মিলতেছে সে দর দিয়েছি। মন চায়, করো, নাতো ছেড়ে দাও।

১ম চাষী॥ কি? কি করব?

২য় চাষী॥ মানুষ প্যাটের টানে ধুকতেছে। পাঁচ পয়সার কাম পায় তো এক পয়সায় করে। তার জন্ত স্তায্য মজুরিটা আধা হয়ে যাবে? এটা বিচার হলো।

১ম চাষী॥ চিরকাল যা হয়ে এসেছে—এখন যদি একথা বলেন তো—

সরকার॥ চিরকাল যা ছেল এখন তা নেই।

৩য় চাষী॥ কি হেরফের হয়েছে? ফলন কম হয়েছে?

সরকার॥ কিন্তু কাজের লোক ডুনা হয়েছে।

৩য় চাষী॥ বাইরে থেকে লোক আনা করাবেন, ডুনা হবেনা।

১ম চাষী॥ বন্তা হয়েছে সেখানে, ফলন মন্দা—সে আমাদের দোষ।

৩য় চাষী॥ তারা প্যাটে মরছে অমনি ধাক্কা বুঝে আধা রোজে টেনে

আনলেন। আবার ওদের হাতে পেয়ে আমাদের মারছেন! গ্যাঁড়াকল তাল পেতেছেন কর্তা।

সরকার॥ এ্যাঁ—চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ঝাড়ছে! বাইরে থেকে যখন মুনিষ আনা করাবো, সব তো উপোসে মরবি।

১ম চাষী॥ আমরা নিজ হাতে কাম করেছি। জমিতে যা কাজকম্ম আমরাই করেছি। ফসল তোলার সময় বাইরের লোক!

সরকার॥ ভালো কথা। আনা করাবো না বাইরের লোক—তালে এবার তোরা কামে লেগে যা।

৩য় চাষী॥ এভাবে প্যাটে মারলি, সরকারবাবু?

২য় চাষী॥ প্যাটে তো চিরকাল মারতেছেন।

১ম চাষী॥ খেটে মরতেছি আমরা, প্যাটে মারতেছেন আপনারা।

সরকার॥ মারতেছি? তবে মর। (চলে যায়)

১ম চাষী॥ তাহলে কি করা লাগে? কি? বল? কামে যাবে?

২য় চাষী॥ বুধন রে কি করা এখন?

৩য় চাষী॥ যেতি মন চায় যাও। একবার আধা মজুরী মেনে নিলে আর পুরা হবে না কোনকালে—একথা জানা নাই?

২য় চাষী॥ এমন কাম আমি করি না। না! না!

সময়॥ চাষীদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে জমিদাররা একদিন তাদের জমি থেকে উৎখাত করেছে। ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত করেছে। আর এখন চায় অর্ধেক মজুরিতে খাটাতে। কিন্তু চাষীরা আজ আর এতবড় অন্যায় মেনে নিতে রাজী নয়। যদিও তাদের হাঁড়িতে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। (সরে যায়)

গোপাল॥ (এককোণে বসে থেকেই বলে) এই জগা, ওঠ। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। যেতে হবে না?

জগা॥ তুই থাম্‌ দেখি। এ যে সাক্ষাৎ আমাদের গেরামের কথা বলতেছে রে। কোলকাতার ছোঁড়াগুলো চাষীর পাট ভাল করছে তো। (এমন সময় টলতে টলতে ২য় চাষী ঢোকে)

২য় চাষী॥ (কুকুর তাড়াবার ঢং করে) ভাগ্‌ ভাগ্‌ এখান থেকে। খেউ

ঘেউ করার ক্ষমতা নেই, এঁটো খেতে এয়েছে, এঁটো। যা না জমিদারের বাড়ি যা না। ওদের হেঁসেলে ঢোক। মহাজনদের বাড়ির রান্নাঘরের পাল্লাটা ঠেলতে পারিস না। রাখাল মুদির দোকানে ঢোক না। যা, ঢোক। এখানে কেন?.. ...সব নিঝুম মেরে গেছে। এ্যাই কেশব...... রাত কত হল? সব ঘুমিয়ে পড়েছে। এ্যাই কেশব। ঘরে আলো জ্বলেনি। (আবার কুকুর তাড়াবার ঢং করে) অ্যাইজ শাল তোরে আমি নাগালে পেলি···তোরে আমি শেষ করি ফেলব।······এক আধদিন হাঁড়ি চড়েছে কি অমনি হারামজাদার ছোঁকছোঁকানি দেখ!......আলো জ্বলেনি কেন? এ্যাই কেশব—

কেশব॥ কি?

২য় চাষী॥ বলি কানে ঢুকিয়েছিস কি? শুনতে পাচ্ছিস না, ডাকছি। কালা না বোবা? ···তেল নেই?

কেশব॥ না।

২য় চাষী॥ হাঁড়ি চড়েনি?

কেশব॥ না।

২য় চাষী॥ বউমা নেই?

কেশব॥ না।

২য় চাষী॥ না?

কেশব॥ না।

২য় চাষী॥ শালা হল কি আজকে তোর? না—না—না—না ছাড়া কথা নেই।

কেশব॥ না, নেই।

২য় চাষী॥ নিজের বউ কোথায় আছে, জানিস না?

কেশব॥ জানব না কেন? ঘরের কোণে পড়ি পেটের যন্ত্রনায় ছটফট করছে।

২য় চাষী॥ কি হয়েছে? ···কিরে বলবি তো? কি হয়েছে?

কেশব॥ আমি কি বলব? কত জনকে বলব?···এক এক করি গাঁয়ের লোক আসে আর বলতি হয়। এ তোমারে বলি রাখলাম, আমি এসব ঝুটঝামেলা সামাল দিতে পারব না।

২য় চাষী ॥ কিসের ঝুটঝামেলা ?

কেশব ॥ বলেছিলম বিয়া আমি করব না। বউরে খাওয়াতি পারব না। তখন তো শখ হইছিল আমারি বিয়া দিতে। এখন সামাল দাও।

২য় চাষী ॥ অত দেমাক দেখাবি না—দেমাক আমি সহ্য করতি পারি না।

কেশব ॥ তুমি তো কিছুই সহ্য করতি পার না। অত যখন সহ্য করতি পার না, মাকে না খাইয়ে মারলে কেন ?

২য় চাষী ॥ (চিৎকার করে) কেশব ! তোর মা গব্‌ভযন্ত্রণায় মরলি আমি কি করব। দুদিন খাওয়াচ্ছে বলে দেমাক দেখানো। তোরে যে এতবড় করলাম তার বেলা। তোর বউ কাতরাচ্ছে তো আমি কি করব। (কিছুক্ষণ পরে) বুঝলি কেশব, তোর মাও ঠিক এমনি করেই চিল্লাত। আর আমি উঠোনে বসি বসি তার চিল্লানি শুনতাম। এর তো একটা হচ্ছে। তোর মার একটা নয়, দুটা নয়, সাত সাতটা দলা দলা মাংসের পুঁটলি হয়েছিল। কোনটা মরে বেরুত, কোনটা বেঁচে। কিছুদিন পরে যম আসত। পেরাণটাকে টেনে বার করি নিয়ে যেত। পুঁটলিটা আর নড়ত না। অসাড় পুঁটলিটাকে হাতে করে নিয়ে যেতাম শ্মশানে। ছ ছটা পুঁটলি শ্মশানে নিয়ে গেছি। তুই হলি সাত নম্বর পুঁটলি। তোরে এতবড় করলাম। দুদিন খাওয়াচ্ছিস তাই এত দেমাক। তোর দেমাকের মাথায় লাথি মারি। তোর বউ কাতরাচ্ছে তো আমি কি করব ?

কেশব ॥ (চিৎকার করে) আমি কি করব ? কথাটা গলা ফাটিয়ে বলতে লজ্জা করে না ? পোয়াতী বউ কাঠ কুড়িয়ে, লোকের বাড়ি কাজ করে, চাল কিনে রাঁধে আর তুমি বসে বসে গেলো। লজ্জাও করে না ? আবার বুক চিতিয়ে কথা বল ?

২য় চাষী ॥ (চিৎকার করে) লজ্জা আমার করবে না, তোর করবে রে শুয়োরের বাচ্চা ! আমার খাওয়াটাই তো দেখিস। তোর বউটা যে গো-পেরাসে গেলে সেটা দেখতে পাস না ? যত চোখ এই বুড়া লোকটার উপর। একেবারে হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে দে রাক্ষসীর মত খায়। তখন কি তোর চোখে ইয়ে ঢুকে থাকে ? তোর বউ খেতি পারে আর তোর

বাপ খেতি পারে না? বাপরে খেতে না দে বউরে খেতে দ্যাস, তোর লজ্জা করে না?

কেশব॥ তার খেতি হয়। পোয়াতী মেয়েমানুষের খাওয়া লাগে।

২য় চাষী॥ (মুখ ভেংচে) ও—ও তার খাওয়া লাগে! দুদিন আগে যে বউ হয়েছে তার খাওয়া লাগে! আর আমি বুড়া বাপ, আমার খাওয়া লাগে না? বেজম্মার পুত কোথাকার!

কেশব॥ (চিৎকার করে) হ্যাঁ—হ্যাঁ, তার খাওয়া লাগে। তার নিজের জন্তি না। পেটের ভেতরে যেটা আছে সেটার জন্তি খাওয়া লাগে।

২য় চাষী॥ ঈস্, মরে যাই। শালার দুঃখু দেখ। পেটেরটার জন্তি দুঃখু হচ্ছে। পেটেরটারে বাঁচাতি হবে! বাপের বাঁচাতি হবে না।

কেশব॥ হ্যাঁ, পেটেরটারে বাঁচাতি হবে। এই তুমি মারে খেতে দাওনি। সেইজন্য ছয় ছয়টা মাংসের পুঁটলি শ্মশানে নিয়ে গেছ। লজ্জা করে না, আবার আমারে বল? আমি হলাম বেজম্মার পুত? আমি যদি বেজম্মার পুত হই তো তুমি কি?

২য় চাষী॥ (ধমকে) এ্যাই চুপ কর! তোরা হলি হাবাতের জাত। এই তুই, তোর মা সব হাবাতের জাত। এক একটা রাক্ষস্। কেন? তুই এতবড় জোয়ান মরদ, তোর ভাগেরটা তোর বউকে গেলা। আমার পেটে টান মারিস কেন?

কেশব॥ জ্বালাটারে ভরতি হলে খাটতি হয়!

২য় চাষী॥ তো যা খাট। তোকে খাটতি কে বারণ করে?

কেশব॥ তুমি-ই তো বারণ কর। বাচ্চা বয়স থেকে তোমার মুখে শুনে আসছি হাবাগোবায় খেটে মরে, চালাকচতুরে খায়।

২য় চাষী॥ খায় তো! না খেলি তোর ঠাকুরদার জমি গেল কোথায়! তোর বাপের ঘরবাড়ি নাই কেন? তোর বউ লোকের বাড়ি কাম করতি যায় কেন? আমি আবার বলব। একশোবার বলব। হাজারবার বলব। হাবাগোবায় খেটে মরে, চালাকচতুরে খায়।

কেশব॥ আর খেটে মরবে না। সে আর নাই।

২য় চাষী ॥ কোথায় গেছে?

কেশব ॥ জানি না।

২য় চাষী ॥ তোর বউ কোথায় গেছে তুই জানিস না? (আলো কমে যায়)

সমর ॥ (মঞ্চের সামনে এসে) না কেশব জানে না, কেশবের গর্ভবতী বউ খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে—না আত্মহত্যা করেনি—রাতদিন খেটেছে, পেটেরটাকে বাঁচাতে। কিন্তু পেটেরটা যখন কোলে আসার জন্যে ছটফট করছিল তখনই চাষী বউ মারা গেছে। চাষী বউদের এভাবে মরতে হয়। সব গাঁয়ে পঞ্চায়েত আছে কিন্তু হাসপাতাল নেই। (জগা ও গোপাল নড়েচড়ে বসে হাঁ করে তাকিয়ে অভিনয় দেখে আলো নিভে কিছুক্ষণ পরে জ্বলে ওঠে)

২য় চাষী ॥ (কেশবের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে) কেশব। ওঠ। বাসি মড়া ফেলে রাখতি নেই। একটা সদ্গতি করা লাগে। কাঠ লাগে, কাপড় লাগে, ঘাটখরচা লাগে। বেঁচে থাকতে যার কিছু জুটল না মরে গেলে দেখ তারি পোড়াতে কত পয়সা পেয়েছি। এই দেখ। (একমুঠো পয়সা দেখায়) সংসার বড় বিচিত্র ঠাঁইরে। ওরে কেশব, যতক্ষণ বেঁচে আছি কেউ কিছু দেবে না। মরে গেলে দয়া জাগে! কেশব! চেপে ধর! আমার হাতদুটো চেপে ধর! ...ধরেছিস? কেমন সুখ হচ্ছেরে কেশব? রোজ যদি এমন মুঠো ভর্তি পয়সা নড়েচড়ে! আশ্চর্য জিনিস—এর কাছে যা চাইবি তাই পাবি। আমার হাতদুটো ভাল করে চেপে ধর! বল—ছু মন্তর (চিৎকার করে)—আমায় দু ... চাল এনে দাও...আমার নেঙটিখানা পাল্টে দাও...আমার ... ঘরখানা মেরামত করে দাও...এই মড়া বউটার ধড়ে জেবন এনে দাও...

[হঠাৎ পুলিশ অফিসার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুলিশ এসে সমর, ২য় চাষী ও কেশবকে মারতে থাকে। সমরের চুল ধরে তার মাথাটাকে মাটিতে ঠুকতে থাকে। জগা ও গোপাল পা টিপে টিপে সরে দাঁড়ায়]

চক্রবর্তী ॥ তোমার নাম সমর দত্ত? সমর? তোমার সমরগিরি দেখাচ্ছি।

[সমরের মাথা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে] কি? এবার বল, যেখানে অত্যাচার সেখানে প্রতিরোধ! (চুলের মুঠি ধরে সমরকে দাঁড় করিয়ে) ক্লাবে তুমি বলেছিলে না, সত্তরের দশক মুক্তির দশক? বলেছিলে না, নাট্যসংস্থাকে হতে হবে গেরিলা স্কোয়াড। হুঁ? গেরিলা স্কোয়াড? (প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মেরে) কিরে, বলেছিলি না, তা না হলে সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না। বান্‌চোত্ সংস্কৃতি মারাচ্ছো? শালা শুয়োরের বাচ্চা, লম্বা লম্বা কথা (কষে এক লাথি মারে সমরের পেটে। সমর নিচে পড়ে যায়)। কইরে তোদের সেই নল কোথায়? বন্দুকের নল? (পা দিয়ে বুক মাড়াতে মাড়াতে) বলেছিলি না, বন্দুকের নল থেকেই ক্ষমতা বেরিয়ে আসে। বলেছিলি না, যেখানে অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ? আই চ্যালেঞ্জ ইয়োর প্রতিরোধ! (চুলের মুঠি ধরে সমরকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হাসতে থাকে)

সমর ॥ আর একবার রক্ত দিয়ে শিখলাম—বন্দুকের নল থেকেই ক্ষমতা বেরিয়ে আসে। নাটকের দলকে হতে হবে সংস্কৃতি রক্ষার বাহিনী। এই বাহিনীকে হতে হবে প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন। আমাদের সংস্কৃতি জিন্দাবাদ। বুর্জোয়াদের সংস্কৃতি মুর্দাবাদ। (আস্তে আস্তে মঞ্চে আলো কমে যায়। পরক্ষণেই আলো জ্বলে ওঠে। আগের মত ভদ্রলোক ও জগা মুখোমুখি বসে থাকে। চোখ মোছে জগা। ভদ্রলোক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে)

জগা ॥ ছেলেটার কচি বয়স এজ্ঞে। বাবুর জন্যি রাত জাগি। মাঝি মাঝি মনে হয় যেন্ ছেলেটা এই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমারে কি যেন্— (দ্রুত চক্রবর্তী ঘরে ঢুকতেই জগা থেমে যায়। চক্রবর্তী টুলের উপর উঠে যে দিকে ইন্দিরার ছবি ছিল সেই দিকটা দর্শকদের দিকে রেখে টুল থেকে নেমে ছবিটা দেখে জিভ কামড়ে আবার টুলে উঠে ইন্দিরার ছবি দেওয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রাখার সময় বাইরে থেকে শ্লোগান ভেসে আসে : "বিশ্ববন্ধু বসাক, জিন্দাবাদ, ইন্‌ক্লাব—জিন্দাবাদ"। চক্রবর্তী রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে থাকে। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে)

নাট্যকারের ঠিকানা : ৫৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯

যে হাওয়া বয়ে গেছে

পাঁচু স্বর্ণকার

চরিত্র

রাম

বড় দারোগা

ছোট দারোগা

বিশু

শশী

কাশী

মধু

●

[পর্দা উঠলে দেখা যাবে আলো-আঁধারীর মাঝে জঙ্গলের ভিতর অল্প পরিষ্কার স্থান। সময়— রাত্রি। চারজন বন্দুকধারী পুলিশের মাঝে হ্যাণ্ডকাপ বাঁধা এক যুবক। নাম রাম। ছোট দারোগা এদের আগে এবং বড় দারোগা এদের পিছনে। উভয়ের হাতে রিভলবার। দর্শকদের মাঝখান দিয়ে সবাই এসে মঞ্চে দাঁড়াবে]

ব: দা: ॥ (মঞ্চের নিচে থেকে) মিত্তির, এখানেই—এই উপযুক্ত স্থান।

ছো: দা: ॥ কিন্তু স্যার, এস. পি. সাহেব যে বলেছিলেন জঙ্গলটা পেরিয়ে গিয়ে কাজ করতে।

ব: দা: ॥ (মঞ্চে উঠতে উঠতে) না। তুমি দেখছি মিছেই আমার সহকারী। ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই। এস. পি. সাহেবের কথা কে অমান্য করছে? কাজটা আমরা এখানেই করবো। তারপর লাসটা টেনে নিয়ে জঙ্গলের ওধারে ফেলে আসবো।

ছোঃ দাঃ॥ তাতে একটু অসুবিধা হবে স্যার। রক্তের দাগ দেখে লোকে ধরে ফেলবে, এখানে মেরে লাস ওখানে ফেলা হয়েছে!

বঃ দাঃ॥ ভুলে যাচ্ছো আমরা লোকের চাকর নই—সরকারের চাকর।

ছোঃ দাঃ॥ তা জানি স্যার। তবে এস. পি. সাহেব বললেন তো, এ ছেলেটা বয়সে ছোট হলে কি হবে, একেবারে কাঁকড়া বিছে। নিচের তলার লোকের কাছে নাকি দেবোতা। খুব সাবধানে নিয়ে যাবে এবং কাজ করে আমায় খবর দেবে।

বঃ দাঃ॥ সে কথা তো আমিও শুনেছি। সব কাজ কি ওপরওলার কথামত করা যায়? পরিস্থিতি অনুযায়ী করতে হয়। আমি বুঝতে পারছি না, কেন তুমি আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছ!

ছোঃ দাঃ॥ ভুল বুঝবেন না স্যার। যাতে আপনার পদোন্নতি হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেই এত কথা বলছি। আসার সময় দেখলেন তো স্যার, রাস্তার দুধারে জায়গায় জায়গায় ভীড়। আমাদের জীপে ওকে দেখতে পেয়েই চিৎকার উঠেছিল—"রামবাবু জিন্দাবাদ।" তাই বলছিলাম এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে কেউ কোন কথা বলার সুযোগ পায়।

বঃ দাঃ॥ তা ঠিক। জীপ্‌টা যদি না বেগ্‌ড়াত তাহলে তো স্যারের কথামতই কাজ হতো।

ছোঃ দাঃ॥ আমি বলি কি, আর কিছুটা এগোলেই জঙ্গলটা শেষ হবে। আমাদের এখানে না দাঁড়িয়ে এগোনই ভাল স্যার।

বঃ দাঃ॥ তুমি একটা আস্ত মূর্খ। তুমি জান না, ওদের দলের লোকেদের গা ঢাকা দিয়ে থাকার স্থান—এই ধরণের জঙ্গল। আমরা এগোবো আর সেই সুযোগে যদি ওদের লোক এসে জীপে আগুন ধরিয়ে দেয় তাহলে স্যারকে কি কৈফিয়ত দেব বলতে পার?......তুমি আমার পদোন্নতি চাও বললে না! এখানেই তো তার প্রমাণ দিয়ে দিলে।

ছোঃ দাঃ॥ আমি অতটা তলিয়ে ভাবিনি স্যার।

বঃ দাঃ॥ ঐ জন্যই তো তুমি ছোটবাবু আর আমি বড়বাবু। যাক্, তুমি এদের নিয়ে এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি দেখি যদি গাড়ীটাকে

চালু করতে পারি। খুব সাবধানে থাকবে। এমন কি পাতানড়ার আওয়াজ পেলেই গুলি চালাবে। খুব সাবধান, শালা যেন না ভাগে ॥

রাম॥ শালাই বলুন আর বোনাই-ই বলুন স্তার, আপনার কোন ভয় নেই। আমি পালাব না।

বঃ দাঃ॥ চোপ্, শুয়োরের বাচ্ছা, তোমায় কে কথা বলতে বলেছে? আমি কিছু বুঝিনা ভেবেছো? মরতে কোন্ শালা চায় রে?

রাম॥ শালারা চায় না সত্যি, কিন্তু বোনাইরা চায়। জন্মেছি যখন একদিন মরতেই হবে। তবে কেন মরতে ভয় করবো? হাসিমুখে তাকে গ্রহণ করবো।

বঃ দাঃ॥ খুব যে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছিস। বলি, পেটে কি কিছু আছে, না সবই শেখানো ছাড়ছিস্?

রাম॥ তা আছে। আপনাদের পুঁজিবাদী সরকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া একটা বি. এ. ডিগ্রীর সার্টিফিকেট আছে।

বঃ দাঃ॥ ওহ্ তবে তো বেশ কিছু আছে। (মিত্রের কাছে গিয়ে চাপাস্বরে) মিত্তির, খুব সাবধান। ওকে একটাও কথা বলতে দিওনা। তাহলে ঐ শালা আমাদের পুলিশ বাহিনীকে বশ করে ফেলতে পারে।

ছোঃ দাঃ॥ আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন স্তার। ও তো ছেলেমানুষ, তাও আবার একা, ও আমাদের কি করবে?

বঃ দাঃ॥ ভুল মিত্তির, সম্পূর্ণ ভুল। শত্রুকে কখনও একা বা ছোট বলে ভাববে না। আমাদের যারা শত্রু হয় তাদের বয়স আমরা দেখিনা। মিত্তির, শত্রুকে সবসময় শত্রু হিসাবে দেখবে।

ছোঃ দাঃ॥ বুঝেছি স্তার, আপনার কথামতই কাজ হবে।

বঃ দাঃ॥ হাঁ, তাই করবে! পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে ওকে রাখবে। আর তুমি চারদিকে কড়া নজর রাখবে। আমি চল্লাম। [প্রস্থান

ছোঃ দাঃ॥ ২৪ নম্বর মধু এবং ১৬ নম্বর কালী, তোমরা ওর পিছনে, আর ২১ নম্বর শশী ও ১৮ নম্বর বিশু তোমরা ওর সামনে। যে ভাবে এসেছো ঠিক সেইভাবে ওকে পাহারা দাও। আমি ঘুরে ঘুরে সমস্ত লক্ষ্য রাখছি।

(সকলে তাই করল)

রাম ॥ আপনিও বড়বাবুর মত ভয় খাচ্ছেন স্যার? আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?

ছোঃ দাঃ ॥ বিশ্বাস আমি করেছি।

রাম ॥ তবে এত ঘুরছেন কেন?

ছোঃ দাঃ ॥ আমি আমার ডিউটি দিচ্ছি।

রাম ॥ সামান্য কটা টাকার বিনিময়ে শাসক গোষ্ঠির কাছে নিজেকে একেবারে বিকিয়ে দিয়েছেন, স্যার!

ছোঃ দাঃ ॥ রামবাবু, আপনি বয়সে ছোট হলেও আপনাকে আমি ভক্তি করি। আপনার শিক্ষার জন্য, জনগণের ভালবাসার জন্য। দয়া করে আমার মন থেকে সেটা নষ্ট করে দেবেন না।

রাম ॥ আমায় ক্ষমা কোরবেন। আমি মানুষ চিনতে ভুল করেছি, স্যার। ...একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

ছোঃ দাঃ ॥ একটা কেন, হাজারটা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

রাম ॥ আপনারা বড়বাবুকে খুব ভয় খান, না?

ছোঃ দাঃ ॥ চাকরি করবো অথচ উপরওয়ালাকে মানবো না, সে তো হয় না। যাক্, কি বলতে চান চটপট্ বলে শেষ করুন। কথা বলা আপনার বারণ, সেটা ভুলবেন না।

রাম ॥ না, ভুলিনি। শুধু জানতে চাইছিলাম, পুলিশরা কি সবাই গরিব?

ছোঃ দাঃ ॥ কেন! এ কথা কেন?

রাম ॥ এই তো এদের চেহারা। যেন কতদিন খায়নি। চোখগুলো কে যেন ভেতর থেকে টানছে। মনে হচ্ছে যেন কত কাল এরা ঘুমায়নি।

ছোঃ দাঃ ॥ ঘুম এদের হয় না ভাবনা-চিন্তায়।

রাম ॥ তা-হলে আমাদের অপরাধটা কোথায়? আমরা তো এদের মুখে হাসি ফোটাতেই চেয়েছি।

ছোঃ দাঃ ॥ সেটা উপরওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমায় নয়।

রাম ॥ বেশ, তাই করবো। বড়বাবু আসুক।

শশী ॥ বিশুদা, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো?

বিশু ॥ কি ?

শশী ॥ ছেলেটার চাউনি যেন বর্শার ফলা।

মধু ॥ ছেলেটার চোখে ঝক্‌ঝকে তারা আছে।

বিশু ॥ হাঁ, অবিকল আমার ছেলের মত।

কালী ॥ এই বয়সে ও মলে কি করে ?

ছোঃ দাঃ ॥ সেটা বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলতে পারবে।

কালী ॥ ওরে বাবা ! যার মুখে মিছরি অন্তরে ছুরি, তাকে জিজ্ঞাসা করতে বলছেন ! তার চেয়ে আপনার হাতের রিভলবারটা দিয়ে বুকটা ঝাঁজরা করে দিন। ঐ শয়তানের হাতে মরার চেয়ে আপনার হাতে মরা ভাল।

ছোঃ দাঃ ॥ কেন, আমার হাতে মলে কি স্বর্গে যাবে ?

কালী ॥ তা জানি না। তবে শান্তিতে মরবো এটা বলতে পারি।

মধু ॥ তুই কি স্যারকে গ্যাস্ দিচ্ছিস ?

শশী ॥ ছোটবাবুকে গ্যাস্ দিয়ে কোন লাভ হবে না রে। উনি বড়বাবুর মত গ্যাস্ খান না।

কালী ॥ তুই বোধ হয় চেষ্টা করে দেখেছিস।

ছোঃ দাঃ ॥ কি হচ্ছে তোমাদের ! ডিউটি দিতে এসেছ না আড্ডা দিতে ?

বিশু ॥ ডিউটিতে তো আমরা অবহেলা করিনি স্যার।

রাম ॥ না স্যার। ডিউটিতে ওদের অবহেলা নেই। দেখুন না, বন্দুকের নলগুলো ঠিক আমাকে তাক্ করে আছে।

ছোঃ দাঃ ॥ (মিষ্টি ধমক) এই রামবাবু ! কি হচ্ছে ?

রাম ॥ ধমকাবেন না স্যার। চুপচাপ একদম ভাল লাগছে না। একটু পরে যাকে বন্দুকের গুলিতে মরতে হবে, তার সঙ্গে কি একটুও প্রাণখুলে কথা কইবেন না ! আপনাদের সুখ-দুঃখের কথা, আপনাদের ভাল মন্দের কথা ? [বড় দারোগার প্রবেশ]

বঃ দাঃ ॥ এই কেউটের বাচ্চা। কি বলছিস রে ?

রাম ॥ এমন কিছু নয়, স্যার। বলছিলাম—

ছোঃ দাঃ ॥ গাড়ীটা ঠিক হয়েছে স্যার ?

বঃ দাঃ ॥ না-মিস্তির। ড্রাইভার গাড়ীটার দোষ এখনও ধরতে পারেনি। ভাবছি আর একবার চেষ্টা করে দেখবো।

ছোঃ দাঃ ॥ তা হলে একটু তাড়াতাড়ি করুন স্যার। রাত বেড়ে যাচ্ছে, শেষে কি রাতভোর এই জঙ্গলে কাটাতে হবে!

বঃ দাঃ ॥ ওঃ-হো-হো-হো। আমি একেবারে ভুলে গেছলাম। তোমার ঘরে নতুন জোয়ান বৌটা একা আছে, তার জন্ম তোমার মন কেমন করছে। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তোমরা খুব সাবধানে থেকো, ওর কমুনিষ্ট বন্ধুরা এসে যেন ওকে ছিনিয়ে নিয়ে না যায়।

রাম ॥ কোন্ কমুনিষ্ট স্যার?

বঃ দাঃ ॥ কমুনিষ্টয়ের আবার রকম ফের আছে নাকি?

রাম ॥ আছে বৈ কি স্যার। সাদা কমুনিষ্ট আর কালো কমুনিষ্ট। সাদারা বলে, শাসক-শোষকদের সঙ্গে থেকে ওদের মন বদলাতে হবে। এবং এইভাবেই ওরা হয় শেষ পর্যন্ত শাসকদেরই বিপদের বন্ধু। আর কালোরা বলে, সাদারা ভুল করছে। অন্ধকারে যারা পড়ে আছে তারাই হল সাচ্চা মানুষ, গরিবের বন্ধু, শাসকদের ত্রাস। আমরা ওদের জন্য লড়বো—

বঃ দাঃ ॥ থাম্ শুয়োরের বাচ্ছা। সুযোগ পেলেই লেকচার। এই লেকচার দিস বলেই তো আজ তোরা দেশদ্রোহী।

রাম ॥ সে কি স্যার! আমার বয়স আঠারো! এই আঠারো বছর বয়সে আমি দেশদ্রোহী!!

বঃ দাঃ ॥ হ্যাঁ, তুমি দেশদ্রোহী।

রাম ॥ বলেন কি স্যার! আমি যে জমিতে জন্মেছি সেটা আমার জন্মভূমি নয়? সেখানে আমার কোন অধিকার নেই?

বঃ দাঃ ॥ না, নেই। তবে, এখনও আমি তোমার জন্ম শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি, যদি তুমি মুচলেখা লিখে দাও। আমার অন্যায় হয়েছে। আমি ভুল করেছি। আমাকে দয়া করে ক্ষমা করুন। জীবনে আর কখনও লোক খ্যাপাবো না,—সরকারের বিপক্ষে যাবো না—

রাম ॥ থাক, থাক স্যার। আমি বুঝে গেছি। শুধু এটাই বুঝলাম না, আমার উপর আপনার এত দয়া হলো কেন?

বঃ দাঃ ॥ কি বা তোমার বয়েস, কি বা তুমি দেখলে, কি বা তুমি জানলে—

রাম ॥ আমরা যা পড়ি সেগুলো বিজ্ঞানভিত্তিক। তাই, জানার জন্ত বয়সের প্রয়োজন হয় না। যদি কিছু শিখতে চান, জানতে চান, তাহলে আমাদের কাছেই তা শিখতে হবে। আপনাদের কাছে আমাদের শেখার কিছুই নেই।

বঃ দাঃ ॥ তাই নাকি ?

রাম ॥ হাঁ,—তাই। আপনারা এক একজন শাসকদের এক একটা বিবেক-হীন, মনুষ্যত্বহীন নাট-বল্টু। আর আমরা, আমরা হচ্ছি গরিবদের পক্ষে, খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের পক্ষে।

বঃ দাঃ ॥ ঐ মূর্খ অপগণ্ডগুলোর পক্ষ নিলেই কি তোমরা জিতবে ভেবেছো ?

রাম ॥ জিতব কি হারব ইতিহাস তার বিচার করবে। একটা প্রশ্ন করি ; আপনারা যা করছেন সব কি বিবেকের স্বীকৃতিতে করছেন ! যে শাসন-ব্যবস্থা রক্ষা করতে আপনারা জীবন দিচ্ছেন, আপনাদের সে কি কম ক্ষতি করছে ! এই শত্রু পক্ষের কাজ, দম দেওয়া কলের পুতুলের মত, আর কত দিন করবেন ? আপনারা কি এক বারও আপনাদের পরিবারের কথা, আপনাদের সন্তান-সন্ততিদের কথা—

বঃ দাঃ ॥ চোপ্—শুয়োরের বাচ্চা। আবার লেকচার ! আর একটা কথা বলেছিস তো কুকুরের মত গুলি করে মারবো।

রাম ॥ আর, কথা যদি না বলি স্যার তাহলে কি ছেড়ে দেবেন ?

ছোঃ দাঃ ॥ স্যার, কথার জালবুনে ও আপনাকে আটকে রাখছে। গাড়ী রিপিয়ার করানোর সুযোগ দিচ্ছে না, এ দিকে অযথা রাত বাড়ছে।

বঃ দাঃ ॥ ঠিকই বলেছো মিস্তির। রাত বাড়লে ক্ষতি হবে। তোমার জোয়ান বৌটা আবার একা আছে। এতক্ষণ তোমা বিহনে হয়তো হা-হুতাস করছে। তবে কি জান, এ কথা তুমি ভাবলেও আসলে তা হয়তো নাও হতে পারে। পরকিয়া বলে একটা কথা আছে, জানতো ! যাক ওসব কথা, তোমরা খুব সাবধানে থেকো। আমি চললাম। [প্রস্থান]

বিশু ॥ ছোটবাবু, বড়বাবুর ইংগিতটা কিন্তু ভাল না।

ছোঃ দাঃ ॥ উনি একটু ঠাট্টা করলেন।

বিশু ॥ চোখ-মুখের ভাবে তা তো মনে হোলো না।

ছোঃ দাঃ ॥ কি বলতে চাও তুমি ?

বিশু ॥ বলতে চাই, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।

ছোঃ দাঃ ॥ আমি তোমাদের ভালবাসি বলে কি তার প্রতিদান এভাবে দেবে ! আমার স্ত্রী সম্বন্ধে এ রকম একটা নোংরা উক্তি করবে !

বিশু। ভুল করবেন না, ছোটবাবু। আপনি ভালবাসেন বলেই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। প্রায় একমাস হলো আপনি এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। আপনি কতটুকু জানেন ঐ শয়তান সম্বন্ধে ? জানেন কি, ও আমার বৌকে ন্যাংটো করেছিল ?

ছোঃ দাঃ ॥ সে কি ! একটা মানুষের পক্ষে এও কি সম্ভব !

মধু ॥ সম্ভব ছোটবাবু, ওর পক্ষে সবই সম্ভব।

বিশু ॥ বলতে আমি চাইনি ছোটবাবু, হঠাৎ মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। আজ অবধি কাউকে বলিনি কেবল সুযোগ খুঁজেছি,—প্রতিশোধের সুযোগ।

ছোঃ দাঃ ॥ বেরিয়ে যখন গেছে তখন তাকে আর লুকিও না। ঘটনাটা বলো, আমার শোনা দরকার।

বিশু ॥ শুনুন তবে।...যে দিন থেকে আমি এখানে বদলি হয়ে এসেছি সেই দিন থেকেই নাইট ডিউটি করছি। একদিনও দিনে কাজ পাই নি। রোজই সকালে বাড়ী এসে বৌয়ের কাছে শুনতে হতো,—ওগো। তুমি দিনে কাজ নাও, আমার একদম ভাল লাগে না। ও ভাবতো, কাজ নেওয়াটা যেন আমার হাত।

শশী ॥ কেন, বড়বাবুকে বলে বদলি হতে তো পারতে।

বিশু ॥ বলেছিলামরে, বলেছিলাম। একদিন নয়, প্রায় প্রতি দিনই বলেছি। আর প্রতিবারই শুনেছি, হবে না। শেষ দিকে বলতে লাগল, নাইট ডিউটি করতে যদি না পার চাকরি ছেড়ে দাও।...মাঝেমাঝে মনে হত দি শালা চাকরিটা ছেড়ে। কিন্তু পারিনি ছেলেটার মুখ চেয়ে। ও তখন চার বছরের বাচ্ছা। চাকরি ছেড়ে দিলে কি করে ওকে মানুষ করবো। কোথা থেকে ওর মুখে দুধ যোগাবো, দুবেলা দুমুঠো ভাতের সংস্থান করবো।

কাশী ॥ ঠিকই বলেছ বিশুদা। পুলিশের চাকরি করি বলে আমাদের যেন সমাজ নেই, সংসার নেই। সুখ-দুঃখ কিছুই নেই। শালা যখনই ছুটি চাইতে গেছি, তখনই শুনতে হয়েছে, তোমার প্রয়োজনের চেয়ে সরকারের প্রয়োজন আগে। সরকারকে আগে বাঁচাও, তারপর তোমাকে সরকার দেখবে।

বিশু ॥ মাঝে মাঝে বৌটা অদ্ভুত ধরনের কথা বলতো। পুলিশের চাকরি রাক্ষস আর শয়তানের তৈরী। তুমি পুলিশের চাকরি ছেড়ে দাও। এর চেয়ে তোমার রিক্সা চালানো অনেক ভাল। রোজ রাত্রে ভয়ে ভয়ে বাচ্ছাটাকে বুকে জড়িয়ে আর রাত কাটাতে পারি না গো। তোমার পায়ে পড়ি তুমি একটা ব্যবস্থা করো।

মধু ॥ তখন বৌদির কথা শুনলে তোমার ভাল হতো বিশুদা।

বিশু ॥ হয় তো হতো। কিন্তু তখন যে আমার রিক্সা চালাতে মন কিছুতেই সায় দিত না। কেবল মনে হতো কত বড় বংশের ছেলে আমি। আমি রিক্সা চালাবো! এখন ভাবি, সে অনেক শান্তির কাজ ছিল। বিবেকের দংশনে জ্বলে-পুড়ে মরতে হতো না।...ঐ রামবাবুদের কথাই ঠিক, আমরা ছেলেপুলেদের কাছে একটা খুনী ছাড়া আর কিছু নই।

ছোঃ দাঃ ॥ ও কথা ভাবছ কেন! তোমরা উপরওয়ালার হুকুম তামিল করছো তার বিনিময়ে মজুরি নিচ্ছ।

বিশু ॥ মিলের শ্রমিকগুলো পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য মজুরির দাবিতে সভা করেছিল, কেন আমরা সেই নিরীহ নিরস্ত্র মানুষগুলোকে কুকুরের মত গুলি করে মারলাম?

রাম ॥ এর উত্তর তোমায় কে দেবে বিশুদা! ছোটবাবু পারবেন না, এমন-কি যে শোষকরা তোমাদের হাতে বন্দুক তুলে দিয়েছে, তারাও পারবে না।

কাশী ॥ ঠিকই বলেছেন রামবাবু। ছাত্র আন্দোলনের সময় নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্রদের শোভাযাত্রায় গুলি চালালাম। কি তাদের অপরাধ ছিল, আজ অবধি তা জানলাম না? অথচ বিশ্বাস করুন—সে দিন আমার মন কিছুতেই গুলি করতে চায়নি।

রাম ॥ কেন? শাসক ও শোষকদের দালাল কাগজগুলো তো কলাও করেছে, পুলিশের উপর ইঁট, পাথর ও বোমা ছোঁড়ায় বহু পুলিশ আহত হয়। তাই, পুলিশগুলি চালাতে বাধ্য হয়।

শশী ॥ ভুল-ভুল, সব ভুল। সব মিথ্যে। সব সাজানো।

বিশু। আসলে বন্দুকগুলো হাতে এলেই আমরা যেন পশু হয়ে যাই। জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলি।

রাম ॥ সে তো হবেই, ওগুলো যে শোষকদের দেওয়া।

ছোঃ দাঃ ॥ বিশুদা—।

বিশু ॥ আপনি আমাকে দাদা বল্লেন ছোটবাবু!

ছোঃ দাঃ ॥ বলবো না! আমার বিরাট উপকার করেছেন। আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন, বড়বাবুকে চিনিয়ে দিয়েছেন।

বিশু ॥ ওকে চিনতে এখনও অনেক বাকি, ছোটবাবু। এখনও তো আমি কিছুই বলিনি। তা হলে শুনুন, এক দিন রাত্রে ডিউটি দিতে সবে গেছি, এমন সময় মনে খটকা লাগলো। আসার সময় ছেলেটার জ্বর দেখে এলাম যদি জ্বরটা বাড়ে! বৌটা তো একা। তাহলে সে কি করবে! ছুটে বাড়ী চলে এলাম। দরজাটা বন্ধ ছিল। জানালা দিয়ে বৌকে ডাকতে গিয়ে দেখি বৌটা একেবারে ন্যাংটো! পরনের কাপড়টার একদিক ধরে ঐ শয়তানটা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি শয়তানি হাসি হাসছে। আর, অন্য দিকটা ধরে বৌটা টেনে নেবার চেষ্টা করছে আর কাঁদতে কাঁদতে বলছে,—আপনি আমার বাপের মত। আপনি আমায় দয়া করুন, আমার কাপড় ছেড়ে দিন। মেয়েকে আর লজ্জা দেবেন না।

মধু ॥ আমি হলে শালাকে শেষ করে দিতাম।

বিশু ॥ আমার মাথায় খুন চেপে গেল। ছুটে গিয়ে দরজায় মারলাম এক লাথি। খিলটা ভেঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। আমায় দেখেই বৌটা বল্লে—তুমি! তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও তার পিছু নিলাম, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না! অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল।...সকালে দেখলাম পুকুরের জলে তার শরীরটা ভাসছে।

শশী ॥ এত বড় অপরাধীকে তুমি ক্ষমা করলে বিশুদা ?

বিশু ॥ ক্ষমা— ! আমি কেবল সুযোগের অপেক্ষায় আছি ।

শশী ॥ এতদিন যখন সুযোগ পাওনি, তখন কি আর কোন দিন পাবে ?

বিশু ॥ পাব—পাব, নিশ্চয় পাব । শুধু ছেলেটা মানুষ হওয়ার অপেক্ষায় আছি ।

রাম ॥ এ কথা মনে রেখো বিশুদা, শত্রুকে ছেড়ে দেওয়া মানে তার হাত শক্ত করা ।

কাশি ॥ তুমি আবার বিয়ে করলেই পারতে বিশুদা ।

বিশু ॥ বিয়ে করবো কি ঐ শয়তানটার সুখের জন্তে ?

ছোঃ দাঃ ॥ ছেলেটা কি করে বিশুদা ?

বিশু ॥ ছেলেটা আমার মানুষ হল না স্যার । মা-মরা ছেলেতো, একটু আদর পেয়েছে বেশি । লেখাপড়া করে না কেবল খেলে বেড়ায় । এরচেয়ে যদি ও রামবাবুদের দলে ভরতি হতো তা হলে আমি খুশী হতাম ।

রাম ॥ তাহলে তো তাকে আমার মত অকালে মরতে হতো বিশুদা ।

বিশু ॥ তাতেও শান্তি ছিল ভাই । দেশের জনগণ তাকে ভালবাসত ।

মধু ॥ আচ্ছা রামবাবু ! কমিউনিষ্ট কি ?

রাম ॥ পৃথিবীর যে কোন দেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে চিহ্নিত হতে হয় । কোথাও তাদের নাম হয় কমিউনিষ্ট পন্থী, কোথাও নকশাল পন্থী, আবার কোথাও শ্রীকাকুলাম পন্থী । অবশ্য এ সব হওয়ার মূলে সে দেশের অবস্থাই দায়ী । আমি দেখেছি, দিনের পর দিন কি ভাবে গরিব আরো গরিব হয়ে যাচ্ছে, আর ধনী হচ্ছে আরো ধনী । ক্ষেতে যারা ফসল ফলায় তারা এক বেলাও খেতে পায় না । যারা কাপড় বোনে তাদের পরিবারের সকলের লজ্জা ঢাকার কাপড় জোটে না । ধনীরা যখন বোতলের পর বোতল মদ খায়, গরিব তখন শীতের রাত্রে শিশিরে ভেজে । মানুষের পেটে যে আগুন জ্বলে সেই আগুনেই সৃষ্টি হয় সত্য-সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি । কমিউনিজমের জন্ম এভাবেই হয়েছে ।

শশী ॥ আপনার কথায় তো মনে হচ্ছে আপনারাই সত্যকায়ের জননেতা ।

কাশি ॥ আপনি কি বলতে চান, আজকের যারা জননেতা তারা দেশের জন্ত কিছুই করেনি ?

রায় ॥ না, কিচ্ছু করেনি। এদের সবটাই ভড়ং। এদের ক'জন জনগণের জন্ত জীবন উৎসর্গ করেছে ? ক'জন জনগণের জন্ত সব কিছু খুইয়েছে, তিলে তিলে জেল খেটে নিজেকে নিঃশেষ করেছে ?...কেউ না। সবাই নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করছে। সে কালে যারা স্বাধীনতা সংগ্রাম করে শহীদ হয়েছে তাদের নাম ভাঁঙিয়ে খাচ্ছে।

ছোঃ দাঃ ॥ বিশুদা, আপনার ছেলেটাকে আমায় দিন। চেষ্টা করে দেখি না, যদি লেখাপড়া শেখাতে পারি। মানুষ করতে পারি।

বিশু ॥ স্তার ! আপনি !!

ছোঃ দাঃ ॥ হ্যাঁ,—বিশুদা। যার মা নিজের লজ্জা পরপুরুষের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলো না বলে স্বামীর কাছেও মুখ দেখাতে চাইল না, অকালে মৃত্যু বরণ করলো, তাঁর ছেলে দেখাশোনার অভাবে বয়ে যাবে, অমানুষ হবে ! এ আমি কি করে সহ্য করি।

বিশু ॥ আ—। আজ আমায় আপনি মুক্তি দিলেন স্তার। সত্যই আজ আমি মুক্ত। রোজ রাত্রে পরের বাড়ীতে ওকে রেখে আসতে হবে না। কত যে লজ্জা হয়, বোঝাতে পারব না স্তার। সত্যই আপনি মহৎ।

ছোঃ দাঃ ॥ উপকারীর উপকার করছি। মহৎ কাজ তো কিছু করছি না।

বিশু ॥ কিন্তু আমি তো আপনার কোন উপকার করিনি !

ছোঃ দাঃ ॥ মানুষ কখন কি ভাবে কার উপকার করে সে নিজে না জানলেও যে উপকার পায় সে ঠিকই জানে।...জানেন, ঐ শয়তানটা কয়েকদিন আগে রাত দশটা নাগাদ আমার বাসায় গেস্‌লো। আমায় বললে, মিত্তির শরীরটা আজ যুত বুঝছি না। আমি তোমার এখানে বসি। তুমি একবার বাজার এলাকাটা টহল দিয়ে এসো। আমি বল্লাম, একদিন না গেলে কিচ্ছু হবে না। আপনি বসুন, আপনার সঙ্গে গল্প করি সব ঠিক হয়ে যাবে। উনি বল্লেন, তা হয় না মিত্তির। ডিউটি ফার্স্ট।

বিশু ॥ আপনিও ওর কথায় টহল দিতে বেরিয়ে পড়লেন ?

ছোঃ দাঃ ॥ না-মা, আমি যাইনি। শোনই না সব কথা। আমি যাওয়ার জন্য ড্রেস পরছি এমন সময় আমার স্ত্রী তেলে-বেগুনে জলে উঠে বল্লে, এই খাবার সময় তুমি কোথাও যাবে না। যার ডিউটি সে দেবে কি না দেবে সে বুঝুক। তোমার অত মাথা ব্যথা কেন? তবুও, আমার কথা না শুনে সত্যিই যদি তুমি যাও, তাহলে যাওয়ার আগে একটা গাড়ী ডেকে দিয়ে যাও। আমার যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যাবো, এখানে এক মুহূর্তও থাকব না। বলেই সোজা রান্না ঘরে চলে গেল।

মধু ॥ আর শয়তানটা?

শশী ॥ এর পর আর থাকতে পারে!

ছোঃ দাঃ ॥ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। সে বল্লে, থাক মিত্তির, তোমাকে আর যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি। বলেই বেরিয়ে গেল।

বিশু ॥ মা আমার বুদ্ধিমতী। আমার বৌয়ের মত বোকা তো নয়।...এখন থেকে আমি আর ঐ শয়তানের হুকুম মানব না—মানছি না।

ছোঃ দাঃ ॥ আমি সে কথা ভাবছিনা বিশুদা। আমার স্ত্রী হঠাৎ কেন এত চটে গেস্‌লো আজ তা বুঝতে পারছি। ঐ শয়তানটা নিশ্চয় আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার বাসায় গেস্‌লো এবং তাকে এমন কিছু বলে ছিল যাতে সে চটে ছিল।

রাম ॥ সেটাই ঠিক স্যার। একে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

ছোঃ দাঃ ॥ না, বাড়তে আমি দেবনা। পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেব—আপনি আর আমার বাসায় যাবেন না।

কাশি ॥ যদি আপনার কথা না শোনে?

শশী ॥ যদি আপনার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আবার যায়?

ছোঃ দাঃ ॥ তা হলে যেখানে ওকে দেখবো সেখানেই (পিস্তলটা দেখিয়ে) এটা ব্যবহার করবো।

রাম ॥ সেকি স্যার! তা হলে যে আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে !!

ছোঃ দাঃ ॥ ঝুলতে হয় ঝুলবো। তবু তো কোর্টে বিচার হবে। দেশের লোক জানবে কেন আমি মেরেছি। আপনার মত বিনা বিচারে মরতে হবে না।

রাম ॥ কোর্টের বিচার ? ও আমি মানিনা স্যার। কোর্ট তো শোষকদের যন্ত্র। যেমন তাদের আর এক যন্ত্রের নাম পুলিশ। পথে ঘাটে পুলিশ যত গুলি করে মেরেছে কোর্ট কি তার বিচার করেছে ? কোর্ট যত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে সবগুলোই কি নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছে ? এমন কোর্টের বিচারে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

[বড় দারোগার প্রবেশ]

বঃ দাঃ ॥ এই শুয়োরের বাচ্চা। কি বলছিস ?

ছোঃ দাঃ ॥ কি হলো স্যার ? গাড়ীটা ঠিক হয়েছে ?

বঃ দাঃ ॥ হ্যাঁ—হয়েছে। তুমি নিশ্চিত হতে পারো। (রামকে) কি হ'লো ? উত্তর দিচ্ছ না যে ?

রাম ॥ বলছিলাম তো স্যার অনেক কথা। দেশের পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দলের কর্তব্য, তাদের পথ ও মনের মিল এবং গরমিল। বিশ্বের দিকে দিকে বিপ্লবীদের কার্যাবলী, শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শাসকের হাতে কোর্ট-কাছারি—

বঃ দাঃ ॥ হ্যাঁ। কোর্ট কথাটা আমার কানে গেছে। মিত্তির, এত কথা তুমি ওকে বলতে দিয়েছ কেন ?

ছোঃ দাঃ ॥ কি হবে স্যার ওকে বাধা দিয়ে। মেরে তো ফেলবোই। যতক্ষণ বেঁচে আছে একটু বক্‌বক্ করে যদি মনটা হাল্‌কা করে করুক না।

বঃ দাঃ ॥ এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি পুলিশে চাকরি করতে এসেছ ! আমাদের সঙ্গে কটা পুলিশ রয়েছে তাদের কথা ভাবলে না ?

ছোঃ দাঃ ॥ ভেবেছি স্যার। ওরা চাকরি করছে। পয়সা নেবে হুকুম তামিল করবে, নইলে ডিস্‌চার্জ হবে।

বঃ দাঃ ॥ তাই বলে ও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলে যাবে আর তুমি তাই শুনবে !

রাম ॥ মিথ্যে আমরা বলিনা স্যার। যা বলি সব সত্যি।

বঃ দাঃ ॥ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যে বলতে হয়েছিল তা নিশ্চয় জান ?

রাম ॥ জানি বৈকি স্যার। তিনি যে প্রয়োজনে বলেছিলেন আমার জীবনে সে প্রয়োজন এখনও আসেনি।

ব: দা:। তাই না কি! আচ্ছা যুধিষ্ঠির ঠাকুর, কেমন তুমি সত্যবাদি একবার পরীক্ষা করি। বলতো, তোমাদের আস্তানাটা কোথায়?

রাম। আস্তানা জেনে কি করবেন স্যার? আপনাদের বুকে কি এত সাহস আছে যে সেখানে যেতে পারবেন?

ব: দা:। যেতে পারি কি না পারি সে আমরা বুঝবো। তুমি কেমন সত্যবাদী সেটা দেখাও? আস্তানার খবরটা দাও?

রাম। আমাদের আস্তানা প্রত্যেকটি গ্রামে। প্রত্যেকটি মায়ের বুকে। প্রতিটি ক্ষুধার্ত পেটে। সমস্যায় জর্জরিত প্রতিটি মানুষের মনে। ক্ষমতা থাকে তো যান সেই আস্তানায়?

ব: দা:। অত্যন্ত বাজে কথা। সব কিছুর একটা সীমা থাকা দরকার!

রাম। আমাদের কোন সীমা নেই স্যার। আমাদের সাহসের, আমাদের ভালবাসার, আমাদের স্নেহের কোন সীমা নেই। এই সীমা নেই বলেই আমাদের প্রাণেও কোন ভয় নেই।

ব: দা:। মূর্খ। প্রাণের ভয় সবাই করে। তোমরা জোর করে তা অস্বীকার কর।

রাম। ভুল স্যার—সম্পূর্ণ ভুল। যার নীতি আছে সে প্রাণের ভয় করেনা। নীতিকে আগলায়। প্রাণ দিয়ে তা রক্ষা করে। অনেকটা আমার মতই কথা বল্লে। পৃথিবীর যে কোনও দেশের সত্যবাদীকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমারই কথা স্বীকার করবে।

ব: দা:। জিজ্ঞেস করতে যাবো আমি! কোন প্রয়োজনে? যতক্ষণ হাতে ক্ষমতা আছে ততক্ষণ আমি কারোর ধার ধারিনা।

রাম। সত্যিকারের ক্ষমতা তো আপনাদের হাতে নেই স্যার। ঐ বন্দুকগুলো যারা আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছে ক্ষমতা তাদের হাতে। আচ্ছা বলুন তো, আপনাদের এই শরীরটা কি শুধু ধনীদের রক্ষা করার জন্য? ওদের বাঁচানোর জন্য আপনারা কি সারাটা জীবন ওদের দেওয়া জামা-কাপড় পরে যাবেন? শোষকরা আমাদের সম্পর্কে আপনাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাই আপনারা, ওরা যা বলে তাই করেন।

ব: দা:। ওরা টাকা দেয়, আর সেই টাকায় আমাদের সংসার চলে, ছেলে

মেয়েদের মুখে হাসি ফোটে। ওদের কথা শুনবো না তো কি তোমাদের কথা শুনবো ?

রাম ॥ তাই বলে নিজেদের বিবেক বুদ্ধি সব জলাঞ্জলি দেবেন ? আচ্ছা— বলুন তো। আপনারা যে বাড়ীতে জন্মেছেন, যে বাড়ীতে থাকেন, সেটা কি সরকারের ? আপনাদের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যে বাতাস সেটা কি শোষকের ? আপনারা যে জল খান সেটা কি ধনীর ? যারা হাজার হাজার একর জমির মালিক তারা যে কত ক্ষতি করে দেশের তা আপনাদের নজরে পড়ে না ? আপনারা আমার দাদার বয়সী। আপনারা ভাবুন, চিন্তা করুন। এই সব বন্দুকগুলো গরীব মানুষের পক্ষে ব্যবহার করুন।

বঃ দাঃ ॥ ষ্টপ্ ইট—ষ্টপ্ ইট। আই সে ষ্টপ্ ইট। একেবারে অসহ্য। একে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।...এটেনসান্—(পুলিশেরা এটেনসান্ হইল। বড় দারোগা রামের দিকে পিছন ফিরে)

ফায়ার—।...ফায়ার হিম্ (গুলির আওয়াজ না পাওয়ায় বিস্ময়ে পুলিশদের দেখতে লাগল)

রাম ॥ সত্যিই আমাকে মেরে ফেলবেন স্যার ?

বঃ দাঃ ॥ সেই রকমই উপরওয়ালার নির্দেশ।

রাম ॥ দেশের জনগণকে কি বলবেন ? কি আমার অপরাধ জানাবেন ?

বঃ দাঃ ॥ মূর্খ, কিছুই বোঝো না। তোমার অপরাধ নেই বলেই তো আমরা তোমায় মারছি না। মারছে—নকশাল। কাল সকালের কাগজে বড় বড় টাইপে লেখা থাকবে নকশাল কর্তৃক জনদরদী নেতা রামচন্দ্র নিহত।

রাম ॥ কিন্তু আমাদের সবাইকে তো মারতে পারবেন না স্যার। আমাদের চিন্তা-ভাবনা তো গুলিতে শেষ হয়ে যাবে না। তবু যখন আমাকে মারবেন তখন নিন আপনাদের কাজ সেরে নিন।...

আনন্দের মাঝে করবো মৃত্যু বরণ
আগামী দিনের জন্য।

বঃ দাঃ ॥ নাম্বার এইটিন। ফায়ার হিম।

বিশু ॥ (বন্দুক নামিয়ে) নো স্যার।

বঃ দাঃ ॥ হোয়াট্—! তোর এত বড় সাহস বিশু !! জানিস তোকে আমি কুকুরের মত গুলি করে মারতে পারি ?

বিশু ॥ জানি।

বঃ দাঃ ॥ তবুও না ?

বিশু ॥ নাহ—। তবুও না।

[রাম আনন্দে গান গাইবে। গান চলার মাঝেই পুলিশ ও দারোগার কথা চলবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ওদের কথা যেন গানে চাপা না পড়ে। দারোগা গুলি না করা পর্যন্ত গান চলবে। গুলির আওয়াজ হলেই চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।]

রাম ॥ আমরা কমিউনিষ্ট আমরা কমিউনিষ্ট
যারা খেটে খায় আমরা তাদেরই
আমরা কমিউনিষ্ট।
আমাদের কথা মান বা না মানো
আমরা রবো সেই ইষ্ট্
আমরা কমিউনিষ্ট।

বঃ দাঃ ॥ অলরাইট্। তোর ব্যবস্থা পরে হবে। (রামের দিকে আঙুল দেখিয়ে) নাম্বার টোয়েন্টি ফোর। ফায়ার হিম।

মধু ॥ (বন্দুক নামিয়ে) নো স্যার।

বঃ দাঃ ॥ ওহ্! আচ্ছা !!…নাম্বার সিক্সটিন ?

কাশি ॥ (বন্দুক নামিয়ে) নো স্যার।

বঃ দাঃ ॥ নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান ?

শশী ॥ (বন্দুক নামিয়ে) নো স্যার। আই কাণ্ট্।

বঃ দাঃ ॥ ওহ্ সবাই মিলে জোট বেঁধেছো। তোমাদের জোট বাঁধা আমি ঘুচিয়ে দেব। সব কটাকে ফাঁসিতে লট্‌কাবো।

[বড় দারোগা দু'বার দ্রুত পায়চারি করেই হঠাৎ পিস্তল দিয়ে রামকে গুলি করলো। রামের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লে পিস্তলটাকে চুমু খেয়ে জয়ের উল্লাসে হাসতে হাসতে পিস্তলটা খাপে ভরে রাখল। সেই সুযোগে বিশু, মধু, কাশি ও শশী নিমেষে বন্দুক উঁচিয়ে বড় দারোগাকে গুলি করলো। বড়দারোগা আর্তনাদ করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। পুলিশরা সবাই এক এক করে ছোট দারোগার পায়ের কাছে বন্দুক নামিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে—]

বিশু ॥ আমি খুনী। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি।

মধু, কাশি ও শশী ॥ আমরা সবাই খুনী। আমরা সবাই বড়বাবুকে খুন করেছি। আপনি সবাইকে এ্যারেষ্ট করুন।

ছোঃ দাঃ ॥ তোমরা সবাই ওঠো।...বন্দুক তোলো।...আমার বিচারে তোমরা কেউ অপরাধী নও। ঐ শয়তানটা বেঁচে থাকলে আরো অনেকের ঘর ভাঙতো। অনেক শিশুকে মাতৃহারা করতো। অনেক মায়ের বুক শূন্য করতো।...এখন আমাদের যা করতে হবে মন দিয়ে শোন। বড়বাবুর মত বহু মুখোশধারী শয়তান এই পুলিশ বিভাগে লুকিয়ে আছে। তাদের আমরা খুঁজে বের করবো। তাদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলবো।

বিশু ॥ ঠিক বলেছেন ছোটবাবু। তার জন্য যদি আমাদেরও চরম শাস্তি গ্রহণ করতে হয় আমরা তা হাসিমুখে গ্রহণ করবো।

ছোঃ দাঃ ॥ আজ থেকে আমাদের শপথ—

সকলে ॥ আমরা পুলিশ বিভাগকে কলুষমুক্ত করবো।

[প্রথমে ছোটদারোগা মাথা থেকে টুপি খুলে রামকে অভিবাদন জানালো। সকলে তাকে অনুসরণ করলো। রামের হ্যাণ্ডকাপ্ খুলে দিল।]

ছোঃ দাঃ ॥ রামবাবু, তোমার সামনে আজ আমরা শপথ নিলাম! আ-মৃত্যু এগিয়ে যাবো অভ্যুদয়ের পথে—তোমরা আমাদের পথ দেখিও।

[সকলে গাইতে গাইতে দর্শকদের দিকে গেল।]

ন্যায়ের পতাকা তুলেছি আমরা / অন্যায়ের যম,
বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে লক্ষ্যে / চলবো জোর কদম।

[গানের শেষে আলো জলে উঠবে। দেখা যাবে এরা সকলে দর্শকদের মাঝে হারিয়ে গেছে। পর্দা।]

নাট্যকারের ঠিকানা:
৪০ শাস্ত্রী রোড, নৈহাটী, ২৪ পরগণা।

নিহত শতাব্দী

গৌতম রায়

চরিত্র

আনন্দ

পলাশ

বিলাস

●

[এখন রাত প্রায় দু'টো বাজে। দূরের পেটা ঘড়িতে তারই ইঙ্গিত পাওয়া গেল। মঞ্চ আলো আর আধো অন্ধকারে স্বল্প দৃশ্যমান। বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ। ঝড়ের সংকেত। এক বৃদ্ধ গৃহরক্ষককে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখা যায়। সে ধীরে ধীরে মঞ্চের পিছন দিকে যেখানে একটি খোলা জানলা দৃশ্যগ্রাহ্য সেটি বন্ধ করে দেয়। কেননা বৃষ্টির ছাঁট ঘরে ঢুকছিল। তারপর সে মঞ্চের বাম দিকে চলে যায়। সেখানে একটি আরাম কেদারায় এক যুবক বিশ্রাম রত। যুবকটির কাছে গিয়ে সে একটি চাদর যুবকটির গায়ে চাপা দিয়ে বাইরে চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। নিদ্রিত যুবকের ঘুম ভেঙে যায়।]

যুবক ॥ বিলাসদা, এখনও ঘুমোওনি ?

বিলাস ॥ তুমি জেগে আছো ?

যুবক ॥ হ্যাঁ, ঘুম আসছে না। রাত কটা হল ?

বিলাস ॥ শুনলে না একটু আগেই ত গীর্জার ঘড়িতে দুটো বাজল।

যুবক ॥ হুঁ! একটু জল খাওয়াবে?

[বিলাস ঘরের কোণ থেকে জল এনে দেয়।]

বিলাস ॥ শরীরটাকে আর কত কষ্ট দেবে?

যুবক ॥ কেন বিলাস দা?

বিলাস ॥ এত রাত অব্দি কেউ জেগে জেগে কাজ করে?

যুবক ॥ এমন কি রাত হয়েছে বল। পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় লোকের ইতিহাস ত তুমি জানোনা?

বিলাস ॥ আর জেনে কাজ নেই! এবার বড়বাবু এলে ছুটি নোব।

যুবক ॥ সে তুমি পারবে না বিলাস দা! এখন শুয়ে পড় গিয়ে। আমারও কাজ শেষ। কাল একটু সকাল সকাল ডেকে দিও—কুলীদের সব খবর দেওয়া আছে ত?

বিলাস ॥ হ্যাঁ, ওরা আটটার মধ্যেই থাকবে।

যুবক ॥ ঠিক আছে! তুমি দেখে নিও বিলাসদা, আমার এই কাজটা এবার একজিবিশনে ক্যান্টার করবে—করবে না?

[বিলাস কিছু বলে না! একবার ওর দিকে তাকায়, তারপর ধীরে ধীরে মঞ্চ ত্যাগ করে! যুবকটির নাম আনন্দ! সে ওর গমন পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে! একটা সিগারেট ধরায়। আলোটা একটু বাড়িয়ে দেয়। মঞ্চ আলোকিত হলে দেখা যায়, সেটি একটি স্থাপত্য শিল্পীর ষ্টুডিও রুম! এলোমেলো অগোছাল! ইতঃস্তত ছড়ানো কিছু ছবি! কিছু অর্ধসমাপ্ত ভাস্কর্য! কিছু পেন্টিংস। মঞ্চের ঠিক মধ্যস্থলে একটি সদ্যসমাপ্ত ভাস্কর্য! এক ভিক্ষুকের প্রতিমূর্তি! পরনে লম্বা কালো আলখাল্লা! একটি প্রসারিত হাতে একটি ভিক্ষা ভাণ্ড! আনন্দ অপলক নেত্রে

মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে—হঠাৎ মূর্তি কথা বলতে শুরু করে।]

মূর্তি ॥ তখন থেকে এত কি দেখছ আমাকে ?

আনন্দ ॥ কে ?

মূর্তি ॥ আমি, আমায় চিনতে পারছ না ?

আনন্দ ॥ তুমি ?

মূর্তি ॥ হ্যাঁ আমি। তোমার হাতের তৈরী। তোমার সৃষ্ট মূর্তি।

আনন্দ ॥ কি ?' তুমি, কথা বলছ ? ভারি আশ্চর্য !

মূর্তি ॥ কেন, তোমার কি মনে হয় তুমি এতাবৎ কাল কেবল মৃত আর বোকা সৃষ্টি করে গেছ ?

আনন্দ ॥ না ঠিক তা নয়, মানে তুমি একটা মূর্তি, ছেনি বাটালীর সাহায্যে ব্রোঞ্জ আর বুদ্ধি দিয়ে তৈরী, তুমি কথা বলছ, এটা আমি, মানে এটা কেমন করে সম্ভবপর তা আমি বুঝতে পারছি না।

মূর্তি ॥ তুমি বুঝতে পারবে না—কারণ তোমাদের মূর্তি, যতই তাদের জীবন্ত করে তোল না কেন—সে যদি মানুষের মত কথা বলতে শুরু করে, সে যদি নড়তে আরম্ভ তরে, সে যদি তোমাদের মত চলতে ফিরতে বেড়াতে পারে তাহলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে, তাই না ?

আনন্দ ॥ মানে—

মূর্তি ॥ হ্যাঁ, মানেটা তাই। কেননা তোমরা সৃষ্টি কর নিজের স্বার্থে, নিজের আনন্দে, নিজের সুখে, নিজের কল্পনায়, নিজের অস্তিত্বের সংগ্রামে ! কিন্তু তোমরা চাও না সে কথা বলুক, তোমরা বুঝতে চাও না যে তারও দুঃখ আছে, ব্যথা আছে, কেননা সেখানেই তোমাদের বড় দুর্বলতা।

আনন্দ ॥ দুর্বলতা ?

মূর্তি ॥ হ্যাঁ দুর্বলতা। নিষ্প্রাণ মূর্তি যদি কথা বলতে শুরু করে সে হবে স্বাধীন। তোমরা চাও না সে স্বাধীন হোক, সে যদি হাঁটতে পারে তোমাদের নাগাল ছাড়াবে—তোমরা তাই চাও, তাকে বেঁধে রাখতে, কংক্রীটের পেরেক আটকে—

আনন্দ ॥ আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?

মূর্তি ॥ না। বিস্ময় তোমাকে বস্তুবিমুখ করেছে।

আনন্দ ॥ তার অর্থ তুমি সত্য।

মূর্তি ॥ আগামী কালের সূর্যোদয়ের মত।

আনন্দ ॥ তাহলে তুমি ত আমার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম।

মূর্তি ॥ অমনি চোখদুটো লোভে চকচক করে উঠল ?

আনন্দ ॥ লোভ ? কিসের লোভ ?

মূর্তি ॥ যশের। অর্থের।

আনন্দ ॥ যশের লোভ প্রত্যেক শিল্পীর আছে—থাকা উচিতও—কিন্তু অর্থের লোভ আমার নেই।

মূর্তি ॥ বেশ মানলুম। তোমার অর্থের লোভ নেই, কিন্তু আমাকে দেখিয়ে যশ পাবার মত কি কাজ তুমি করেছ ?

আনন্দ ॥ আলবৎ। আমার মূর্তি কথা বলছে। পৃথিবীর একটি পরম বিস্ময়।

মূর্তি ॥ তোমার মূর্তি বধির নয়। বোবা নয়—শুধু এই জন্য—

আনন্দ ॥ নিশ্চয় !

মূর্তি ॥ কিন্তু তোমার মূর্তি যখন বলতে শুরু করবে তুমি শিব গড়তে বাঁদর গড়েছ। তোমার সৃষ্টি যখন বলতে শুরু করবে আমি যা নই আমাকে তুমি তাই করেছ—সেটা কি শুনতে মধুর হবে ?

আনন্দ ॥ কি বলছ তুমি—আমি তোমাকে যা করেছি, যেভাবে তোমাকে ধরে রেখেছি, তুমি তা নও ?

মূর্তি ॥ না, কখনোই নই ! বল আমি কি ? কি আমার পরিচয় ?

আনন্দ ॥ তুমি একটা ভাস্কর্য। একটা যুগের প্রতিধ্বনি। তোমার পরিচয়, তুমি আমার সৃষ্টি।

মূর্তি ॥ আমার কি নাম রেখেছ ?

আনন্দ ॥ নাম ? নাম, বেগার, বেগার অব অ্যান এজ !

মূর্তি ॥ একটা যুগের ভিখিরী—এইখানেই আমার সব চেয়ে বড় আপত্তি।

আনন্দ ॥ কেন ? বিংশশতকে কি ভিখিরী নেই ? রাস্তায় দাঁড়ালে কাতারে কাতারে ভিখিরী দেখা যাবে।

মূর্তি ॥ হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ ভিখিরী আছে—কিন্তু আর থাকতে দেওয়া হবে না।

আনন্দ ॥ কিন্তু তুমি একটা ঘটনার স্মৃতি হয়ে আমার কল্পনায় এসেছ—আর আমি শিল্পী হয়ে মাত্র সেই ঘটনার প্রতিরূপ দিয়েছি।

মূর্তি ॥ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে—অনেক দিন থেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ—হাতে একটা ভিক্ষা ভাণ্ড ধরিয়ে দিয়েছ—এটা ধরে থাকতে থাকতে আমার হাত টনটন করছে।

আনন্দ ॥ তুমি কি করতে চাও?

মূর্তি ॥ আমি একটু বসব।

আনন্দ ॥ বসতে পারবে?

মূর্তি ॥ বললুম ত' আমি জড়দগব নই। ইচ্ছে করলেই আমি এখন সমস্ত পৃথিবীটা তছনছ করে আবার নতুন করে গড়তে পারি।

আনন্দ ॥ উত্তেজিত হোয়ো না—বসো।

[মূর্তি উঁচু পাটাতন থেকে নীচে নেমে আসে। হাত পায়ের খিল ছাড়ায়।]

মূর্তি ॥ উঃ একটা বছর এমনি করে দাঁড় করিয়ে রেখেছ। তোমরা কি দারুন নৃশংস! তাছাড়া তোমার টেষ্ট-এরও খুব প্রশংসা করতে পারছি না।

আনন্দ ॥ কেন?

মূর্তি ॥ এটা একটা কি জামা পরিয়েছ। তেল চিটচিটে ময়লা একটা আলখাল্লা।

আনন্দ ॥ আমাদের দেশের ভিখিরীরা ওর থেকে ভাল জামা পায় না।

মূর্তি ॥ ননসেন্স! ভিখিরী আর ভিখিরী। এছাড়া যেন আর আমার কোন পরিচয় থাকতে নেই।

আনন্দ ॥ তোমার অন্য পরিচয় আমার জানা নেই।

মূর্তি ॥ যার সব কিছু জানো না, তার রূপ দেবার চেষ্টা কি তোমার স্পর্ধা নয়?

আনন্দ ॥ না স্পর্ধা নয়—সৃষ্টির পেছনে কিছু কল্পনার প্রয়োজন।

মূর্তি ॥ অভিজ্ঞতাহীন কষ্ট কল্পনায় মহৎ কিছু সৃষ্টি করা যায়?

আনন্দ ॥ কষ্ট কল্পনা?

মূর্তি ॥ হ্যাঁ, তুমি; আমার কিছুই জানো না। আমি কে, আমি কি, কোথা থেকে এসেছি—

আনন্দ ॥ আমি যতদূর জানি, তুমি শেয়ালদার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে।

মূর্তি ॥ আর জান ভিক্ষে করতে করতে একদিন কেমন সটান বাসের তলায় চলে গেলুম।

আনন্দ ॥ সেই স্মৃতিই আমাকে তোমার রূপ দেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

মূর্তি ॥ কিন্তু সেটা ত পরিণতি। উৎসের সন্ধান না রেখেই পরিণতির রূপ দিতে চাইছ? বলিহারী তোমার কল্পনার পাখ্‌না—

আনন্দ ॥ আমি কি কিছু ভুল করেছি?

মূর্তি ॥ আগা গোড়া ভুল করেছ।

আনন্দ ॥ যেমন?

মূর্তি ॥ তাহলে একটা গল্প বলি—

আনন্দ ॥ গল্প?

মূর্তি ॥ কেন, শুনতে ভাল লাগবে না?

আনন্দ ॥ না। আমার ভালোই লাগছে, তুমি বল,

মূর্তি ॥ খাবার টাবার কিছু আছে? কতদিন যে পেটে কিছু পড়েনি।

আনন্দ ॥ খাবার? এত রাত্রে? আচ্ছা দেখছি। তুমি বসো!

[আনন্দ চলে যায়—চায়ের জল চড়িয়ে দেয় ঘরের একপাশ থেকে বিস্কুট আনে—]

আনন্দ ॥ এত রাত্রে আর কিছু নেই—বিস্কুট খাও! চায়ের জল বসিয়ে দিয়েছি!

মূর্তি ॥ (বিস্কুট খেতে খেতে) ছাপ্পান্নর শেষের দিকে।

আনন্দ ॥ ছাপ্পান্নো?

মূর্তি ॥ ১৯৫৬! ভারতটা তার অনেক আগেই দু টুকরো হয়ে গেছে। বাংলাও বাদ যায় নি! দু বাংলায় তখন খেয়োখেয়ি আর পরস্পর দাপাদাপিতে ব্যস্ত! ইংরেজ জাতটা ছিল দুখোড় শয়তান। দুশো বছরের ছোবড়া-টুকু পাশাপাশি ফেলে গেল দুটো ভাগ করে—যাতে তারা এক না হতে পারে, যাতে তারা সুখে না থাকতে পারে—সে যাক, ধলেশ্বরীর নাম শুনেছ?

আনন্দ ॥ ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম—তার দেওরের মেয়ে।

মূর্তি॥ ব্যাস ব্যাস—এই তোমাদের আর এক রোগ। কবিতা পেলে আর কিছু চাওনা। সেই ধলেশ্বরীর বুকে আমি ছিলুম এক দামাল ছেলে।

আনন্দ॥ তোমার নাম কি ছিল?

মূর্তি॥ নাম? নাম একটা হয়ত ছিল! এখন মনে নেই! আচ্ছা একটা কিছু ধরে নাও। ধর আমার নাম ছিল শ্যামল।

আনন্দ। শ্যামল?

মূর্তি॥ পছন্দ হল না! তাহলে কমল। নয়ত তমাল! মানে এমন একটা নাম যার গায়ে পূব বাংলার সোঁদা মাটির গন্ধ লেগে থাকত। ও হ্যাঁ মনে পড়েছে—পলাশ।

আনন্দ॥ বাঃ সুন্দর নাম!

পলাশ॥ নবান্নপুরের বাঁশবনে একসংগে হাজার ঘুঘু ডাকত নির্জন দুপুরে। পলাশ ছুটত আমবাগানের তলা দিয়ে, বংশীতলার চত্বর ছুঁয়ে, ধলেশ্বরীর তীর ধরে। মা বকলে শুনত না। দিদির কানমলা সয়ে গিয়েছিল।

আনন্দ॥ তুমি বুঝি খুব দুষ্টু ছিলে পলাশ?

পলাশ॥ দারুণ। কেউ আমায় রুখতে পারত না! পূববাংলার আকাশ কালো করা মেঘ তুমি দেখনি। নদীর বুকে ঝাঁপান বৃষ্টি তুমি কল্পনা করতে পার না। পদ্মার বুকে বান দেখলে তোমার শরীর হিম হয়ে যাবে।

আনন্দ॥ তুমি সব দেখেছ?

পলাশ॥ আঃ, তুমি কি বোকা? পূববাংলায় আমার নাড়ীর বাঁধন। আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা আছে আমার মনের সারা চত্বর। ভাটিয়ালী শুনেছ?

আনন্দ॥ হ্যাঁ।

পলাশ॥ ছাই শুনেছ? জ্যোৎস্না রাতে মায়ের কোলের কাছে ঘেঁষে ঘেঁষে শুয়ে টিমটিমে কেরোসিনের ঠাণ্ডা আলোয় কান পাতলে রোজ শুনতে পেতুম ধলেশ্বরীর তীরে বসে ভাটিয়ালি ধরেছে বদরআলি। সে তুমি শোননি।

আনন্দ॥ তোমার গল্প শুনতে শুনতে আমার কেমন নেশা লাগছে।

পলাশ॥ গল্পেই এই! সেখানে থাকলে কি করতে?

আনন্দ॥ মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতুম।

পলাশ ॥ আমিও চেয়েছিলুম। পারি নি। সব কিছু ভাল করে বোঝার আগেই দেখি আমার সব হারিয়ে গেছে! আমার সুখ হারিয়ে গেছে, আনন্দ হারিয়ে গেছে—আমার চন্দনা হারিয়ে গেছে—

আনন্দ ॥ চন্দনা? সে কে?

পলাশ ॥ চন্দনা—

[পলাশ থেমে পড়ে! নেপথ্যে চন্দনার ডাক শোনা যাবে যেন কোন্ এক দূর মাঠে দাঁড়িয়ে পলাশের নাম ধরে ডাকছে, প...লা...শ.., প...লা...শ...আস্তে আস্তে ডাকটা মিলিয়ে যাবে—]

পলাশ ॥ আমার প্রাণের পাখি চন্দনা

আনন্দ ॥ তুমি বুঝি পাখি পুষতে?

পলাশ ॥ হাঁদা গঙ্গারাম। চন্দনা আমার মনের মেয়ে!

আনন্দ ॥ ও! বিয়ে হয়েছিল?

পলাশ ॥ সময় পেলুম না! তার আগে সব পালাই পালাই করছে! সাম্প্রদায়িকতার হিড়িকে সবাই দেখলুম ছুটছে। পালিয়ে বাঁচছে! সংখ্যালঘুরা হাঁক দিয়েছে চলো হিন্দুস্থান। এখানে থাকলে কেউ বাঁচবে না! খেতে না পাই ভিক্ষা করব—কিন্তু প্রাণে ত বাঁচব।

আনন্দ ॥ সবাইকে নিয়ে চলে এলে?

পলাশ ॥ সেই পালানোর হিড়িকে কে কোথায় সব ছিটকে পড়ল। কয়েকটা নৃশংস পশু আমার দিদিকে খেয়ে ফেলেছিল! মাকে নিয়ে কোনরকমে বর্ডার পার হয়েছিলুম অনেক টাকা খেসারত দিয়ে।

আনন্দ ॥ তোমার বাবা?

পলাশ ॥ আমার সাত বছর বয়সে—

আনন্দ ॥ ও! কিন্তু চন্দনা?

পলাশ ॥ সে এখন ফতেমা বিবি—

আনন্দ ॥ তারপর?

পলাশ ॥ এসে দেখলুম এ বাংলা আরো ভয়াবহ লোক আছে অনেক, কিন্তু

খাদ্য নেই। খিদে আছে প্রচুর কিন্তু চাকরী কই? আশা আছে বিরাট, কিন্তু ভবিষ্যৎ ফক্কা। হাতের পুঁজি সব শেষ হয়ে গেল। চাকরী নেই। কে দেবে? যাও বা আছে তা আমাদের জন্য নয়।

আনন্দ ॥ থাক্ আর শুনতে ভাল লাগছে না।

পলাশ ॥ শেষটা শুনবে না?

আনন্দ ॥ আর কি শুনব। সেই সব একই কাহিনী।

পলাশ ॥ এটা বোধ হয় শোন নি। ষোল বছরের ছেলেকে কেউ চাকরী দেয় নি কিন্তু ত্রিশ বছরের মাকে অনেকে চাকরি দিতে চেয়েছিল। খিদের জ্বালায় ছটফট করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তুম। একদিন মাঝ রাতে ঘুম থেকে উঠে দেখলুম মা নেই! অনেক পরে মা ফিরে এল! কোঁচড়ে ভরা খাবার। সেদিন অতশত বুঝি নি—আজ বুঝতে পারি—মা শেষ পর্যন্ত বেশ্যা হয়েছিল।

আনন্দ ॥ পলাশ!

পলাশ ॥ হ্যাঁ অনেক যন্ত্রণার বোঝা নিয়ে মা শেষ পর্যন্ত সিফিলিসে-মরেছিল।

আনন্দ ॥ দয়া করে তুমি থাম পলাশ।

পলাশ ॥ সহজ রাস্তা ছেড়ে ভুল রাস্তায় চলেছিলুম। চোখের সামনে দেখতুম আমারই মত ছেলেরা চুরি করছে, ছিনতাই করছে, ওয়াগন ভাঙছে আর আমি বোকার মত লোকের কাছে হাত পেতে দয়া চাইতুম—

আনন্দ ॥ ন্যায়ের পথে বাঁচতেই ত আনন্দ।

পলাশ ॥ ন্যায়, বিবেক, সততা, ধর্ম, জগতের এই সমস্ত মুখরোচক শব্দগুলোকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিদায় করা দরকার।

আনন্দ ॥ কি বলছ তুমি? এগুলো চলে গেলে থাকবে কি?

পলাশ ॥ থাকবে মৃত্যু, দ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা, লোভ।

আনন্দ ॥ তাহলে ত পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

পলাশ ॥ সেদিন যদি গাড়ী চাপা না পড়তুম তাহলে এই পুরনো পৃথিবীটাকে একেবারে গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে একটা নতুন পৃথিবী তৈরী করতুম যে পৃথিবীতে লোকে ভিক্ষে করবে না, কেড়ে খাবে। যে টাকার পাহাড়

করছে তাকে সেই টাকার নীচে কবর দিয়ে সেই টাকা লুঠ করবে—হত্যা রক্ত আর বিশৃংখলতায় পৃথিবী অরাজক হয়ে উঠবে।

আনন্দ ॥ কষ্ট পেয়ে পেয়ে তোমার মনটা নষ্ট হয়ে গেছে পলাশ।

পলাশ ॥ তুমি চুপ কর—তোমার চা হল ?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ দেখছি—

[আনন্দ চা তৈরী করে আনতে যায়]

পলাশ ॥ কবে আর কখন যেন সব হারিয়ে গেছে !
কবে আর কখন যেন সব হারিয়ে ফেলেছি।
অথচ কত কিছু করার ছিল, কত কিছু হওয়ার।
উদাসীন অবহেলায় টুকরো করেছি নিজেদের,
অসংখ্য করেছি—আনন্দ পেয়েছি আশ্চর্য
এক হিংসায় নিজেদের খুন করে।
অথচ একদিন ঘাসে আর পাতায় বেঁচেছি।
সবুজ নিংড়ে শিশিরের গন্ধ গায়ে মেখেছি।
দাওয়ায় চলকে পড়া সূর্যকে দুহাতে লোফালুফি করে
প্রিয়ার শান্ত কোলে আবার মাথা রেখেছি
চাঁদের আলোয়।
যেহেতু অনেক কিছু হওয়ার ছিল, তবু
উদাসীন, অবহেলায় টুকরো করেছি নিজেদের,
অসংখ্য করেছি—আনন্দ পেয়েছি আশ্চর্য
এক হিংসায় নিজেদের খুন করে।
প্রেমের আকাশে নক্ষত্রের মালা গেঁথে
সুখী হতে পারতাম—অথচ ক্ষমাহীন শাণিত কৃপাণে
বলি দিয়েছি গর্ভবতী সময়কে।
এখন কেবল হেঁটে চলা প্রেতের মত।
সময়ের নির্ধারিত হাতে সঁপে দেব আমরা আমাদের—

[আনন্দ চা নিয়ে আসে]

আনন্দ ॥ বাঃ বেশ সুন্দর কবিতা।

পলাশ ॥ অত্যন্ত বাজে কবিতা। নির্ধারিত সময়ের হাতে সঁপে দেব আমরা আমাদের। সাবমিশান টু টাইম। জঘন্য! সাবমিশান মানেই ত শেষ! হাল ছেড়ে বসে থাকা গাঁজা খাওয়া বাবাজীর মত! বাঃ চা-টা বেশ করেছ। মনে হচ্ছে কতদিন কতকাল যে তৃষ্ণা নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি।

আনন্দ ॥ আর একটু চা নাও।

পলাশ ॥ দাও। কে জানে আবার কতকাল খাওয়া হবে না! পথ আমি পাল্টেছি শিল্পী! একটা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি চেয়ে কিছু পাওয়া যায় না। কেড়ে নিতে হয়। প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ এই সব দুর্বলতা-গুলো এবার ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব পৃথিবী থেকে। আমার পৃথিবীতে একটাই সত্য—। মৃত্যু, ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা। এতদিনের পৃথিবীতে যা ছিল ভালোর দলে আজ তারা অচল! ঘুন ধরা পুরনো পৃথিবীর মত এরা সবাই অকেজো।

আনন্দ ॥ তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।

পলাশ ॥ তোমার সহানুভূতির মুখে আমি পেচ্ছাব করি। ওসব আমার কথা-মালায় নেই।

আনন্দ ॥ নিজেকে তুমি হারিয়ে দিওনা পলাশ! আমি যে তোমার নবজন্ম দিয়েছি। আবার নতুন করে তুমি বাঁচ।

পলাশ ॥ তোমার নবজন্ম মানেই ত হাতে ভিক্ষাভাণ্ড। ও ভাবে আর আমি জন্মাতে চাই না। সিফিলিসে তিল তিল করে আর আমি আমার মাকে মরতে দিতে রাজী নই। একটা পয়সা দাও বলতে বলতে বাসের তলায় থেৎলে যেতে আর আমার ইচ্ছে নেই! আচ্ছা শিল্পী—

আনন্দ ॥ বল।

পলাশ ॥ তুমি কি এখনও বিশ্বাস কর তোমার পরিচিত রাস্তায় পৃথিবীর সব সুখ আর সমৃদ্ধি ফিরে আসবে? তুমি কি মনে কর জগতের সুপ্রবৃত্তিগুলো নিজেদের গোঁড়ামী নিয়ে চিরকাল যক্ষের মত পৃথিবীকে আগলে রাখবে?

আনন্দ ॥ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি সত্য শিব আর সুন্দরের জয় অনিবার্য।

পলাশ ॥ তুমি একটা গোঁয়ার হনুমান। রামের পদলেহন ছাড়া কিছুই জান না। আরে, এটা কি ? একটা দাবার ছক মনে হচ্ছে।

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, দাবা।

পলাশ ॥ সাজানো ছক ! মনে হচ্ছে কারো প্রতীক্ষায় ছিলে ?

আনন্দ ॥ ওটা সাজানোই থাকে। কেউ এলে তার সঙ্গে খেলি। দাবা আমার প্রিয় খেলা।

পলাশ ॥ তুমি কি রকম খেলতে জান ?

আনন্দ ॥ আমাকে হারানো শক্ত ব্যাপার।

পলাশ ॥ গর্ব।

আনন্দ ॥ আত্মপ্রসাদও বলতে পার।

পলাশ ॥ তাহলে এস একহাত হয়ে যাক।

আনন্দ ॥ তুমি পার নাকি খেলতে ?

পলাশ ॥ দেখাই যাক।

আনন্দ ॥ তাহলে বসে পড়। বাইরে বেশ মেজাজে বৃষ্টিও পড়ছে।

পলাশ ॥ কিন্তু এ'ত সেই মান্ধাতার আমলের বস্তাপচা একঘেঁয়ে ঘুঁটি।

আনন্দ ॥ এই ত দাবার আসল ঘুঁটি।

পলাশ ॥ রাজা মন্ত্রী সৈন্য সামন্ত, এলাহী ব্যাপার। সভ্যতার সুরু থেকে তোমরা ধরেই নিয়েছ একদল রাজা থাকবে সে শাসন করবে। মন্ত্রী থাকবে তাকে উপদেশ দেবার জন্ত। আর লক্ষ লক্ষ প্রজারা সেই রাজাকে সেলাম ঠুকবে। তারপর রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে মরবে সেই নিরীহ মানুষগুলো তাই না শিল্পী ?

আনন্দ ॥ কিন্তু এতো নিছকই খেলা।

পলাশ ॥ হ্যাঁ, এমনি সব খেলার পুতুল চোখের সামনে সাজিয়ে তোমরা নেশায় বুঁদ হয়ে আছ। দিন পাল্টাচ্ছে শিল্পী। আমিরী ওমরাহীর আমল চলে গেছে। সলতের শেষ আলো জমিদারীটুকুও আজ গতায়ু। আর এখনও তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে শতরঞ্জের ছকে ঘুরপাক খাচ্ছ।

আনন্দ ॥ কিন্তু দাবা খেলতে হলে ত' তোমাকে এই সব ঘুঁটি দিয়েই খেলতে হবে।

পলাশ ॥ না, আমার ঘুঁটি দিয়ে তোমায় খেলতে হবে।

আনন্দ ॥ তোমার ঘুঁটি ?

পলাশ ॥ হ্যাঁ (আলখাল্লার পকেট থেকে একটা কালো থলে বার করে। এই আমার ঘুঁটি ! এ সম্পূর্ণ আমার নিজের ঘুঁটি।

আনন্দ ॥ দেখি (অদ্ভুত দর্শন সব ঘুঁটি বার করে) বাঃ অদ্ভুত দেখতে ত এটা কি ?

পলাশ ॥ ওটা—ওর নাম লোভ।

আনন্দ ॥ লোভ ?

পলাশ ॥ হ্যাঁ। তোমরা যার নাম দিয়েছ ঘোড়া ! ঘোড়ার গতি বিচিত্র আর দ্রুত ! লোভের গতিও বিচিত্র আর দ্রুত ! এটা কালো ঘরের ঘুঁটি ! অন্ধকারের প্রতীক ! লোভ মনের অন্ধকারে চলাফেরা করে ! তাই লোভ আমার ঘুঁটি ! আমি কালো ছাড়া খেলি না।

আনন্দ ॥ তুমি সর্বদাই কালো ঘুঁটিতে খেল।

পলাশ ॥ আমার জীবনে সাদার কোন স্থান নেই। আমি যাদের নিয়ে খেলি তারা তোমাদের মতে মানুষের অন্ধকারের প্রবৃত্তি।

আনন্দ ॥ ইনটারেষ্টিং ! এটা কি ?

পলাশ ॥ ওটা তোমার ঘুঁটি ! ওর নাম প্রেম ! আমার লোভের রাইভ্যাল। প্রেমের গতি বিচিত্র আর এলোমেলো ! প্রেম জটিল, তাই ও ঘোড়ার ঘরেই বসবে। [ওরা ছক সাজাতে থাকে।]

আনন্দ ॥ চমৎকার ব্যাখ্যা।

পলাশ ॥ এই হ'ল তোমার রাজা।

আনন্দ ॥ কি নাম দিয়েছ ?

পলাশ ॥ আনন্দ ! আনন্দই জীবন। জীবনই তোমার রাজা।

আনন্দ ॥ আনন্দ ? বারে, ওটা ত আমারই নাম ?

পলাশ ॥ তাই নাকি ? তাহলে তুমিই তোমার রাজা।

আনন্দ ॥ আর তোমার ?

পলাশ ॥ মৃত্যু ! মরণ। জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী।

আনন্দ ॥ বাঃ, এটা কি ?

পলাশ ॥ এর নাম সত্য। বা বিবেক! যাকে তোমরা বল সেল্‌ফ্‌। এ তোমার মন্ত্রী!

আনন্দ ॥ তুমি ঠিকই বলেছ! বিবেকই ত মন্ত্রী হবার উপযুক্ত! বিবেকের পরামর্শ ছাড়া আমরা ত চলতে পারি না! সত্যের দেখানো রাস্তা ছাড়া আর ত সব অন্ধকার।

পলাশ ॥ আমার মন্ত্রীর নাম ক্রোধ! জ্বলে ওঠার ক্ষমতা! দুর্বার গতিতে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবার মত একটা প্রবৃত্তি। ক্রোধের আর এক প্রকাশ প্রতিহিংসা! ক্রোধের পরামর্শেই মৃত্যু আত্মপ্রকাশ করে।

আনন্দ ॥ তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে। এটা কোথায় রাখব?

পলাশ ॥ ওটা তোমার! ওপর নাম দয়া! স্নিগ্ধ স্বচ্ছ আর মন্থর গতিতে যে এগিয়ে যায়। ওটা তোমার নৌকোর কাজ করবে! আর এটা তোমার রাইভ্যাল। কুটিলতা! কালো রঙের ঘুঁটি! নৌকোর মত ঢিলে মেজাজী চালে নিশ্চুপের মত তোমার মধ্যে মিশে তোমাকে শেষ করে দেবে! আর এই এটা—এটা তোমার ঘুঁটি। যার নাম জ্ঞান। কৌণিক আত্মরক্ষার বর্ম! আর এটা ঘৃণা। আমার কৌণিক বুহ্য!

আনন্দ ॥ এদের কি নাম দিয়েছ। এই সব বোড়ের দল! সৈন্য সামন্ত যত।

পলাশ ॥ এরা সব ছোট ছোট সুখ আর দুঃখ!

আনন্দ ॥ তাহলে খেলা শুরু হোক।

পলাশ ॥ হোক! কিন্তু নিস্পৃহ শিশুর খেলায় আমি রাজী নই।

আনন্দ ॥ তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না।

পলাশ ॥ বাজীর খেলা হোক।

আনন্দ ॥ বাজী?

পলাশ ॥ হ্যাঁ বাজী না থাকলে খেলায় নেশা থাকে না। উত্তেজনা শরীরে হিল্লোল আনে।

আনন্দ ॥ বাজীটা কি রকম?

পলাশ ॥ বলছি। এ খেলার মানে জান?

আনন্দ ॥ তুমিই বল। আমার জানা আর তোমার জানা ত' এক নয়।

পলাশ ॥ হুঁ। তাহলে শোন—এতদিন অনেক যুদ্ধ হয়েছে। রাজা বাদশার

খেয়ালীপনায় অনেক নিহত প্রজার আত্মা নিদারুণ প্রলাপে পলাশীর প্রান্তে কেঁদেছে। অনিবার্য আক্ষেপে অভিশপ্ত করেছে ট্রয় আর কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন। হিরোসিমা আর কোরিয়ার বুকে মা আর ছেলে এক সঙ্গে রক্তবমন করেছে। কম্বোডিয়ার ক্ষেতে, টিউনিসিয়ার বন্দরে আর ভিয়েতনামের পথে প্রান্তে চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে দেশপ্রেমিক সৈনিকের শেষ নিঃশ্বাস। তাই আর এ রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ নয়! শোষক আর শোষিতের বিদ্রোহ নয়।

আনন্দ ॥ তবে এ যুদ্ধ কিসের ?

পলাশ ॥ কয়েকটা প্রবৃত্তির যুদ্ধ ! আগামী পৃথিবীতে কে থাকবে তার যুদ্ধ !

আনন্দ ॥ তোমার আমার খেলায় যেই জিতুক তাতে পৃথিবীর কার কি এসে যায় ?

পলাশ ॥ তুমি আমার প্রথম শত্রু ! তুমি আমার স্রষ্টা ! স্রষ্টার বিরুদ্ধে সৃষ্টির কলহই প্রথম যুদ্ধের ঘোষণা। দেখনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রাণের কি আকুল আক্রোশ। খেতে না পেলে ঈশ্বরকে গাল দিই ! স্বার্থে আঘাত লাগলে নস্যাৎ করি ঈশ্বরকে ! নিষ্ফল মৃত্যুর মুখে ঈশ্বরের নিদান কামনা করি ! তাই তোমার বিরুদ্ধে আমার প্রথম যুদ্ধ ! এ যুদ্ধে বাজী একটাই।

আনন্দ ॥ কি ?

পলাশ ॥ মৃত্যু !

আনন্দ ॥ মানে ?

পলাশ ॥ আমি যদি জিতি তাহলে আমার হাতে হবে তোমার মৃত্যু ! হ্যাঁ আমি তোমাকে খুন করব ! খুন করব কারণ তুমি বিকৃত রূপ দিয়েছ। আমার গত জীবনের অন্তিমে শপথ নিয়েছিলুম ভিক্ষা পাত্র হাতে আর এই পৃথিবীতে আসব না। আমার এক হাতে থাকবে কৃপাণ। অন্য হাতে মৃত্যু ! জীবন আমাকে যা দেয়নি মৃত্যু আমাকে তাই দেবে। অন্ততঃ খেতে না পেয়ে আমি মরব না ! কিন্তু তুমি আমাকে তা হতে দাওনি। সে শপথ আমার মনে আছে। জন্ম আমার যাই হোক—হিসেব নিকেশ ঠিক থাকবে।

আনন্দ ॥ কি পাগলের মত যা তা বকছ ?

পলাশ ॥ সত্য কখনো কখনো ছলনার আশ্রয় নিয়েছে! যুধিষ্ঠিরও রণক্ষেত্রে অশ্বত্থামা হত ইতি গজ দিয়ে শেষ করেছিলেন—তোমাদের শ্রীকৃষ্ণও কম যান নি মিথ্যা ভাষনে—কিন্তু মৃত্যু কখনও মিথ্যার আশ্রয় নেয় নি। সে অমোঘ, সে-নির্মম, সে অপরাজেয়—

আনন্দ ॥ কথা থামাও। শুরু কর তোমার খেলা! আমি রাজী। জীবনে আমি কখনও হারিনি। এবারও তুমি হারবে! কিন্তু তুমি হারলে?

পলাশ ॥ তোমার গোলাম হয়ে থাকব। মেনে নেব আমার স্রষ্টাকে।

আনন্দ ॥ নাও খেল।

[ওরা দাবা খেলতে শুরু করে! মঞ্চের আলো কিছু কমে যায়! বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ! Music থাকবে। টেবিলে একটা চিমনীর আলো জ্বলছে।]

পলাশ ॥ তোমার একটি ছোট্ট সুখের মৃত্যু হল—দেখেছ শিল্পী—

আনন্দ ॥ তোমারও একটা ছোট্ট দুঃখের মৃত্যু হল।

পলাশ ॥ হ্যাঁ, এমনি করেই আমাদের জীবন থেকে একটা একটা করে ছোট ছোট দুঃখ আর সুখ অন্তর্হিত হয়।

আনন্দ ॥ ছোট ছোট দুঃখে আমরা ভেঙ্গে পড়ি। একটু ক্লান্তি অথবা একটুখানি হতাশা আমাদের ম্লান করে। মাছের চোখের মত বিবর্ণ হয়ে পড়ি।

পলাশ ॥ কি লাভ এই সব ছোট ছোট সুখে জীবনের হতাশা বাড়ানো?

আনন্দ ॥ সুখ থেকে হতাশা?

পলাশ ॥ তাও জানো না। একটু পাওয়া অনেক না পাওয়ার বেদনা বাড়িয়ে দেয়। তার চেয়ে উল্টোটা ধর—একটু একটু পাওয়া দুঃখ তোমার দুঃখ সহ্যের শক্তিকে পরিণত করবে।

আনন্দ ॥ তোমার আর একটা দুঃখের পতন হল।

পলাশ ॥ ওকি করলে শিল্পী? আমার একটি দুঃখকে সরিয়ে দিয়ে ঘৃণার পথ প্রশস্ত করলে?

আনন্দ ॥ করলুম, কেননা ওখানে আমার শান্তি মজুত। তোমার ঘৃণা এগুতেই পারবে না।

পলাশ ॥ হাঃ, তুমি ঘৃণার পথ রুখবে? এই দেখ আমার ঘৃণা অন্য পথে তোমার আর একটি সুখ সরিয়ে নিল— [আনন্দ বিব্রত]

আনন্দ ॥ এটা ত আমি দেখিনি।

পলাশ ॥ চাল ফেরৎ নেবে?

আনন্দ ॥ না, এটা বাস্তীর খেলা।

পলাশ ॥ তুমি হারবে নির্ঘাৎ। তোমার আনন্দকে ছকে বাঁধ।

আনন্দ ॥ চুপ কর। খেলার সময় আমি অন্যের উপদেশ নিই না। চেয়ে দেখ আমার সুখেরা কেমন তরতরিয়ে সামনের দিকে পাখনা মেলেছে—

পলাশ ॥ যেমন পতঙ্গ ছন্দে ছন্দে আগুনের বুকে ঝাঁপ দেয়।

আনন্দ ॥ তুমি ত' বড় অহংকারী!

পলাশ ॥ ওটা আমার গুণ।

আনন্দ ॥ কিন্তু অহংকার আনে পতন।

পলাশ ॥ এবং মৃত্যুর পর নবজন্ম—তাই না?

আনন্দ ॥ নাও, যুদ্ধ শুরু কর—তোমার একটি ক্ষুদ্র দুঃখ, গ্লানি যার নাম, কেড়ে নিলুম।

পলাশ ॥ তাহলে তোমার একটি সুখ, কি নাম ওর, সান্ত্বনা—আমি হরণ করলুম।

আনন্দ ॥ তোমার অপরাধবোধ শেষ হল।

পলাশ ॥ তাহলে তোমার সুখাস্মৃতির মৃত্যু হোক।

আনন্দ ॥ তোমার সন্দেহ গেল।

পলাশ ॥ এই তোমার স্নেহ আমি তুলে নিলুম।

আনন্দ ॥ এই বার?

পলাশ ॥ কি হ'ল এত উল্লাস কেন?

আনন্দ ॥ আমার প্রেম—

পলাশ ॥ কি হোল তার?

আনন্দ ॥ তোমার ঘৃণা আর কুটিলতাকে এক সাথে বেঁধেছে—বল কাকে রাখবে, কাকে ছাড়বে?

পলাশ ॥ চালটা বড় জবর দিয়েছ শিল্পী—একটু ভাবতে দাও—দেখি একটা সিগারেট। [আবহ চলছে]

আনন্দ ॥ নাও বুদ্ধিটা হাল্কা কর।

পলাশ ॥ তোমার প্রেম ভালবাসা আমার ঘৃণা আর কুটিলতাকে আচ্ছন্ন করেছে! কিন্তু প্রেমের জয় হতে পারে না। প্রেম বলে কিছু নেই—মমতা জগতে অনুপস্থিত। মায়াহীন পৃথিবীতে ঘৃণাই একমাত্র স্বত্বা। অথবা কৌটিল্য। না প্রেমের জয় হতে পারে না। তাহলে চন্দনা আজ ফতিমা বিবি হত না—

আনন্দ ॥ পলাশ তুমি ভুল করছ। আসলে তোমার ক্রোধ আর ঘৃণা, বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে তোমাকে! তাই তোমার বিচার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে! তুমি চন্দনাকে ভুল বুঝেছ। বিচার করতে পারছ না, কেন চন্দনা আজ ফতিমা।

পলাশ ॥ কল্পনার ফানুসে চড়ে এক ভিখিরীর মৃত্যু দৃশ্য নিয়ে একটা মূর্তি গড়তে তুমি হয়ত পার। কিন্তু কল্পনার আকাশে ভেসে ভেসে পলাশের দুঃখের কাছে যেতে পার না—নাও সামলাও তোমার নির্বীর্য দয়াকে। আমার ক্রোধ তোমার দয়ার অস্তিম পরোয়ানা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আজ তোমার মুক্তি নেই।

[খেলা চলে—দুজনেই অধীর, উত্তেজিত]

আনন্দ ॥ না হতে পারে না—পৃথিবী কখনো দয়াহীন হ'তে পারে না।

পলাশ ॥ একটা পুরনো মূল্যবোধ থেকে তোমার ধারণাগুলোকে তুমি সাজিয়েছ। তাই দয়া নিয়ে অত মহত্ব দেখাচ্ছ। পৃথিবীটা নিংড়ে যদি একফোঁটা দয়া বের হত তাহলে আমার মাকে সিফিলিসের যন্ত্রনায় বোবা কাৎরানিতে মরতে হ'ত না—

আনন্দ ॥ কিন্তু—

পলাশ ॥ কোন কিন্তু নয় খেল।

আনন্দ ॥ তাহলে তোমার ঘৃণাটা বাদ যাক।

পলাশ ॥ (পরম উল্লাসে ফেটে পড়ে) হাঃ হাঃ আমার ক্রোধে তোমার দয়ার মৃত্যু হল। আর সেই সংগে তোমার শাস্তি আমার কব্জায়! ওখান

থেকে শান্তিকে সরাতে গেলে মারা যাচ্ছে কে—তোমার সত্য—তোমার বিবেক—তোমার মন্ত্রী হাঃ হাঃ।

আনন্দ ॥ (বিব্রত) আশ্চর্য, এমন অপদস্থের মত আমি কোনদিন পরাজিত হইনি।

পলাশ ॥ মনে রেখো এটা বাজীর খেলা। এটাই তোমার শেষ খেলা।

আনন্দ ॥ না- না।

পলাশ ॥ ভুলে গেলে নাকি বাজীর কথা ?

আনন্দ ॥ সত্যিই তুমি আমাকে ?

পলাশ ॥ (টেবিলের ওপর একটা ছুরি গেঁথে রাখে) এটা কি মিথ্যে ?

আনন্দ ॥ তবে কি জীবনের কাছে, সত্যের কাছে, আনন্দের কাছে মৃত্যু আর অধর্মের জয় হবে ?

পলাশ ॥ চুপ কর। মৃত্যুর মত ধার্মিক আর কেউ নেই। তোমার সত্যের চেয়ে অনেক বেশী ধার্মিক সে। তোমার সত্য স্ফটিকের মত ক্ষণভঙ্গুর, তোমার আনন্দ শিশিরের মত ক্ষণস্থায়ী, তোমার শান্তি কর্পূরের মত রুগ্না। তোমার প্রেম লতার মত ক্ষীণাঙ্গী। একটু ঝড়ের দোলায় তার পুচ্ছ ভেঙে যায়। কাণ্ড উপড়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে লুটিয়ে যায়—ছোঃ। কই চাল দাও। (আনন্দ একটা চাল দিল।) নাবালোকের মত খেলছ। এক ঘর ওপরে তুলে আনলে তোমার সত্যকে। তার মানে এক ধাপ তোমার সত্যকে জীবন বিমুখ করলে! ভাবলে এতেই পাবে রেহাই। না। এই দেখ—এই কোণে দেখ, আমার অতি প্রিয় ঘৃণা আড়াই চালে তোমার অন্ত প্রান্ত আক্রমণ করেছে। ভেবেছ বাঁচবে—পার যদি বাঁচাও তোমার আর এক পাশের শান্তিকে। তোমার দুদিকের শান্তিই আজ বিপন্ন—

আনন্দ ॥ ওঃ ভগবান!

পলাশ ॥ শয়তানকে ডাক! ঈশ্বরের মৃত্যু অনেক আগেই ঘটেছে। সে ভদ্রলোক এখন দাহহীন অবস্থায় শকুনের খাদ্য হয়ে পড়ে আছে।

আনন্দ ॥ তুমি বোধহয় যাদু জান। নিমেষে খান খান করে দিলে আমার চক্রব্যূহ আশ্চর্য! তোমার মত শক্তিশালী খেলোয়াড় আমি কমই দেখেছি।

পলাশ ॥ ও সব বুজরুকী কথায় আমি ভুলছিনা চাঁদু। আমি খেলতে জানি।

প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে হারাতে জানি।

আনন্দ ॥ তাহলে তুমি কুকুরের মত মরেছিলে কেন?

পলাশ ॥ তখন তোমার মত বুড়বাক ছিলুম—তাই। তখন আমার মধ্যে ছিল প্রেম-ভালবাসা। আনন্দের জন্য অন্বেষণ! সুখের নিমিত্তে পরিশ্রম—সত্যের আস্বাদনে তন্ময়তা—ইত্যাদি ইত্যাদি মহত্তর বাক্যে নিজেকে বুঁদ করে রেখেছিলুম—তাই।

আনন্দ ॥ বাজী খেলায় আমি হয়ত হারব।

পলাশ ॥ আলবৎ হারবে।

আনন্দ ॥ কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস কর সারা পৃথিবীকে তুমি এই ভাবে হারাতে পারবে?

পলাশ ॥ দেখতে পাবে। কেননা আমি তখন তোমার মূর্তি গড়ব। তোমার প্রাণ দোব অনুভূতি দোব, চোখ দোব কিন্তু কণ্ঠে ভাষা দোব না! কি হল হাত যে তোমার নড়ছে না?

[আনন্দ ক্রমশ বিবর্ণ, মৃতপ্রায়। পলাশ উত্তেজিত, নৃশংস। হঠাৎ সমস্ত Music বন্ধ হয়ে যায়—এক অখণ্ড নীরবতা। আর সেই নিস্তব্ধতা খান খান করে ভেঙ্গে দিয়ে চরম উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে পলাশ—মাৎ।]

পলাশ ॥ চেয়ে দেখ শিল্পী, তোমার রণাঙ্গনের আজ কি পরিণতি। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে আছে শান্তি সেনার দল। ছোট ছোট সুখ সব অস্তমিত। বিপন্ন বিস্ময়ে শান্তি হতবাক। ভয়ে আর নিদারুণ ক্লেশে প্রেম অবহেলিত শিবিরে! সত্য তার বিশাল স্কন্ধ তুমড়ে দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক উদাসীন্যে দয়া? কোথায় তোমার দয়া।' আমার লোভের চত্বরে নিজের ঐতিহ্য দিয়েছে বিসর্জন! আর রাজা আনন্দ—বিষন্ন চিত্তে গালে হাত রেখে বিশাল স্কন্ধ সত্যের পিছনে লুকিয়ে আছে আমার ক্রোধের হাত থেকে বাঁচার আশায়। চেয়ে দেখ শিল্পী—তুমি পরাজিত। এ পাশে দুই সশস্ত্র প্রহরী ঘৃণা আর লোভ—একজন আড়াই চালের প্যাঁচে অন্যজন কৌণিক সীমানার গণ্ডীতে আটকেছে তোমার শান্তি আর শক্তিকে—ওপাশে...

আনন্দ ॥ আমি পরাজিত।

পলাশ ॥ তাহলে প্রস্তুত হও।

আনন্দ ॥ কিসের ?

পলাশ ॥ ভুলে যাবার মত মিথ্যেবাদী তুমি নিশ্চয় নও।

আনন্দ ॥ কিন্তু আমি মরে গেলে এ পৃথিবীর যে ক্ষতি—

পলাশ ॥ কিসের ক্ষতি ?

আনন্দ ॥ আমি এ পৃথিবীর সৌন্দর্য আর আনন্দের সৃষ্টি আর সাফল্যের প্রতীক।

পলাশ ॥ কিন্তু নিজের হাতেই ত এদের মৃত্যু ঘটালে—তাহলে আর নির্লজ্জের মত বাঁচার প্রত্যাশা কেন ?

আনন্দ ॥ আমার যে বাঁচার দরকার।

পলাশ ॥ তোমার সত্বর মৃত্যু পৃথিবীর আগাম পাওনা।

আনন্দ ॥ না, আমি মরে গেলে পৃথিবীর গান থেমে যাবে। শিল্পীর তুলি বন্ধ হবে। কবির ছন্দ বেতাল হবে।

পলাশ ॥ তুমি মরে গেলে—পৃথিবী স্থূল আবেগে থরথর হবে না। কল্পনার খাটে কোমল বিছানায় শুয়ে কথার ফুলঝুরী ছুটবে না—তুমি মরে গেলে পৃথিবী থেকে বাজে শব্দের জন্ম বন্ধ হবে। পৃথিবী কঠিন হবে। কাব্য ছেড়ে গদ্যের রাস্তায় পৃথিবী কঠোর হবে। নরম তুলতুলে হাতে তুলি ধরার বদলে ধরবে হাতুড়ী আর শাবল। তুমি মরে গেলে প্রেমের গান বন্ধ হয়ে নতুন বাঁচার সংগ্রামের দামামা বাজবে—

আনন্দ ॥ তাহলে তুমি বলতে চাও ফুল, পাখি, নদীর গান, ঝরণার ঝিরঝির এসবের কোন প্রয়োজন নেই ?

পলাশ ॥ সে সব অনেক পরে, তারও আগে দরকার হাতুড়ী আর বয়লারের শব্দ, বন্দরে শেকল আর মাঠে ধান ঝাড়ার ধ্বনি। ধলেশ্বরী নদীর ধারে জ্যোৎস্না রাতে আর ভাটিয়ালী নয় তার বদলে জাল ফেলার ছপাৎ শব্দ অনেক মধুর।

আনন্দ ॥ শুধু কাজ, কাজ আর কাজ, কঠিন কাজের শব্দ ?

পলাশ ॥ হ্যাঁ, খেতে না পাওয়া কান্নার শব্দ নয়—পাথর ভাঙার শব্দ চাই।

আনন্দ ॥ কিন্তু কাজের শেষে দিন ফুরোলে ঘরে ফেরার রাতে সংগীতের প্রয়োজন নেই? অজস্র কাজের পরে ঘাম ভেজা শরীর নিয়ে নদীর ধারে শীতল হাওয়ায় প্রিয় সান্নিধ্যের কোন প্রয়োজন নেই? তাহলে ত' মানুষ যন্ত্র দানবে পরিণত হবে—

পলাশ ॥ হোক। তাই হওয়ারই প্রয়োজন আজ। অনেক গান গাওয়া হয়েছে—অনেক পাখির কাকলী শোনা গেছে—অনেক শিল্প দেখে চোখ হেজে গেছে—ওসব আর ভালো লাগে না—তুমি প্রস্তুত হও—

আনন্দ ॥ তুমি এখনও ভেবে দেখ।

পলাশ ॥ (ছুরিটা তুলে নেয়) আর ভাবার কিছু নেই। ভাবনা শেষ হয়েছে অনেক দিন! সিদ্ধান্তে আর আমার কোন দ্বিধা নেই। প্রতিজ্ঞা আমার একটাই, পৃথিবী থেকে আদিকালের জঞ্জাল আমি সরাবোই—(সে ক্রমাগত আনন্দর দিকে এগিয়ে আসে আনন্দ পেছোতে থাকে) তোমার রক্তে হাত ভিজিয়ে নতুন করে শপথ নোব—প্রেম, ভালবাসা আনন্দ, শান্তি, স্নেহ এই সব বস্তাপচা বুজরুকীকে আর বেঁচে থাকতে দেওয়া যায় না—উচিতও নয়। আর সেই সব শয়তান বুজরুকদের গোঁড়া সমর্থক তুমি। তাই তোমার মৃত্যু থেকে শুরু হোক এক একটি তথাকথিত শান্তি সমর্থকদের পতন। তুমি আমার স্রষ্টা—এই হোক স্রষ্টার বিরুদ্ধে সৃষ্টির সোচ্চার প্রতিবাদ।

আনন্দ ॥ না—না— (সে Back stage-এ পেছোতে থাকে)।

পলাশ ॥ এমনি করে পৃথিবী থেকে একটি অর্থহীন জীবনের মৃত্যু হোক, জন্ম হোক আর এক নতুন পৃথিবীর আর এক নতুন অভিজ্ঞতার—

[পেছোতে গিয়ে আনন্দ একটি টেবিলের উপর পড়ে যায় আর ঠিক যেমন করে এক বিশাল শকুন তার ডানা ছড়িয়ে মৃত পশুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি করেই পলাশ তার লম্বা হাতাওয়ালা আলখাল্লা সমেত আনন্দর উপর ঝুঁকে পড়ে, ছুরি সমেত হাতটা তোলে—এবং আশ্চর্যের, সেই মুহূর্তে বহু

দূরাগত সেই ডাক, সেই বিস্তীর্ণ মাঠের পরে দাঁড়িয়ে পাগল করা একটি ডাক স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠে—প…লা…শ। প…লা…শ। পলাশের ছুরি থেমে যায়। পারে না আঘাত করতে। সেই অবস্থায় সমস্ত দৃশ্যটি নিশ্চল হয়ে যায়—! কেবল প্রতিধ্বনির মত চন্দনার কণ্ঠ পলাশের নাম ধরে ডেকে যায় প…লা…শ, প. লা…শ।

একাংক নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারে পুরস্কৃত।

নাট্যকারের ঠিকানা : ২বি, হরলাল দাস স্ট্রীট, কলিকাতা ১০০০১৪

ক্রান্তি পদযাত্রা

শ্যামলতনু দাশগুপ্ত

চরিত্র

গোপাল

অটল

কাদের

যতীন

বিশ্বেশ্বর

মেজবাবু

বিশ্বনাথ সর্দার

মেঘা

নীলকর সাহেব ও লাঠিয়ালবৃন্দ

। একটি গ্রাম্য প্রান্তর ।

[গোপালের ছুটে প্রবেশ]

গোপাল । আমি চিনতে পেরেছি—ওকে আমি চিনতে পেরেছি।

[অটলের ছুটে প্রবেশ]

অটল । ও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ওর মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

[কাদেরের প্রবেশ]

কাদের । রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে ও কি ভীষণ, কি ভয়ঙ্কর—

[যতীনের প্রবেশ]

যতীন । কে লোকটা? কেন এমন ভাবে খুন হলো? কারা এমন ভাবে খুন করলে?

গোপাল ॥ আমি লোকটাকে চিন্‌তে পেরেছি ? আমি লোকটাকে চিনতে পেরেছি ?

সমবেত ॥ কে ? কে এই লোকটা ?

গোপাল ॥ কাঙ্গাল হরিদাস।

সমবেত ॥ কাঙ্গাল হরিদাস ? [বিশ্বেশ্বরি সামন্তর প্রবেশ]

বিশ্বেশ্বর ॥ না।

সমবেত ॥ না।

বিশ্বেশ্বর ॥ না, লোকটা— [সকলের দিকে তাকিয়ে] কাহারো পরিচিত নহে। পূর্বে এমত বেক্তিকে আমরা কস্মিন কালে দর্শন করি নাই।

গোপাল ॥ না, আমি ওকে চিনেছি।

বিশ্বেশ্বর ॥ চিনেছিস্‌ !

অটল ॥ হ্যাঁ, আমাদেরও মনে হচ্ছে লোকটা কাঙ্গাল হরিদাস।

যতীন ॥ যে এক এক পয়সা করে একটা কাগজ বার করতো।

কাদের ॥ আমাদের চাষাভুষোর সুখ দুঃখের কথা লেখা থাকতো।

গোপাল ॥ জমিদার বাবুর আর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কত কথা লেখা থাকতো—

যতীন ॥ সেই কাঙ্গাল হরিদাসকে কারা যেন খুন করে ঐ পচা ডোবায় ফেলে গেছে।

বিশ্বেশ্বর ॥ কাল কাছারি বসছে।

গোপাল ॥ থানায় খবর দিতে হবে না ?

বিশ্বেশ্বর ॥ কাল কাছারি বসছে, বড়বাবু আসছেন—

যতীন ॥ এই তো গতমাসে মেজবাবু এসেছিলেন ? এক মাস না পোয়াতেই আবার বড়বাবু—

বিশ্বেশ্বর ॥ মেজবাবু তো এসেছিলেন স্ফূর্তি করতে, বড়বাবু আসছেন খাজনা নিতে।

কাদের ॥ ঘরের যা কিছু ছিল সবতো পেয়াদা দিয়ে মেজবাবু তুলে নিয়ে গেলেন। আমার চারটে মুরগী—

অটল ॥ আমার প্যাটাটা—

যতীন ॥ বলাই-এর চৌদ্দ বছরের মেয়েটাকে—

অটল ॥ শিবুর জোয়ান বৌটাকে—

কাদের ॥ সব তুলে নে গেলেন—

বিশ্বেশ্বর ॥ সে তো মেজবাবুর স্ফূর্তি করার জন্ত এবার বড়বাবু আসছেন বৎসরের খাজনা নিতে—

গোপাল ॥ কিন্তু হরিদাসের কি হবে ?

বিশ্বেশ্বর ॥ যেখানে আছে ওখানেই পড়ে থাকবে।

গোপাল ॥ সৎকার হবে না !

বিশ্বেশ্বর ॥ না।

যতীন ॥ থানায় খবর দেওয়া হবে না ?

বিশ্বেশ্বর ॥ না।

কাদের ॥ পচা গন্ধ বেরুবে।

বিশ্বেশ্বর ॥ না।

অটল ॥ লাশ পঁচলে গন্ধ বেরুবে না ?

বিশ্বেশ্বর ॥ দেশে এখনও শেয়াল শকুনের আকাল পড়েনি।

সমবেত ॥ সেকি !

বিশ্বেশ্বর ॥ ওরাই দু একদিনের মধ্যে লাশটিকে চেটেপুটে খেয়ে নেবে। তোরা ছোটলোক। ছোটলোকের মতই থাক। আগ বাড়িয়ে গাছের মগডালে উঠতে চাসনি। তবে বিপদ হতে পারে—

গোপাল ॥ একি কাণ্ড !

বিশ্বেশ্বর ॥ হ্যাঁ, এই সব কাণ্ডই ঘটবে ? কলকাতার জমিদারবাবুরা বড় সাংঘাতিক লোক। ওরা অনেক রকম কাণ্ড ঘটাতে পারে। তোরা এখনও কিছু দেখিস নি—

সমবেত ॥ দেখিনি !

বিশ্বেশ্বর ॥ কিছু শুনিস নি।

সমবেত ॥ শুনিনি।

বিশ্বেশ্বর ॥ কিছু বুঝিস নি।

সমবেত ॥ বুঝিনি !

বিশ্বেশ্বর ॥ কাউকে চিনিস নি।

সমবেত ॥ চিনিনি!

বিশ্বেশ্বর ॥ কাল বড়বাবু কাছারীতে আসছেন। মনে রাখিস কাল বড়বাবু কাছারীতে আস্‌ছেন। মনে রাখিস, কাল বড়বাবু কাছারীতে আসছেন।

[প্রস্থান]

সমবেত ॥ একি, অন্যায় কাণ্ড!

যতীন ॥ বড়বাবু আসছেন।

কাদের ॥ কাছারীতে আসছেন।

গোপাল ॥ বড়বাবু কাছারীতে আসছেন।

কাদের ॥ এটা আমাদের ভয় দেখাবার জন্য হঠাৎ কাছারীতে বড়বাবু আসছেন।

গোপাল ॥ আমরা সব বুঝি কিন্তু—

অটল ॥ করার কিছু নেই।

যতীন ॥ ঐভাবে একজন মানুষের দেহটা উপুড় হয়ে পড়ে থাকবে?

কাদের ॥ শিয়াল শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে নিসাড় লাশটাকে?

গোপাল ॥ যে আমাদের দুঃখে কাঁদতো।

অটল ॥ যে জমিদারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা কইরে আমাদের লড়াই করতি বল্‌তো।

যতীন ॥ যে বলতো জমি ধান আমাদের।

কাদের ॥ জমিদারের নয়।

অটল ॥ ও ছিল আমাদের বন্ধু—

যতীন ॥ আমাদের আত্মীয়।

কাদের ॥ আমাদের স্বজন।

গোপাল ॥ আমাদের বন্ধু, আমাদের আত্মীয়, আমাদের স্বজন—

অটল ॥ আর তার দেহ সৎকার না-হয়ে ঐখানে পচা ডোবায় পড়ে থাকবে?

সমবেত ॥ না। (বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ)

বিশ্বেশ্বর ॥ একটা কথা তোদের স্মরণ করিয়ে দিতে এলাম।

অটল ॥ কি কথা!

বিশ্বেশ্বর ॥ ঐ মৃতদেহের সম্বন্ধে আর কাউকে কোন কথা বলবি না। তোরা কিছু দেখিস নি, তোরা কিছু জানিস না। যদি এই কথা পাঁচ কান হয় তবে তোদেরও মৃতদেহগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে।

গোপাল ॥ আপনি কেন আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন? একজন মানুষ নৃশংসভাবে খুন হয়েছে আর আপনারা সমস্ত ঘটনা লুকোতে চাইছেন কিন্তু কেন—কেন—কেন?

সমবেত ॥ কেন—কেন—কেন?

বিশ্বেশ্বর ॥ (প্রচণ্ড হাসতে থাকে) হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অটল ॥ এতে হাসির কি আছে?

যতীন ॥ আমরা ঐ দেহ তুলে নিয়ে আসবো।

কাদের ॥ ওকে আমরা সম্মান দিয়ে সৎকার করবো।

গোপাল ॥ মরার সৎকার না-করা পাপ।

বিশ্বেশ্বর ॥ লাঠিয়াল—

সমবেত ॥ লাঠিয়াল! (বাদ্যধ্বনি)

বিশ্বেশ্বর ॥ মেজবাবু লাঠিয়াল নিয়ে এখানে পাহারা দিচ্ছে। যে ঐ মৃতের কাছে যাবে কিংবা ওর কোন সৎকার করবার চেষ্টা করবে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হবে।

গোপাল ॥ কারণ?

বিশ্বেশ্বর ॥ জানি না।

যতীন ॥ মৃতের সৎকার না করা হিন্দুমতে পাপ।

বিশ্বেশ্বর ॥ কি করে জানলি?

যতীন ॥ আপনিই তো আমাদের এই বিধানই এতদিন দিয়ে এসেছেন। আপনিই তো সমাজের শিরোমণি।

অটল ॥ বাবুর কাছারী নায়েব।

বিশ্বেশ্বর ॥ নায়েব নয় রে মুখ্যু এস্টেটের ম্যানেজার।

অটল ॥ ওসব ইংজিরি আমাদের আসে না।

বিশ্বেশ্বর ॥ সময়-বেশি নেই—আমি চলি—তোদের সাবধান করে গেলাম। যদি নিজের জীবনের প্রতি সামান্য করুণা থাকে তবে ঐ ভয়ংকর কাজ

করতে যাস নি। মৃতদেহ যেখানে আছে ঐখানেই থাক। (বাজধ্বনি) ঐ লাঠিয়ালদের দুন্দুভিনাদ শোনা যাচ্ছে। ওরা মানুষ মারায় সিদ্ধহস্ত—যেমন কসাই প্যাটা খাসি নির্দ্বিধায় গলা চোপায় ঠিক ওরাও মানুষের গলা কাটতে পারে। ওদের বাবুরা কাশী থেকে আমদানী করেছে। অতএব তোরা সাবধানে থাকিস।

কাদের ॥ একটা মড়াকে এত ভয় কিসের ?

বিশ্বেশ্বর ॥ ভয় নয়।

অটল ॥ ভয় নয় তবে এত লাঠিয়াল দিয়ে পাহারা দেবার দরকার কি ?

বিশ্বেশ্বর ॥ তোরা কি কৈফিয়েত চাস নাকি ?

গোপাল ॥ কৈফিয়েত নয়। আমরা বুঝতে পারছি না।

বিশ্বেশ্বর ॥ বুঝে কি হবে। তোদের কি মাঠের ধান গোলায় উঠবে। যা, যেমন আছিস তেমন থাক নইলে ঘরবাড়ি জ্বলে যাবে। মাঠের ধান কেটে নেওয়া হবে—অন্ধকূপের অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হবে।

অটল ॥ কেন ?

বিশ্বেশ্বর ॥ এটা আমার নয় বাবুদের হুকুম। একবার যদি বাবু তোদের এইসব কথা জানতে পারে তবে সমস্ত গ্রাম আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেবে। শ্যামচাঁদের ঘায়ে পিঠের চামড়া খুলে নেবে। যা, নিজের গ্রামে, নিজের ঘরে, বৌ ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যা। আমি চলি, মনে থাকে যেন কাল কাছারী বসছে। (প্রস্থান)

যতীন ॥ চল, আমরা ফিরেই যাই। কি দরকার বল আমাদের।

গোপাল ॥ না।

কাদের ॥ না—তুই কি করতে চাস ?

গোপাল ॥ আমি এ মড়াটাকে তুলে সৎকার করবো।

কাদের ॥ অ্যাঃ, কি ভয়ঙ্কর কাজ তুমি করতে চাও।

অটল ॥ তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শুনলি না, যদি ঐ মড়াকে কেউ ছোঁয় তবে তাকে মরতে হবে।

গোপাল ॥ মরতে হয় মরবো। কিন্তু আত্মীয়ের মড়া দাহ না করে শেয়াল শকুন দিয়ে খাওয়াতে পারবো না।

যতীন ॥ আমি পারবো না। আমি পারবো না। কয়েক দিন আগে মেজবাবু এসেছিলেন এখনও গাঁয়ের লোকের চোখের জল শুকোয় নি। আমি চলি, আমি তোমাদের সঙ্গে নেই। [প্রস্থান উদ্যত]

গোপাল ॥ দাঁড়াও—

যতীন ॥ না, আমায় ডেকোনা।

গোপাল ॥ আমি যদি একা এই কাজ করি তোমরা তাহলেও বাঁচবে না। ওদের আক্রোশ সমস্ত গাঁয়ের লোকের উপর এসে পড়বে।

কাদের ॥ তুমি আমাদের এক সঙ্গে সকলকে বিপদে ফেল্‌তে চাও।

গোপাল ॥ কাউকে বিপদে ফেলা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই ঐ দেহটাকে সৎকার করতে, যে আমাদের জন্য এত করেছে তার জন্য আমরা এইটুকু করতে পারবো না।

অটল ॥ এই কাজের জন্য মরতে হবে।

গোপাল ॥ মরবো। আমাদের জন্যইতো কাঙ্গাল হরিদাস জীবন দিয়েছে। আর আমি তার দেহটাকে ঠিকমত সম্মান দিয়ে সৎকার করতে পারবো না।!

কাদের ॥ একটি লাশের জন্য বাঁচা লোক জীবন দেবে!

গোপাল ॥ হ্যাঁ দেবে, যদি তার মড়া আকাশের চেয়ে বড় হয়। এ কথা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছো। কারা তাকে খুন করেছে? কেন খুন করেছে?

যতীন ॥ বুঝে আমরা কি করতে পারি? শুধু শুধু বিপদ ডেকে এনে কোন লাভ আছে?

গোপাল ॥ তোমরা হয়তো পারো না, আমি পারি এবং আমি যা ভেবেছি তাই করবো।

অটল ॥ ওরা লাঠি বর্শা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। তুমি ওদের চোখের সামনে থেকে দেহটাকে তুলে আনতে পারবে?

গোপাল ॥ পারবো।

অটল ॥ কেমন করে।

গোপাল ॥ যেমন করে শৃগাল অন্ধকারে মড়া টেনে নিয়ে যায় ঠিক তেমন করে আমি রাতের অন্ধকারে ওকে টেনে নিয়ে আসবো।

যতীন ॥ তোমার এই কাজের ফল ভোগ করবে সমস্ত গ্রাম। আমাদের বৌ ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত তোমার এই কাজের জন্ত বিপদে পড়বে। তাদেরও ওরা আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ঝলসে মেরে ফেলবে।

গোপাল ॥ আমারও বৌ ছেলে মেয়ে আছে।

কাদের ॥ দোহাই, তুমি এ কাজ করো না। ঐ নিরাপরাধ অসহায় মানুষগুলোকে তুমি এমন ভাবে মেরে ফেলো না। আল্লার কসম, তুমি এ কাজ করো না। ওরা মরবার আগে তোমাকে অভিশাপ দিয়ে মরবে।

অটল ॥ ভগবানের নামে তোমায় বলছি তুমি থামো। আচ্ছা, তুমি কি বুঝতে পারছো না কতবড় সর্বনাশ করতে চাইছো।

গোপাল ॥ তোমরা হাজার কিছু বল্লেও আমি যা করতে চাইছি তাই করবো। যদি ভয় পাও তোমরা জঙ্গলে পালিয়ে যাও। মনে রেখ, জঙ্গলে তান্ত্রিক সাধকরা আছে তারা তোমাদের পেলে নরবলির জোয়ার বইয়ে দেবে।

যতীন ॥ তুমি আমাদের কথা শুনবে না?

গোপাল ॥ না।

যতীন ॥ তোমার মাথায় ভূত চেপেছে।

অটল ॥ বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমার ভূত আমি ছাড়িয়ে দেবো।

গোপাল ॥ কি করবে?

অটল ॥ একটা গোটা গাঁ বাঁচাতে আমরা তোমায় মেরে ফেলবো।

গোপাল ॥ কাউকে মারতে গেলে সাহস লাগে।

যতীন ॥ চলো, আমাদের সঙ্গে গাঁয়ে ফিরে চলো।

গোপাল ॥ না; আমি যাবো না।

কাদের ॥ জোর করে আমরা গাঁয়ে নিয়ে যাবো। আমাদের এত বড় সর্বনাশ তোমাকে কিছুতেই করতে দেবো না।

যতীন ॥ যদি বেগরবাই করো তবে তোমাকে খুন করে এখানে ফেলে রেখে যাবো।

গোপাল ॥ এতই যদি তোমাদের সাহস থাকে তবে আমাকে খুন না করে, স্বজন, বন্ধু খুন না করে শত্রুকে বধ করো না।

কাদের ॥ কে শত্রু ?

গোপাল ॥ বড়বাবু, মেজবাবু।

অটল ॥ সর্বনাশ। কি সব বলছো তুমি আজ ?

যতীন ॥ তোমার নিশ্চয়ই ঐ হরিদাসের ভূত ভর করেছে। তোমায় ভূতে পেয়েছে।

অটল ॥ হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। চলো ওকে আমরা ওঝার কাছে নিয়ে যাই।

যতীন ॥ ভূতে ধরলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ওঝা ঝেড়ে দিলে ওর ঘাড় থেকে ভূত নামবে।

কাদের ॥ চলো, আমরা গাঁয়ে যাই।

গোপাল ॥ তোমরা গাঁয়ে ফিরে যাও। আমি যাবো না।

অটল ॥ তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে।

যতীন ॥ তুমি এখানে থাকলে হঠাৎ কি করে ফেলবে ঠিক নেই।

গোপাল ॥ আমি ঐ একটা কাজই করবো।

কাদের ॥ তোমাকে কোন কাজই করতে দেবো না।

গোপাল ॥ আমায় আজ কেউ বাধা দিতে পারবে না।

অটল ॥ তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে কিনা ?

গোপাল ॥ আমি যেতে পারি না।

অটল ॥ তোমায় যেতেই হবে।

যতীন ॥ আমরা জোর করে তোমাকে নিয়ে যাবো।

[দূরে লাঠিয়ালদের চিৎকার—ও-ও-ও-হাঃ।]

কাদের ॥ ঐ যে লাঠিয়ালদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

অটল ॥ চলো, আমরা যাই। দেরি করা ঠিক হবে না।

যতীন ॥ হ্যাঁ, আমার বুকটা ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

গোপাল ॥ যাদের বুক কাঁপে তারা ফিরে যাক। আমি যাচ্ছি না।

অটল ॥ যতীন।

যতীন ॥ বলো ?

অটল ॥ কাদের।

কাদের ॥ বলো ?

অটল ॥ ধরো ওকে—

[ওরা এক সঙ্গে এগিয়ে যায়। ওদের সঙ্গে গোপালের টানা-হেঁচড়া মারামারি লেগে যায়। এক সময় গোপাল ওদের হাত থেকে পালিয়ে যায়। ওরা এক সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে ওর পেছনে ছুটে যায়। মাদল হুম হুম বেজে উঠে। লাঠিয়ালদের প্রবেশ। মাদলের তালে ভয়ঙ্কর লাঠিনৃত্য। লাঠিনৃত্যের শেষে ওদের প্রস্থান মেজবাবু'র প্রবেশ।

মেজবাবু ॥ বোঁ বন্ বন্ সেঁা সন্ সন্ ভোঁপ্‌পো ভোঁপপো ভোঁ
ছোটে ছটাছট্‌ লে ঝটাপট্‌ মারতে হবে ছোঁ
বো বন্ বন্ সেঁা সন্ সন্ ভোঁপপো ভোঁপপো ভোঁ
ছোটে ছটাছট লে ঝটাপট্‌ মারতে হবে ছোঁ

(বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ)

বিশ্বেশ্বর ॥ মেজোবাবু,

মেজবাবু ॥ কে বাবা তুমি মৈনাক।

বিশ্বেশ্বর ॥ না, আমি বিশ্বেশ্বর।

মেজবাবু ॥ রামধন নায়েব।

বিশ্বেশ্বর ॥ রামধন নয়, বিশ্বেশ্বর।

মেজবাবু ॥ ও বিশ্বেশ্বর। তা কি খবর ?

বিশ্বেশ্বর ॥ সর্বনাশ হয়ে গেছে। গাঁয়ের চারজন লোক হরিদাসের লাশ দেখতে পেয়েছে। তারা মনস্থ করেছে, হরিদাসের দেহ তুলে নিয়ে ঘটা করে সৎকার করবে ?

মেজবাবু ॥ কি, সৎকার করবে ?

বিশ্বেশ্বর ॥ তারা আরও বলছে যে থানায় যেয়ে খবর দেবে।

মেজবাবু ॥ থানায় যেয়ে কোন লাভ নেই। হরিদাসের ব্যাপার আমরা আগেই থানায় জানিয়ে রেখেছি। বাবাঃ, এর পেছনে তামাম বড় বড়

লোক আছে। তারা গনিয়ার রামনারায়ণ নাগ। নদরপুরের গুরুপ্রসাদ রায়, খোড় বড়িয়ার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরডাঙার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। হেঃ, হেঃ ইয়ার্কি নয়।

বিশ্বেশ্বর ॥ কিন্তু কথা ওটা নয়।

মেজবাবু ॥ তবে আর কি কথা আছে বাবা।

বিশ্বেশ্বর ॥ কথা হচ্ছে হরিদাসের লাশ পাওয়া গেলে সব জানাজানি হয়ে যাবে না।

মেজবাবু ॥ হুঁ, সেটা একটা ভয়ের কথা বটে। তবে লাশ তুলবে কে? আমাদের সেরা লাঠিয়ালরা লাশ আড়াল থেকে পাহারা দিচ্ছে। যে লাশের দিকে এগুবে ওকে ঐখানেই জমি নিতে হবে। তোমার কোন ভয় নেই রামধন—

বিশ্বেশ্বর ॥ রামধন নয় বিশ্বেশ্বর।

মেজবাবু ॥ ও বিশ্বেশ্বর—তোমার কোন ভয় নেই বাবা। ও লাশ যমে এসেও নিতে পারবে না।

বিশ্বেশ্বর ॥ ওরা অনেক চোরা পথ জানে। এই বুনো জায়গায় যদি কোন উপায়ে ওরা লাশ নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে তবে কারো বাপের ক্ষমতা নেই ওদের ধরতে পারে।

মেজবাবু ॥ বাঃ বাঃ তুমি তো বেশ ভাবতে পারো, রামধন—

বিশ্বেশ্বর ॥ তারপর ধরুন, ঐ লাশ নিয়ে যদি সদরে যেয়ে পৌঁছয় তবে বিপদ হতে পারে।

মেজবাবু ॥ কেন, বিপদ হবে কেন? হেঃ, হেঃ ওরা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবে মহতী, ছাতুবাবু, নবীনবাবু এরা সকলে মিলে মানুষ খুন করেছে?

বিশ্বেশ্বর ॥ অত নিশ্চিন্তে থাকা কি ঠিক হবে, মেজবাবু?

মেজবাবু ॥ কেন, আমাদের তবে কি করতে হবে?

বিশ্বেশ্বর ॥ ঐ চারজনকে ধরে কাছারী বাড়ির অন্ধকূপে বন্দী করে রেখে দিলে বাইরের কাকপক্ষী পর্যন্ত জানতে পারবে না। কাঙাল হরিদাস চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে।

মেজবাবু ॥ ঐ চারজন কেন, সমস্ত গ্রামটাই কয়েকদিনের মধ্যে হারিয়ে যাবে, বাবাঃ।

বিশ্বেশ্বর ॥ সমস্ত গ্রাম হারিয়ে যাবে! আপনার কথার অর্থ কি?

মেজবাবু ॥ আছে, আছে একটা অর্থ আছে।

বিশ্বেশ্বর ॥ আমি কিন্তু কিছু বুঝিনি।

মেজবাবু ॥ কিছু বোঝনি?

বিশ্বেশ্বর ॥ আজ্ঞে না।

মেজবাবু ॥ বড়বাবু আসছেন কেন জানেন?

বিশ্বেশ্বর ॥ খাজনা নিতে।

মেজবাবু ॥ কি খাজনা?

বিশ্বেশ্বর ॥ সালতামামির খাজনা ॥

মেজবাবু ॥ না।

বিশ্বেশ্বর ॥ তহুরি খাজনা।

মেজবাবু ॥ না।

বিশ্বেশ্বর ॥ বরদরী খাজনা।

মেজবাবু ॥ না।

বিশ্বেশ্বর ॥ (এক নিঃশ্বাসে) তাঁত কর, বাই কর, মাথুর কর, সন্তন কর, অক্কেরা কর, বারুণী কর—

মেজবাবু ॥ থাম-থাম। বাবা রামধন, তুমি কিস্সু জানোনা।

বিশ্বেশ্বর ॥ তবে!

মেজবাবু ॥ বড়বাবু আসছেন নীলকর সাহেবদের জমি পত্তন দিতে।

বিশ্বেশ্বর ॥ নীলকর সাহেবদের জমি পত্তন দেবেন।

মেজবাবু ॥ হ্যাঁ, এ অঞ্চলে এখন থেকে নীল চাষ হবে—নীলকর সাহেবরা আসবেন—নীলকুঠি তৈরী হবে—অন্ধকূপ—হত্যা—হাহাকার—কান্না আর মৃত্যু—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[নেপথ্যে গান—দামামা ধ্বনিসহ—"নীল বানরে সোনার বাঙলা করল এবার ছারখার / অসময়ে হরিশ মলো লঙের হলো কারাগার।"]

মেজবাবু ॥ এবার বোঝ রামধন নায়েব কি দারুন ঘটনাটা জমবে।

বিশ্বেধর ॥ আমার নাম রামধন নয় হুজুর, আমার নাম বিশ্বেধর।

মেজবাবু ॥ চলি—(গান গাইতে গাইতে প্রস্থানোদ্যত) চলি, আমার আবার অনেক কাজ—

"যত সব ছুঁড়িগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে
এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে।"

[বদ্ধ উন্মাদ বলাই সামনে এসে দাঁড়ায় বিকট ভাবে হাসতে থাকে। মেজবাবু ভয়ে ষ্টেজের এপাশে চলে আসে]

মেজবাবু ॥ একে ? একে, বিশ্বেধর ?

বলাই ॥ আমায় চিনতে পারছো না, বাবাজীবন ?

মেজবাবু ॥ বাবাজীবন !

বলাই ॥ হ্যাঁ গো—তুমিতো আমার আদরের জামাই।

মেজবাবু ॥ জামাই ! এই ভিখারিটা আমার শ্বশুর ! বিশ্বেধর এ পাগলটা বলে কি ?

বিশ্বেধর ॥ (আতঙ্কে) এ বলাই মণ্ডল হুজুর—এ বলাই—

মেজবাবু ॥ কোন বলাই ?

বিশ্বেধর ॥ গেল মাসে যার চৌদ্দ বছরের ছুঁড়িটাকে তুলে এনেছিলেন।

মেজবাবু ॥ সর্বনাশ। এর এরকম হলো কেন ?

বিদ্যেধর ॥ বোধহয় মেয়ের শোকে পাগল হয়ে গেছে।

মেজবাবু ॥ হুঁ, কিন্তু বিপদ হলো পাগলদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

বলাই ॥ বাবাজীবন, আমি যে মেয়েকে নিতে এয়েচি। অনেকদিন বাপের বাড়ি যায়নি। মেয়ের মা বড় মন কষ্টে আছে। অনেক দিন তার বড় আদরের মেয়েকে চোখে দেখেনি। আমি এক্ষুনি তাকে নিয়ে যাবো।

মেজবাবু ॥ সেতো এখন সোনাগাছিতে আছে—না মানে আমি তোমার জামাই নই তুমি ভুল করছো—

বলাই ॥ ভুল—ভুল—ভুল— না, না, আমার ভুল হয়নি। পাল্কি বেয়ারা

নিয়ে গেল—মশাল জ্বালিয়ে চারদিকে আলো করি আমার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এলে।

মেজবাবু ॥ বিদ্যেধর—ও বিদ্যেধর।

বিদ্যেধর ॥ এজ্ঞে, হুজুর—

মেজবাবু ॥ একে একটু বোঝাও।

বিদ্যেধর ॥ কি বোঝাবো হুজুর?

মেজবাবু ॥ যা হয় কিছু বোঝাও?

বলাই ॥ আমি কিন্তু মেয়েকে না নিয়ে আজ কিছুতেই যাবো না।

বিদ্যেধর ॥ (এগিয়ে আসে) কাকে নিয়ে যাবে বলাই, কাকে নিয়ে যাবে?

বলাই ॥ আমার মেয়েকে গো—আমার মেয়েকে—

বিদ্যেধর ॥ তোমার মেয়ে এখানে তো নেই।

বলাই ॥ হ্যাঁ আছে—ঐ তো আমার জামাই।

বিদ্যেধর। ও তোমার জামাই হতে যাবে কেন? ইনি হচ্ছেন আমাদের মেজবাবু।

বলাই ॥ তোমাদের মেজবাবুই তো আমার জামাই।

বিদ্যেধর ॥ চুপ কর। মেজবাবু তোর জামাই।

বলাই ॥ ধমকাচ্ছো কেন? আচ্ছা তোমার কথাই মেনে নিলাম। তোমাদের মেজবাবু আমার জামাই নয়।

বিদ্যেধর ॥ তবে তো কথা ফুরিয়েই গেল। এখন পথ থেকে সরে দাঁড়া আমাদের যেতে দে।

বলাই ॥ কথা ফুরোবে কেন? জামাই ফুরিয়ে গেল—

বিদ্যেধর। আবার কি কথা রইলো—

বলাই ॥ রইলো—

বিদ্যেধর ॥ কি কথা রইলো।

বলাই ॥ আমার মেয়ে ক্ষেত্রমণির কথা। তাকে তোমরা ফেরৎ দিয়ে দাও।

বিদ্যেধর। সে এখানে নেই।

আছে। যদি ফিরে আজ না পাই তবে তোমাদের যাওয়ার সব পথ আমি বন্ধ করে দেবো। দাও-দাও—

বিশ্বেশ্বর ॥ পাগলামী করিস না বলাই।

বলাই ॥ আমি খুকির মা'কে আজ কথা দিয়ে এসেছি তার মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে আনবো। মেয়ে না পেলে আমি তোমাদের ছাড়বো না। এই ছাখ, আমি একটা ছোরা নিয়ে এসেছি।

[কোমর থেকে ছোরা বার করে।]

মেজবাবু ॥ সর্বনাশ—বিশ্বেশ্বর—ওকি খুন করবে নাকি! তুমি শীঘ্র লাঠিয়াল ডাক।

বলাই ॥ দিন আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন। দিন—

[একটু করে এগিয়ে আসে ওরা একটু একটু পিছিয়ে যায়।]

বিশ্বেশ্বর ॥ বলাই বাবা এসব করতে নেই বাবা তুই থাম—

মেজবাবু ॥ একি বিপদে পড়লাম—

বলাই ॥ আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন। আমার বড় আত্নরে মেয়ে বাবু। আমার বড় আত্নরে মেয়ে।

বিশ্বেশ্বর ॥ ছিঃ ছিঃ বলাই এসব করতে নেই।

বলাই ॥ আমি একটা কথাই শুনতে চাই। আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন।

মেজবাবু ॥ পৈতৃক প্রাণটা আজ বেঘোরে গেল।

বলাই ॥ দিন-দিন-দিন। কি, দেবেন না তবে—

[কাছে এগিয়ে এসে ছোরা উঁচিয়ে ধরে। মেজবাবু চিৎকার করে উঠে।]

মেজবাবু ॥ বাঁচাও—[তিন জনে ফ্রিজ।]

বিশ্বেশ্বর ॥ দেবো ফিরিয়ে দেবো।

বলাই ॥ দেবে?

বিশ্বেশ্বর ॥ নিশ্চয় ফিরিয়ে দেবে শশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যাবে এতে আর কি আছে।

বলাই ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক বলেছো শশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যাবে!

বিশ্বেশ্বর ॥ আজই নিয়ে যেও।

বলাই ॥ আজই যাবে ?

বিশ্বেশ্বর ॥ এক্ষুনি যাবে।

বলাই ॥ এক্ষুনি যাবে ?

বিশ্বেশ্বর ॥ অবশ্যই।

বলাই ॥ আমার সোনার সংসার মেয়ে বিনা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে, বাবু। মেয়ে ফিরে গেলে আবার সংসার গড়ে উঠবে। আমি ধান ঝাড়বো, মেয়ে গাই দুইবে, বৌ ঢেঁকি কুটবে। আমার সংসার আবার সুখে ভরে উঠবে। ফিরিয়ে দিন বাবু—ফিরিয়ে দিন—

বিশ্বেশ্বর ॥ শোন এদিকে আয়—

বলাই ॥ আজ আমার কি আনন্দ, আজ আমার কি সুখ, আজ আমার কত খুশী।

বিশ্বেশ্বর ॥ এদিকে আয় শোন—

বলাই ॥ বল্ কি বল্‌ছো। (এগিয়ে যায়)

বিশ্বেশ্বর ॥ তোর মেয়ে সোনার প্রতিমার মত না রে ?

বলাই ॥ এজ্ঞে বাবু সোনার লক্ষ্মীর মত।

বিশ্বেশ্বর ॥ আমিও তো তাই বলি।

[বলাই বিনয়ে হাসে ইঠাৎ বলাইকে ধরে ওর ছুরি কেড়ে নেয়। মেজবাবু ওকে পেটে এক লাথি মারে। বলাই ছিটকে পড়ে।]

মেজবাবু ॥ শালা, আমি তোর জামাই ! (আবার মারে)

বলাই ॥ একি, আমায় মারছো কেন ? আমায় মারছো কেন ?

মেজবাবু ॥ আমার শ্বশুর মশাই। তোর মেয়েকে যে একরাত ঘরে তুলেছিলাম এ তোর সাত জন্মের ভাগ্যরে গু খেকোর ব্যাটা।

বিশ্বেশ্বর ॥ আর দেরি করবেন না, মেজবাবু তাড়াতাড়ি চলেন।

মেজবাবু ॥ হ্যাঁ চলো—তোমার বুদ্ধি আছে রামধন, তোমার বুদ্ধি আছে।

বিশ্বেশ্বর ॥ আমার নাম রামধন নয় মেজবাবু আমি শ্রীবিশ্বেশ্বর।

মেজবাবু ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে এখন চলো—

(উভয়ের প্রস্থান)

[অতি কষ্টে বলাই উঠে দাঁড়ায়। নির্বাক, নিঃশব্দে মঞ্চের সামনে ধীরে এগিয়ে এসে হঠাৎ চিৎকার করে উঠে।]

বলাই ॥ খু—কি। ক্ষেতু—সোনার লক্ষী প্রতিমা— [বাঁশির সুর]

[নেপথ্যে নারী কণ্ঠ—বাবা, মুই যাবো না—বাপ মুই যাবো না। কান্না]

বলাই ॥ (চরম চিৎকার করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে) খু—কি—ক্ষেতু—সোনার লক্ষী প্রতিমা— [প্রস্থান]

[ছুটিয়া কাদেরের প্রবেশ]

কাদের ॥ কোথাও পেলাম না—গোপালটা কোথায় পালালো—

[যতীনের প্রবেশ]

যতীন ॥ পেয়েছো—পেয়েছো ?

কাদের ॥ না।

যতীন ॥ আমিও খুঁজে পেলাম না। [অটলের প্রবেশ]

অটল ॥ পেয়েছো··পেয়েছো ?

যতীন ॥ না, আমরা পাইনি। তুমি ?

অটল ॥ আমিও খুঁজে পেলাম না।

কাদের ॥ কিন্তু ওকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। যদি ওকে খুঁজে না পাই তবে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

যতীন ॥ কিন্তু কোথায় পালালো বলতে পারো ? আমাদের চোখের সামনে থেকে লোকটা হাওয়া হয়ে গেল।

অটল ॥ উড়ে তো আর যেতে পারে না। নিশ্চয় এখানেই কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। আর আমরা চলে গেলেই ও নিজের কাজ করতে শুরু করবে।

কাদের ॥ আমি ভাবতে পারছি না। ঐ দিকে বড়বাবু আবার কাছারীতে আসছেন ঘরে যে ক'মন ধান আছে তা তুলে দিতে হবে আর এদিকে গোপালটা কি পাগলামো শুরু করলে। আর ভালো লাগে না। ইচ্ছে করে, নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে সব শেষ করে দিই।

অটল ॥ আমারও ভাই ইচ্ছে করে কিন্তু ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে পারি না—কিছুতেই পারি না।

যতীন ॥ এখানে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করলে তো চলবে না আমাদের একটা উপায় তো বার করতে হবে।

কাদের ॥ উপায় একটা আছে।

অটল ॥ উপায় আছে। বলো, কি উপায়—

কাদের ॥ শোন, আমরা দলবেঁধে বড়বাবুর কাছে যাই।

যতীন ॥ বড়বাবুর কাছে যেয়ে কি লাভ ?

কাদের ॥ কথাটা সম্পূর্ণ শোন—

অটল ॥ বল্, বল্ কি বলতে চাও ?

কাদের ॥ আমরা বড়বাবুর কাছে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলি।

যতীন ॥ কি বৃত্তান্ত বলবে ?

কাদের ॥ সব পরিষ্কার খোলাখুলি বলবো। বল্‌বো যে, গোপাল এসব করতে চায় আমরা এর মধ্যে নেই।

অটল ॥ তারপর—

কাদের ॥ তারপর বড়বাবু বুঝবেন যে এসব কাজের মধ্যে আমরা নেই। যদি কোন ঘটনা ঘটে বড়বাবু আমাদের কিছু করবেন না। আমরা বেঁচে যাবো।

অটল ॥ আর গোপালের কি হবে ?

কাদের ॥ গোপালের ব্যাপার গোপাল বুঝবে। সে তো আমাদের কোন কথা না শুনে নিজেই সব ঝুঁকি নিচ্ছে।

যতীন ॥ আমরা না হয় বেঁচে গেলাম কিন্তু বড়বাবু গোপালকে তো ছাড়বে না। গোপালকে পিষে মেরে ফেল্‌বে, তখন—

কাদের ॥ তখন ?

অটল ॥ তখন আমরা কি হাততালি বাজিয়ে মজা দেখবো ?

কাদের ॥ না।

অটল ॥ গোপালের বৌ ছেলে মেয়েরা যখন বুক চাপড়ে কাঁদবে আমরা ওদের দিকে তাকাতে পারবো ? ওরা আমাদের দিকে আঙুল

দেখিয়ে বল্‌বে এই বেইমানদের জন্য আমার বাবা মারা গেছে। তখন—

কাদের ॥ না, না—

অটল ॥ তবে ?

কাদের ॥ আমি ভাই এত কথা ভাবিনি। শুধু নিজের কথাই ভেবেছি—শুধু নিজের কথাই ভেবেছি। আমায় তোমরা ক্ষমা করে দাও। আমায় তোমরা ক্ষমা করে দাও।

যতীন ॥ কিন্তু এখন আমরা কি করবো ?

অটল ॥ আমরা গোপালকে এই জঙ্গলে খুঁজে বেড়াবো। চলো, খুঁজি—নিশ্চয়ই আমরা গোপালকে খুঁজে পাবো। ও মরাদেহটার আশেপাশেই থাকবে। চলো—

কাদের ॥ চলো—

[ওরা ডাকতে ডাকতে প্রস্থান গো-পা-ল, গো-পা-ল, গো-পা-ল। পেছনে উঁচু জায়গায় গোপালকে দেখা যায়। মাথায় গামছা বাধা, হাতে লাঠি]

গোপাল ॥ চারদিকে হায়নার মত লাঠিয়ালরা দেহটাকে পাহারা দিচ্ছে। আমায় রাতের অন্ধকারে ঐ বিরাট মানুষের মরাদেহটাকে তুলে আনতে হবে। ওদের পাহারা ক্রমেই জোরদার হচ্ছে ! ওদের দেখে মনে হচ্ছে ওরা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠছে। ওরা কি আমার ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছে। কি করে জানতে পারবে ? কাদের, অটল, যতীন ওরা কি সব বলে দিল ? যদি বলে দিয়ে থাকে তবে সর্বনাশ। দেহটার তো সৎকার হবেই না উল্টে আমার জীবনটা যাবে।

[হঠাৎ দুপাশ থেকে ঝাকড়া চুল, লাল ফিতে বাঁধা—চওড়া গোঁফ দুজন লোকের প্রবেশ। ওরা গোপালের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠে। ভয়ার্ত সঙ্গীত।]

প্রথম লোক ॥ খবরদার, পালাবার চেষ্টা করলে এক গুলিতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।

গোপাল ॥ না, না, পালাবো না। দোহাই, গুলি করো না।

দ্বিতীয় লোক ॥ নীচে নেমে আয়, নেমে আয় তাড়াতাড়ি কর।

[গোপাল ভয়ে নীচে নেমে আসে]

প্রথম লোক ॥ কেঁ তুই ? জমিদারের লাঠিয়াল—

গোপাল ॥ আমি গোপাল মণ্ডল। জমিদারের লাঠিয়াল নই।

দ্বিতীয় লোক ॥ জমিদারের লাটিয়াল না হলে ওর উপর উঠে কাকে পাহারা দিচ্ছিলি।

প্রথম ॥ চোখ দুটো তুলে নেব--সত্যি বল ?

গোপাল ॥ বিশ্বাস করুন, আমি জমিদারের লাঠিয়াল নই।

প্রথম ॥ মেঘা, এ সত্যি কথা সহজে বলবে না। এর পেটে একটা এক গজ ছুরি ঢুকিয়ে দে।

গোপাল ॥ আমি—আমি ঐ গাঁয়ে থাকি। জমি চাষ করি, আমি গেরস্থ—

দ্বিতীয় লোক ॥ গেরস্থ তবে ওর উপর উঠে চারদিকে কি দেখছিলি ?

গোপাল ॥ জমিদারের লাঠিয়ালদের।

প্রথম ॥ কেন ?

গোপাল ॥ ওরা ঐ ডোবাটার চারদিকে পাহারা দিচ্ছে।

দ্বিতীয় ॥ পাহারা দিচ্ছে তাতে তোর কি ?

প্রথম ॥ বড় আজে বাজে বকছে মেঘা।

গোপাল ॥ আজে বাজে নয়, সত্যি ঘটনা।

দ্বিতীয় ॥ বাজে কথা নয়তো তাড়াতাড়ি সত্যি কথা বল্ নইলে—

গোপাল ॥ বলছি, আগে তোমরা কে বল ?

প্রথম ॥ আমাদের পরিচয় জেনে কি হবে ?

গোপাল ॥ পরিচয় জানতে পারলে সব সত্যি বলা যায়।

প্রথম ॥ ভয় হচ্ছে ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ—ওখানে একটা মড়া পড়ে আছে না, তোমরা কে আগে বলো ?

প্রথম ॥ মড়া! কার মড়া দেহ?

গোপাল ॥ আগে তোমরা কে বলো, তারপর আমি সব বলবো।

প্রথম ॥ আমাদের পরিচয় দিয়ে দে মেঘা?

দ্বিতীয় ॥ আমি মেঘা-আর এ বিশ্বনাথ সর্দার।

গোপাল ॥ বিশে ডাকাত! ওরে বাপরে—

[ছুটে পালাতে চায়, মেঘা ধরে ফেলে।]

মেঘা ॥ কোথায় পালাচ্ছিস্?

গোপাল ॥ আমায় ছেড়ে দাও। তোমাদের পায়ে পড়ি। আমি গরীব মানুষ আমার নিজেরই খাওয়া জোটে না।

বিশ্বনাথ ॥ চুপ। আমাকে তোমার ভয় কিসের? আমি তোমার ক্ষতি করবো না। আমি কখনও গাঁয়ের গরীব মানুষদের ক্ষতি করিনা। তাদের জন্যই আমার এই লড়াই।

গোপাল ॥ লোকে বলে তুমি ভয়ঙ্কর ডাকাত।

মেঘা ॥ ওতো ঐ শালা জমিদার আর নীল কুঠি সাহেবদের রটনা।

বিশ্বনাথ ॥ ওরা ষড়যন্ত্র করে আমাদের নামে এই সব গুজব রটিয়ে রেখেছে যাতে গাঁয়ের মানুষ আমাদের ভয় পেয়ে দূরে দূরে থাকে।

মেঘা ॥ ওরা বলে আমরা নাকি মানুষ পেলেই তাকে খুন করি।

গোপাল ॥ হ্যাঁ, তোমরা নাকি মানুষের গরম-রক্ত খাও।

বিশ্বনাথ ॥ তোমার রক্ত আমরা খেয়েছি?

গোপাল ॥ না।

মেঘা ॥ ওরা এই সব আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছে? এতে ওদের লাভ হয়। আমরা এক ঘরে হয়ে পড়ি।

বিশ্বনাথ ॥ কিন্তু আসলে জানো আমরা তোমাদের ভালোবাসি। তোমাদের উপর অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমরা দাঁতে দাঁত কামড়ে লড়ে যাচ্ছি। কত নীল কুঠি আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছি। কত জমিদারের সেরেস্তা কাছারী আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে দিয়েছি। শুধু ঐ অত্যাচারের আবাসগুলো আমি ধ্বংস করে দিতে চাই।

গোপাল ॥ আমরা তো এসব কিছু জানি না।

মেঘা ॥ ওদের প্রচার সকলকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

বিশ্বনাথ ॥ যে গ্রামে যাই লোকে ভয়ে চিৎকার করে উঠে "বিশে ডাকাত—বিশে ডাকাত।"

মেঘা ॥ তারপর যখন আসল পরিচয় পায় তখন বুঝতে পারে আমরা ডাকাত নই ঐ জমিদার আর নীল সাহেবদের আমরা যম।

বিশ্বনাথ ॥ আমাদের পরিচয় পেয়েছো এবার নিশ্চয় তোমার সত্য বল্‌তে ভয় করবে না ?

গোপাল ॥ না।

বিশ্বনাথ ॥ বলো—

গোপাল ॥ ঐখানে একটি লোককে কারা যেন খুন করে ফেলে দিয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে লোকটা কাঙ্গাল হরিদাস।

বিশ্বনাথ ॥ কাঙ্গাল হরিদাস ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ।

মেঘা ॥ কারা খুন করেছে ?

গোপাল ॥ আমরা চেয়েছিলাম ঐ মড়া তুলে এনে তার সৎকার করতে কিন্তু নায়েব বিশ্বেশ্বর শাসিয়ে গেল, ও বললে, ঐ কাজ করলে আমরা ঐ ভাবে খুন হবো।

বিশ্বনাথ ॥ বুঝতে পারছো না কারা খুন করেছে ?

গোপাল ॥ বুঝতে হয়তো পেরেছি কিন্তু বল্‌তে সাহস হয় না।

বিশ্বনাথ ॥ এখনও ঐখানে কাঙাল হরিদাসের মৃতদেহ পড়ে আছে ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ, জমিদারের সেরা লাঠিয়ালরা পাহারা দিচ্ছে।

বিশ্বনাথ ॥ এবার বুঝতে পেরেছো মেঘা কারা কাঙাল হরিদাসকে খুন করেছে ?

মেঘা ॥ হ্যাঁ, বুঝেছি। তুমি কি করতে চাও ?

গোপাল ॥ আমি ঐ দেহ তুলে এনে সৎকার করতে চাই।

বিশ্বনাথ ॥ সেইজন্য তুমি ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলে ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ, ওপর থেকে ওদের দেখছিলাম ওরা কোথায় আছে এবং কোন সুযোগে আমি কাঙালের দেহ তুলে আনতে পারি।

বিশ্বনাথ ॥ আমি তোমাকে সাহায্য করবো। এসো, আমার সঙ্গে এসো।

গোপাল ॥ কোথায় ?

বিশ্বনাথ ॥ কোন ভয় নেই। বিশ্বনাথ সর্দার যাকে সাহায্য করে তার কোন ক্ষতি কেউ করতে পারে না। তুমি কাঙাল হরিদাসের মৃতদেহ সৎকার করবে আর আমি হরিদাসকে যারা খুন করেছে তাদের দেহগুলো চিতার আগুনে পুড়াবার জন্য প্রস্তুত করে দেব।

মেঘা ॥ একটা কাজতো আমরা করতেই এসেছি সেই কাজের সাথে এই কাজটাও করে যাবো।

বিশ্বনাথ ॥ কাজ দুটোই কিন্তু এক।

মেঘা ॥ এক ঢিলে দুটো পাখীই মরবে, সর্দার।

বিশ্বনাথ ॥ তোমরা জানো, তোমাদের জমিদার বাবু নীলকর সাহেবদের এই অঞ্চল পত্তনি দিচ্ছেন ?

গোপাল ॥ না।

বিশ্বনাথ ॥ এখন থেকে তোমাদের সব চাষ আবাদ ছেড়ে নীল চাষ করতে হবে।

গোপাল ॥ একি সর্বনাশের কথা শুনাচ্ছো তুমি !

বিশ্বনাথ ॥ আজ কাছারী বাড়িতে সই সবুদ হবে। নীলকর সাহেব লেভিয়ার্ড আসছেন।

মেঘা ॥ শুধু সই সবুদ কেন সর্দার, খানাপিনা নাচগান—

বিশ্বনাথ ॥ আমি আজ রাতে ওদের কাছারী আক্রমণ করবো। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবো। [বাদ্যধ্বনি] সময় চলে যায়, চলো—চলো—

[উভয়ের প্রস্থান]

[বলাই-এর প্রবেশ]

বলাই ॥ আপনাদের একটা খবর দিতে এলাম। এই মাত্র ছ' ঘোড়ার এক গাড়ী চেপে আমাদের বড়বাবু কাছারীতে এলেন। সঙ্গে রঙচঙ্ পোষাক পরা এক ফিরিঙ্গি সাহেব। চারদিকে ঘাপটি মেরে বসে আছে বিশের লোকজন। জানি না, এখন কি কাণ্ড ঘটবে ? ওদিকে হরিদাসের লাশ এখনও পড়ে আছে।

[নেপথ্যে বাপ—বাপ, মুই যাবো না গো মুই যাবো না।]

আমার ক্ষেতু—লক্ষ্মীর প্রতিমার মত মেয়ে কাঁদছে। আমায় একটু ক্ষমা করে দেন আমি যাই, আমি যাই। সবটা বলতে পারলাম না। আপনারা নিজেরাই দেখে নেন—নিজেরাই দেখে নেন। আমি চলি—আমায় ক্ষমা করেন, আমায় ক্ষমা করেন। একটু দাঁড়া খুকি আমি আসছি আমি আসছি। [বাঁশির সুর—প্রস্থান]

[বিদ্যেধরের প্রবেশ]

বিদ্যেধর ॥ সর্বনাশ কাণ্ড! কাঙ্গাল হরিদাসের মৃতদেহ কে তুলে নিয়ে গেছে। আমাদের আট দশ জন লাঠিয়ালকে পাওয়া যাচ্ছে না। কারা যেন তাদের 'গুম' করে ফেলেছে। আর এদিকে বড়বাবু এসে গেছে। আমি যে কি করি! ফিরিঙ্গি সাহেবকে নিয়ে মেজবাবু এখনি জোত জমি দেখতে বেরুবেন। আমায় এক্ষুনি এই ভয়ানক খবর কাছারীতে পৌছে দিতে হবে। কিন্তু কি করে যে খবরটা দেবো। বড়বাবুর যা মেজাজ যাই হোক, যেতে তো হবেই।

[মুখে কাপড় ঢাকা দুটো লোকের প্রবেশ। পেছন থেকে সাবধানে বিদ্যেধরকে মুখ চেপে তুলে নিয়ে যায়]

[লাঠিয়ালদের প্রবেশ লাঠি নৃত্য]

সমবেত ॥ সময় গুণে আপ্ত পর
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর। (প্রস্থান)

[গোপালের আগে প্রবেশ, পেছন পেছন অটল, যতীন ও কাদের প্রবেশ করে]

গোপাল ॥ না, না—

যতীন ॥ গাঁয়ে ফিরে চল গোপাল, গাঁয়ে ফিরে চল্।

অটল ॥ আমাদের সর্বনাশের হাত থেকে তুই বাঁচা।

কাদের ॥ আমরা বড় গরীব—আমাদের বড় কষ্ট—আমাদের বড় দুঃখ—গোপাল, তুই তো আমাদেরি লোক রে—

গোপাল ॥ আর ফিরে যাওয়া যায় না।

যতীন ॥ কেন, ফিরে যাওয়া যায় না, গোপাল ?

গোপাল ॥ আমি— (উঁচুতে উঠে দাঁড়ায়)

অটল ॥ তুই কি ?

গোপাল ॥ আমি কাঙাল হরিদাসের মৃতদেহ (একটু থেমে) তুলে নিয়ে এসেছি। (বাদ্যধ্বনি)

সমবেত ॥ গো—পা—ল !

গোপাল ॥ হ্যাঁ, বন থেকে ফুল তুলে এনেছি। হরিদাসকে সাজিয়েছি, এবার তাকে সৎকার করতে নিয়ে যাবো।

কাদের ॥ কেন একাজ করলি গোপাল, কেন এ কাজ করলি।

গোপাল ॥ অনেক ভেবে আমি এ কাজ করেছি। আমি জানি, আমি বাঁচবো না কিন্তু তোমরাও বাঁচবে না। আমাদের সমস্ত জমি জমিদার বাবু নীলকর সাহেবকে পত্তনি করে দিয়েছেন।

অটল ॥ তুমি ঠিক বলছো ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ, ঠিক বলছি এবার থেকে আর আমাদের খেতে ধান রোঁয়া হবে না, রাই শস্যও নয়, শুধু নীল চাষ করতে হবে। ঘরে ঘরে মড়ক লেগে যাবে—যাও, তোমরা গাঁয়ে ফিরে যাও, ঘরে ঘরে চোখের জল জমিয়ে রাখো, অনেক কাঁদতে হবে, অনেক কাঁদতে হবে।

অটল ॥ তোমায় এ খবর কে দিয়েছে।

যতীন ॥ কার কাছ থেকে তুমি এ সংবাদ পেলে।

গোপাল ॥ বিশ্বনাথ সর্দার।

সমবেত ॥ বিশে ডাকাত !

গোপাল ॥ বিশে ডাকাত নয়। ও আমাদের মত চাষাভুষোদের নেতা।

কাদের ॥ কোথায় ? কোথায় সে ?

গোপাল ॥ জমিদারের কাছারি ভাঙতে গেছে। নীলকর সাহেবকে ধরে আনতে গেছে। বিশ্বনাথ সর্দারই আমাকে সাহায্য করে যার জন্য ওদের পাহারা ভেঙে আমি হরিদাসের মৃতদেহ তুলে আনতে পেরেছি। আমি চলি— যাওয়ার সময় একটা কথা বলি যদি লাঠি টাঙি ধরতে পারো তবে বাঁচতে

পারবে নইলে মরণ ছাড়া তোমাদের গতি নেই। যার সাহস আছে, মরদের মতো বুকের পাটা আছে সে আমার সঙ্গে আসতে পারো নইলে গাঁয়ে ফিরে যাও—মরণের জন্য অপেক্ষা করো গিয়ে আমি চলি—

[বাইরে ওঃ-ওঃ-ওঃ হা, চিৎকার গোপালের প্রস্থান]

অটল ॥ আমি যাবো—আমি যাবো।

যতীন ॥ কোথায় যাবে ?

অটল ॥ আমি গোপালের সঙ্গে যাবো। গো-পা-ল দাঁড়া আমি তোর সঙ্গেই যাবো। (প্রস্থান)

যতীন ॥ অটল চলে গেল। আমি তবে যাই—গোপাল দাঁড়া আমিও যাবো—আমিও যাবো। (প্রস্থান)

কাদের ॥ আমি কি করি ! ওরা যদি সকলে লাঠি টাঙ্গি ধরে বাঁচতে পারে আমি পারবো না। নিশ্চয়ই পারবো—গোপাল দাঁড়া আমি যাবো। আমি যাবো। (প্রস্থান)

[হাতে জলন্ত মশাল নিয়ে বিশ্বনাথ ও মেঘার প্রবেশ। ওরা মঞ্চের দুদিকে দাঁড়ায়। গোপাল, কাদের, অটল, যতীন, কাঙ্গাল হরিদাসের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। বলাই প্রবেশ করে। মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়ায়]

বলাই ॥ এগিয়ে চলেছি সময়ের স্রোত বেয়ে। ইতিহাসের কাল থেকে আগামী দিনের লাল সূর্য উদয়ের পথে। অস্ত্রের আঘাতে অন্ধকার ছিন্ন করে নতুন সূর্য একদিন আকাশে আমরা তুলবোই তুলবো !

নাট্যকারের ঠিকানা—নন্দনপল্লী
নৈহাটী, ২৪ পরগণা।

অন্ধ তামস

সঞ্জয় গুহঠাকুরতা

চরিত্র

ডাক্তার	—	লাশ পরীক্ষক
হিরুয়া	—	লাশ কাটার ডোম
নির্ঝর	—	মৃত যুবক
শংকর	—	মৃত সাহিত্যিক
যোগেন	—	মৃত পুলিশ
হরিহর	—	মৃত ট্যাক্সি-ড্রাইভার
মিঃ সেন	—	মৃত প্রফেসর
টুনটুন মল	—	মৃত ব্যবসায়ী

●

[স্থান :—লাশ কাটা ঘর। ছ'টা লাশ একটার ওপর আর একটা এলোপাথারী ভাবে পড়ে আছে। প্রত্যেকটা লাশই যে কোন কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকবে। মঞ্চের অর্থাৎ লাশকাটা ঘরের ডানদিকে একটা লম্বা টেবিল এবং ছোট একটা টুল আছে। হিরুয়া একটা ট্রেতে লাশকাটার নানা-রকম সরঞ্জাম নিয়ে প্রবেশ করবে। তার মধ্যে থাকবে গজ, ব্যাণ্ডেজ, তোয়ালে প্রভৃতি। নীল-এ্যাপ্রণ পরে থাকবে হিরুয়া]

হিরুয়া। (চমকে উঠে) শালা, ছে ঠো, কেয়া জানে আউর কেটা আসবে ? হাম্ আজ রিকার্ড করবে।

[হন্তদন্ত, হয়ে ডাক্তার প্রবেশ করে। গায়ে একটা এ্যাপ্রণ পরা। বগলে ফাইল চাপা। চোখে চশমা। বয়স্ক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। খিটখিটে মেজাজের। অকারণে রেগে যায়।]

ডাক্তার॥ থাক শালার বেটা। অনেক হয়েছে। আর এসে কাজ নেই। বলি এমাসে কাটা চেরা করে কটাকে ঘাটে পাটালি ?

হিরুয়া॥ জো শালা যেমন রকম করবে সে শালা তো তেমনি করে মরবে ডাক্তারসাহাব, আপনি কি করবে ?

ডাক্তার॥ শালার ব্যাটার বুলি শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। ব্যাটা সাথে থাকতে থাকতে তোতাপাখী হয়ে গেছে। (হঠাৎ রেগে গিয়ে) ম্যালাই কপচাস্ না। খালি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ আর ফ্যাচ্ শালার ব্যাটা এখন লাশ-গুলো সারি সারি সাজিয়ে ফেল। সকাল থেকে গিন্নী এক কাপ চাও দেয়নি। বলে কিনা আমার নাকি পিত্তি পড়বে। শরীরটা কষে যাবে। শালার ব্যাটা আমি ডাক্তার হয়েছি কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে ?

হিরুয়া॥ ইসব ঘরের কথা ডাক্তার সাহাব। মাইজী বলছিলম্ কি…।

ডাক্তার॥ ফের তুই ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করছিস? আমি যা বলছি তুই তাই কর। ব্যাটা কেবল মুখের ওপর কথা।

হিরুয়া॥ ডাক্তার সাহেব হামি বলে কি আপ চা পিয়ে…

ডাক্তার॥ চোপ রাও হাড়াবেতে। যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা। আমি শালার ব্যাটা তার নামে রিপোর্ট করবো। তুই আজকাল কাজে ভীষণ ফাঁকি দিচ্ছিস।

হিরুয়া॥ ডাক্তার সাহাব…

ডাক্তার॥ ফের বড় বড় কথা, শালার ব্যাটা। বলি ডাক্তারী পাশ করেছিলাম কি এই লাশ গুলোর ওপর অপারেশন করার জন্য? বিশ বছর কেবল চেরাই ঘরের ডাক্তারই থেকে গেলাম। কেবল চেরাই ঘর আর পুলিশ হসপিটাল আর কোর্ট কাছারী।

হিরুয়া ॥ আমি জানে ডাক্তার সাহাব। আপ ভগবান আছেন। লাস হাপনাকে পেয়ার করে। ভালোবাসে।

ডাক্তার ॥ চুপ কর শালা। কেবল দাঙ্গা হাঙ্গামার কেস্। আর মড়াগুলো কাটা চেরা করা। দে লাশগুলোকে সাজিয়ে দে জলদী জলদী।

[ডাক্তার ফাইল খুলে দাঁড়াল]

হিরুয়া ॥ ঠিক হ্যায় ডাক্তার সাহাব।

[হিরুয়া চটপট লাশগুলোকে একের পর এক টেনে সাজিয়ে দেয়।]

ডাক্তার ॥ নে এখন লাশগুলোর ঢাকা কাপড় সরিয়ে ফেল। মিলিয়ে দেখি কাটা চেরা জায়গাগুলোর নোট ঠিক আছে কিনা।

[হিরুয়া চটপট একটা কাপড় সরায়। ডাক্তার দেখে যায়। মিলিয়ে যায়। হিরুয়া ক্রমান্বয়ে সবগুলো সরায়। শেষের লাশটা দেখে দু'জনেই চমকে ওঠে।]

ডাক্তার ॥ শালার বেটারা এ বছর একেবারে কচি কচি ছেলেগুলোকে শেষ করে দিচ্ছে। আহা। কি চেহারা ছেলেটার, কে জানে বেটা কি করে ছিল? শোন্ হিরুয়া। আমি চা খেয়ে আসছি। তুই ততক্ষণ একটা লাশ উঠিয়ে রাখ বুঝলি?

হিরুয়া ॥ আপ যাইয়ে ডাক্তার সাহাব। হামি সব ঠিক করিয়ে লিবে।

ডাক্তার ॥ তাহলে আমি যাচ্ছি।

হিরুয়া ॥ ঠিক হ্যায়। (ডাক্তার প্রস্থানোদ্যত এমন সময় হিরুয়া পিছন থেকে ডাকে) ডাক্তার সাহাব।

ডাক্তার ॥ কিরে শালার বেটা?

হিরুয়া ॥ ডাক্তার সাহাব!

ডাক্তার ॥ (রেগে) কি?

হিরুয়া ॥ নেহী কুচ্ছ, নেহী আছে।

ডাক্তার ॥ কিছু না কিরে শালার বেটা? পেটের মধ্যে কথা আটকে রেখে

চালাকি করবি আমার সাথে? বেজ্জতি। হতচ্ছাড়া? হাড়বেতে বল শালার বেটা কি বলছিলি?

হিরুয়া ॥ আজ তো বহুত লোট ঘুষ লিবেন……।

ডাক্তার ॥ নেবো। তাতে তোর বাপের কী? একশো বার টাকা নেবো। কেন নেবো না? বলি যা মাইনে পাই তা দিয়ে গিন্নীর স্বাদ আহ্লাদ মিটিয়ে ছেলে মেয়েকে মানুষ করা যায়?

হিরুয়া ॥ আজ সে হামার ভী বখরা চাই। আজ সে হামি ভী বখরা লিব।

ডাক্তার ॥ কি বললি শালার বেটা? ডাক্তারের মুখের ওপর কথা, শালার ব্যাটা তুই টাকা নিয়ে করবি কি এঁ্যা? তুই ধেনো গিলে ফেলাট্ হয়ে নর্দমায় পড়ে থাকবি। হাড়াবেতে।

হিরুয়া ॥ গিরে থাকবে, তব ভী হামার পয়সা চাই। একা একা আপ সব লোট লিতে পারবে নাই। লোট না দিলে হামি সমুচ্চ লোকের কাছে বলে দিব কি আপ ঘুষ লেন।

ডাক্তার ॥ [জিভ্ কেটে] চুপ কর শালার বেটা, লোকে শুনে ফেলবে যে, বলি দেওয়ালেরও যে কান আছে। আমি কি না করেছি? কিন্তু বাপ, তোর চোখের ঠুলি দুটো সরালো কে?

হিরুয়া ॥ [প্রথম লাশটা দেখিয়ে] ঐ লাশটা।

ডাক্তার ॥ [ভয়ে ভয়ে] এঁ্যা! লাশটা। বাপরে, বুঝেছি ও ব্যাটার মুখের ছায়া দেখেই তুই তখন থেকে কপচাচ্ছিস। তাই নারে, শালার ব্যাটা। বেশ সে হবেক্ষণ। কাউকে যেন বলিসনি।

[ডাক্তারের প্রস্থান]

হিরুয়া ॥ শালা হর রোজ লাশ চিরকর্ ঘুষ কা পয়সা লিবে। পয়সা লিবে আপনা ভুঁড়ি পর তাত দিবে। সো নেহি চলেগা। বখরা দিবে তো আচ্ছা। নেহিতো এক রোজ লাশের মাফিক্ তুমাকে ভী খতম করে দিবে। শালা এক চাক্কুতেই তুমকো সাবাড় করে দিবে। হারাম খোরী……। শালা বিবিটা ভী ভেগে গেলো। বোলে লাশ চিরফাড় করা ডোমের সঙ্গে হামি ঘর করবে না। তো যো না শালা চার কিলাস ফেল, ডোমের বেটা, পয়সা ফেললে লাইন কা মহল্লামে বহুৎ মিলে গী।

শালা হিঁরুয়া কোই রোজ ভুখানা থেকেছে, না থাকবে। পয়সা ফেকবে, মাল লিবে। ডাক্তার সাব ভী চলে গেলো, হাম ভী থোড়া মাল পিয়ে আসি।

[প্রস্থান।]

[ডোম চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভৌতিক সঙ্গীত ধ্বনির পর লাশগুলো নড়াচড়া করে ওঠে। আলো কমে আসে। মঞ্চের মধ্যে থেকে লাশগুলো বলে ওঠে..."আমরা মৃত আত্মা মহানগরীর"। ক্রমান্বয়ে বক্তার পর তারা উঠে দাঁড়ায়।]

নির্ঝর ॥ আমি নির্ঝর। আমি বেকার।

হরি ॥ আমি হরিহর, ট্যাক্সি ড্রাইভার।

সেন ॥ আমি স্থানীয় মহাবিদ্যালয়ের,অধ্যাপক মিঃ সেন।

শংকর ॥ আমি শংকর। শংকরেন্দু সেনগুপ্ত, কয়েকটি উপন্যাসের লেখক।

যোগেন ॥ আমি যোগেন তালুকদার। আমি শান্তি রক্ষক, আমি সময়ে সময়ে রাতের অতন্দ্র প্রহরী।

নির্ঝর ॥ মিথ্যে কথা। [আলো মঞ্চকে উজ্জ্বল করে তোলে] সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। শান্তি রক্ষক না কচু।

শংকর ॥ আঃ নির্ঝরবাবু। কি হচ্ছে। ওকে বলতে দিন। এ ব্যাপারে আপনার মাথা না গলালেও চলবে।

নির্ঝর ॥ ডোণ্ট্ ইণ্টারাপ্ট শংকরবাবু। এ বিষয়ে আপনাকেও মাথা গলাতে হবে না।

টুনটুন ॥ হামার পরিচয় তো আপলোগ জরুর জানতে পারিয়েছেন হামি বড়া বাজারের শেঠ বানোয়ারী দাস বাওড়ার বেটা শেঠ টুনটুন মল বাওড়া। হামি মন্দির বানাইয়াছি, ভিখারীকে দান করিয়াছি। তব পরভী লেড়কাগুলো খতম করিয়ে দিল।

নির্ঝর ॥ মিথ্যে কথা! ভীষণ মিথ্যে কথা। এর থেকে আর মিথ্যে কিছু থাকতে পারে না।

হরি ॥ আমি কেন এ সমাজের কাছে সৎ বিচার পেলাম না? আমার

অপরাধ কি সত্যি মারাত্মক ছিল ? শেঠের অপরাধ আর আমার অপরাধ কি এক ? বলুন, চুপ করে থাকবেন না।

শংকর ॥ সে বিচার একটু পরেই হবে।

সেন ॥ বিচার ?

শংকর ॥ হ্যাঁ বিচার, এখানে মৃত আত্মার আদালত বসবে। এই মৃত আত্মার গণআদালতে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে। সমাজকে কলুষিত করার জন্য আমরা কতখানি দায়ী।

সেন ॥ কি হবে কৈফিয়েত দিয়ে ?

নির্ঝর ॥ মুখোশ খোলার এই তো সময়। এমনি এমনি আমাদের মৃত্যু হলো বলতে চান ?

যোগেন ॥ আমি এসবের মধ্যে থাকতে চাই না। মরে মানুষ শান্তি চায়। আমি এখানে শান্তি পেতে এসেছি। জবাবদিহি করতে নয়।

শংকর ॥ শান্তি চাইলেই কি শান্তি পাওয়া যায় ?

টুনটুন ॥ আপনি ঠিক বলিয়াছেন শংকরবাবু। শান্তি তো বাজারের সওদা নেহী আছে যে, খরিদ করিয়া লিব।

হরি ॥ এ ভাবে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। যা করার জলদি করুন। আমি কৈফিয়ত দিতে রাজি আছি।

নির্ঝর ॥ নির্ঝর মিত্রও আপনার পথ অনুসরণ করবে। সত্যি কথা বলতে কি নির্ঝর একটুও ভয় পায় না।

শংকর ॥ তাই বলে যে বলতে চাইবে না তার প্রতি জোর করার অর্থ হোল গণতন্ত্রের অবমাননা করা। হত্যা করা।

নির্ঝর ॥ অমন গণতন্ত্রের মুখে ঝাঁটা মারি। বলি গণতন্ত্র ধুয়ে ধুয়ে কি জল খাবো ?

টুনটুন ॥ হামার কোই কালা জীবন নেহী আছে। হামি দান ধরম করিয়াছে। হামি কোন খারাপ কাম করে নাই।

হরি ॥ বিচার হলেই বোঝা যাবে শেঠ। নির্ঝরবাবু আসুন সকলে মিলে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করি।

যোগেন ॥ কিসের প্রস্তাব ?

হরি। আদালত বসাবার প্রস্তাব।

শংকর॥ আপনি বলুন আপনি কি চান?

হরি॥ আমি চাই মিঃ সেন বিচারক হোক। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবো আমরাই। আমরাই আমাদের defence হিসেবে cross করবো এবং প্রয়োজনে উত্তরও দেব।

সেন॥ আমি কোন দিন বিচার করিনি। তাছাড়া ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড সম্বন্ধে আমার কোন আইডিয়াই নেই। না জেনেশুনে বিচার করা যায় না।

নির্ঝর॥ আপনাকে কিছু করতে হবে না। কেবল ঐ টুলটা নিয়ে ঐ টেবিলটার ওপর বসুন। আর আমরা কি বলতে যাচ্ছি বা কি করতে চাইছি তাই শুনবেন। যাতে কোন অরাজকতার সৃষ্টি না হয়।

সেন॥ ইট ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল্। আই কাণ্ট্। আমি কিছুতেই পারবো না। যা জীবনে কোনদিন করিনি তা আজ কিছুতেই…

শংকর॥ বেশ তাহলে যোগেনবাবু বিচারক হোক।

হরি॥ এই ভালো হোল। তাছাড়া এখানে আমরা সকলেই মৃত আত্মা। মৃত আত্মার আদালতে সকলেই সকলের ফেলে আসা জীবনের কালো ইতিহাসের কথা একত্রে তুলে ধরবো। কি ভয় পাচ্ছেন?

যোগেন॥ ভয় কেন? ভয় পেলেই ভয়—না পেলেই নয়। অমন কালো জীবন সকলেরই আছে। তাই বলে এখানে এসে বাদ বিবাদ করতে হবে তা জানা ছিল না।

হরি॥ নিন নির্ঝর বাবু। যা হয় কিছু একটা করুন। কারণ সময় বয়ে যাচ্ছে। বাইরে আমাদের লাশ নেবার জন্য আত্মীয়-স্বজনেরা অপেক্ষা করছেন।

শংকর॥ নির্ঝর বাবু গণআদালত যদি সত্যই বসাতে চান তাহলে এমন একজন বিচারক নির্বাচন করতে হবে যিনি হবেন সৎ। যার চরিত্র সব থেকে শুদ্ধ নির্মল। যিনি কলুষিত মন, যিনি ঠগ, চোর, প্রতারক বিশ্বাসঘাতক নন। ঠিক তেমনি লোককেই বিচারক নির্বাচিত করা শ্রেয় মনে করি।

[সকলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আবহসঙ্গীতে চিন্তার মূর্চ্ছনা ভেসে আসে। প্রত্যেকটি চরিত্র স্বগতোক্তি করতে থাকে ক্রমান্বয়ে—"আমি কি সৎ", "আমি কি সৎ", "আমি কি সৎ" ? প্রত্যেকেই দুবার করে বলবে। আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। প্রতিটি চরিত্রকে ফ্যাকাসে করে দেবে। সকলে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল। তখন নেপথ্যে ভাষ্যকার বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করবে—বলো তোমরা কে সৎ ? এতগুলো লোকের মধ্যে তোমরা কে সৎ ? বল, বল, বল, তোমরা চুপ করে থাকবে না। কি তোমরা বলবে না ? চুপ করে থাকবে ? ছিঃ ছিঃ এত নীচ তোমরা। তোমাদের মধ্যে কেউ সৎ নেই। ঘেন্না, ঘেন্না, সকলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নেপথ্যে কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা—"কে সৎ" ? তুমি ? তুমি ? তুমি ? তুমি ? বল হরিহর তুমি ? সকলে এক এক করে মাথা নীচু করে থাকে। নেপথ্য কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করে—বল "হরিহর তুমি কি সৎ ?" বল বল ? হরিহর নেপথ্য কণ্ঠের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে চিৎকার করে ওঠে।]

হরি। এই সমাজ আমাকে সৎ হতে দেয়নি। কিন্তু আমি সৎ হতে চেয়েছিলাম। কোনদিন স্বপ্নও দেখিনি আমি খারাপ পথে আসবো। আমি একজন Graduate taxi driver বলুন তাহলে আমার শিক্ষার মান এবং দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানের তফাৎ কোথায় ?

নির্ঝর। আমি শ্রেণীবিভাগ বা Classification জানি না। Graduate

বলে যে আপনি Taxi driver হবেন না এমন কথা কি আপনার ঠিকুজী কুষ্ঠীতে লেখা ছিল? ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। এসব ফ্যাসিস্ট মতবাদকে আমরা জলাঞ্জলি দিতে পারিনি বলেই তো এই পুঁতিগন্ধময় সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বেঁচে আছি।

শংকর॥ তাহলেই দেখা যাচ্ছে এখানে কেউ সৎ নয়। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি নিজেকে সৎ বলে দাবী করতে পারেন। এভাবে যদি সমগ্র দেশটার ওপর বিচার করা যায়।

নির্ঝর॥ ফালতু কথা। সাহিত্যিকরা সবসময় ফালতু কথা লিখে ফ্যানায়। Let us try to select a Judge because there is no time. একটু পরে আমাদের কেটে চিরে Report পাঠাবে থানায়।

হরি॥ আর যেখানে বছরের পর বছর আমাদের ফাইলগুলো লাল ফিতে বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকবে, এর কোন বিচার হবে না। আর যদিও বা হয় তাহলে সেও এক প্রহসন ছাড়া আর কিছুই হবে না। বড় জোর P blic চেঁচামেচি করলে হয়তো একটা তদন্ত Commission বসাতে পারে, এই বুর্জোয়া সরকার।

নির্ঝর॥ কি হবে তদন্ত হয়ে? সেই একই রায় তো বেরোবে। সনাক্ত-করণের অভাবে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা গেল না। এটা গভীর দুঃখের বিষয়। ব্যাস সব ধামা চাপা পড়ে গেল।

সেন॥ বড় বেশী কথা বলতে পারে আজকের এই young generation, মশায়, আমাদের সময় ছেলেরা এত বাচাল ছিল না।

টুনটুন॥ ঠিক বলিয়াছেন প্রফেসার সাহেব। বাঙালীরা বহুৎ বাত করতে পারে, কেবল কাঁই কিচির, কাঁই কিচির।

হরি॥ জাতের জিগির তুলবেন না বলছি শেঠ।

শংকর॥ নির্ঝর বাবু। আমরা অন্যদিকে চলে যাচ্ছি। আসল উদ্দেশ্যে আসতে পারছিনা কিন্তু।

যোগেন॥ আমার ইচ্ছা অধ্যাপক মহাশয়ই বিচারক হোক। উনিই আমাদের মধ্যে বেশী শিক্ষিত।

নির্ঝর॥ সেটা প্রমান সাপেক্ষ। বলুন মিঃ সেন, আপনি বিচারক হতে চান?

সেন ॥ অগত্যা আপনাদের যা অভিরুচি।

যোগেন ॥ বেশ তাহলে উঠুন ঐ টেবিলের ওপর। আমি টুলটা পেতে দিচ্ছি।

[যোগেন টুলটা টেবিলের মধ্যে পেতে দেয়। মিঃ সেন টুলটাকে ঠিক করে বসেন। যোগেন সরে দাঁড়ায়। মঞ্চ দুভাগে ভাগে হয়ে যায়। এক ভাগ কালো অন্ত ভাগে আলো। অবশ্যই আলোর দিকে বিচার হবে। চরিত্ররা থাকবে কালোর মধ্যে। বিচারকের ডাকে বা নিজেদের বক্তব্য রাখতে ওরা সময়ে সময়ে বেরিয়ে আসবে।]

নির্ঝর ॥ এই মৃত আত্মার আদালতে আমরা আমাদের কথা বলবো। এখানে কোর্ট কাছারির ধারাবাহিক বিচার প্রহসন চলবে না। আমাদের মৃত্যুর জন্ম কে কতখানি দায়ী তা প্রমাণ করে যাব।

শংকর ॥ আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবো।

সেন ॥ আসামী যোগেন তালুকদার। আসামী যোগেন তালুকদার।

যোগেন ॥ আমি আসামী নই। মৃত্যুর পর এ নামের বদনাম নিতে চাই না। এখানে সাক্ষী বা আসামীর নাম উল্লেখ করার কি খুবই প্রয়োজন আছে ?

হরি ॥ বিচারক যা বলছেন আপনি তাই। ওই কল্পিত কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ান ঠিক করে। [যোগেন ভয়ে ভয়ে কল্পিত কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ায়]

সেন ॥ বলুন যাহা বলিব সত্য বলিব। সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না।

নির্ঝর ॥ I object your honour, মৃত আত্মার কাছে ওসব সত্য মিথ্যার মায়াজাল নেই। তাই মহামান্য আদালতকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ওসব গীতা টিতা ছুঁয়ে কজনে আদালতে সত্যি কথা বলেছে ? ক'জনে ঐ লাল শালুতে বাঁধা বই ছুঁয়ে শপথ নিয়েছে, সত্যি কথা বলবার জন্ম ?

সেন ॥ আমি তো নিজে বিচারক হতে চাই নি। আপনারাই জোর করে আমায় বিচারক করেছেন। কোন্ কোড্ কোথায় প্রযোজ্য তা আমি

কি করে জানবো? একটা চাপরাশী পর্যন্ত নেই। পেস্কার নেই। ক্লার্ক নেই। কেউ এভাবে বিচারকের কাজ করেছেন?

নির্ঝর॥ বললাম তো আমাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নেই। যে কাজ একজনকে দিয়ে করা যায়। তার জন্য দশজনকে ডেকে এনে দেশের শ্রমকে নষ্ট করার অর্থ দেশদ্রোহিতা।

শঙ্কর॥ রাইট্। আপনি একাই বিচার চালাবেন এবং প্রয়োজনে কৈফিয়ত দেবেন আপনার কলঙ্কিত জীবনের। এখানে কোন উকিল মোক্তার নেই। আমাদের একাই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

[বিচারক নড়ে চড়ে বসেন। যোগেন ছাড়া সকলেই অন্ধকারে চলে যায়।]

সেন॥ বলুন যোগেনবাবু; আপনার কি বলার আছে। এই মৃত আত্মার আদালতে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে আপনি কি জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় অপরাধ করেছেন?

যোগেন॥ আমার মনে নেই। অত মাথা থাকলে পড়াশুনা করে অন্য কাজ করতাম। সামান্য পুলিশের কাজ করতাম না।

[নেপথ্যে হরিহর চিৎকার করে ওঠে।]

হরি॥ মিথ্যে কথা, ওঁর সব মনে আছে। সম্মান হানির জন্য কিছু বলতে চাইছেন না।

সেন॥ আপনি কি কিছু বলতে চান?

হরি॥ হ্যাঁ।

সেন॥ তাহলে আলোর মধ্যে আসুন। কাঠগড়ায় এসে ওঠে দাঁড়ান।

[হরিহর আলোর মধ্যে প্রবেশ করে। কল্পিত কাঠগোড়ায় উঠে দাঁড়ায়।]

যোগেন॥ তুমিই বা কম কিসে! রেড রোডের ধারে দাঁড়িয়ে যখন তোমায় গাড়ী থামাতে বলছিলাম, তখন তুমি গাড়ী থামালে না কেন?

হরি॥ তুই তোকারি নয়। বলুন আপনি।

যোগেন॥ হ্যাঁ আপনি গাড়ী থামালেন না কেন?

হরি ॥ আমার গাড়ীতে তখন একটা মেয়ে ও একজন অফিসার জড়াজড়ি করে চুমু খাচ্ছিল। আরও কি কি করছিল।

[অন্ধকার থেকে শংকর বেরিয়ে আসে।]

শংকর ॥ মোষ্ট অবজেকশনেবল্। কোন ভদ্রলোকের private life নিয়ে এখানে আমরা বিচার করতে আসিনি।

সেন ॥ অবজেকশন্ ওভার রুলড। প্রসিড যোগেন বাবু। আপনি যেতে পারেন শংকর বাবু। [শংকর অন্ধকারে মিশে যায়]

যোগেন ॥ আপনি তো সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ী চালাচ্ছিলেন— আপনি দেখলেন কি করে ?

হরি ॥ শো উইণ্ডো মিরারে।

যোগেন ॥ সেটা দেখা আপনার অন্যায়।

হরি ॥ না কোন অন্যায় নয়। আমার রক্তে ও উত্তেজনার উষ্ণ লোহিত কণা আছে। আমিও রক্ত মাংসের মানুষ।

যোগেন ॥ তা বলে যা অন্যায় তাকে অন্যায় বলে স্বীকার করবেন না ?

হরি ॥ ওর মধ্যে অন্যায় কিছু দেখিনি। তাছাড়া পেছনের গাড়ী দেখতে হলে তো উইণ্ডো মিরার দেখতেই হয়।

সেন ॥ অন্যায়—অন্যায়—অন্যায়। কেবল অন্যায়—অন্যায় বললেই চলবে না। আরও কিছু বলুন। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি বলুন।

যোগেন ॥ আপনি বেআইনী ভাবে গাড়ীতে বেশ্যা তুলে সমাজের অন্ধকার পথকে আরও নোংরা করে তুলতে সাহায্য করেছেন।

হরি ॥ হ্যাঁ করেছি। কিন্তু এতদিন এসব বিচার ধারা কোথায় ছিল ? এতদিন মুখ খোলেন নি কেন ? জানি, উত্তর দিতে পারবেন না। কারণ প্রতিমাসের কোটা যে তাহলে বন্ধ হয়ে যেত। বলুন আপনি আমাকে বেআইনী কাজে সহায়তা করে মাসে মাসে টাকা নেননি ? বলুন চুপ করে থাকবেন না।

যোগেন ॥ হ্যাঁ নিয়েছি। আর কেনই বা নেব না। আমার মাইনে কত জানেন। ২৬৫্ টাকা। ঐ টাকাতে বারো জন প্রাণীর ঘানি চালানো যায় না। তাই অন্যপথ দেখতে হয়েছে।

হরি ॥ অথচ আপনি সরকারী বণ্ড পেপারে সব দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন।

যোগেন ॥ হ্যাঁ করেছিলাম, না করলে চাকুরী পেতাম না।

হরি ॥ সমাজের জন্য আপনার কোন সৎ কর্তব্য নেই।

যোগেন ॥ আছে, কিন্তু অন্য ভাবে।

হরি ॥ সেই অন্যভাবটার কথাই ত' জানতে চাইছি। সমাজবিরোধীদের শাস্তি দেবার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে আপনাদের। অথচ আপনারাই তাদের ছেড়ে দিয়ে সমাজকে শেষ করে দিচ্ছেন।

যোগেন ॥ মুখ সামলে কথা বলুন।

হরি ॥ Shut up.

সেন ॥ সংবিধান-এর অভিমত অকারণে উত্তেজিত হওয়া আইন বিরুদ্ধ।

[অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে প্রবেশ করে নির্ঝর।]

নির্ঝর ॥ আপনি সংবিধানের কি বোঝেন? যে দেশের সংবিধান তৈরী হয় টাটা-বিড়লা, সুরজমল, আর চ্যান্‌চোনীর জিভের দিকে তাকিয়ে তাকে আপনারা সংবিধান বলতে পারেন, আমি তাকে বলব মুদীর দোকানের হিসাব খাতা।

যোগেন ॥ আপনি Communist?

নির্ঝর ॥ এক কথা বলতে যারা পাতি বুর্জোয়া বোঝায়, তাদের আমি ঘৃণা করি। আই হেট দোজ ব্লাড়ি লীডারস্।

[অন্ধকার থেকে আলোয় প্রবেশ করে টুনটুন]

টুনটুন ॥ তবে আপনি নকশাল আছেন। বহুত খাতরনাক আছেন। উহারা হামাকে ভোজালি দিয়ে খতম করিয়ে দিল।

নির্ঝর ॥ কোন কিছুতে জেহাদ ঘোষণা করলেই অমনি নকশাল হয়ে গেলাম তাই না শেঠ।

হরি ॥ দেখুন নির্ঝরবাবু, আপনার সঙ্গে এর আগে আমার কোন পরিচয় ছিল না। মৃত্যুর পর এমন কথা শুনে ভালো লাগছে। আপনার বলিষ্ঠ কথাগুলো শুনে আমি স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। আমার অপরাধের সাজা

কি হওয়া উচিত ছিল, জানি না। তবে এটা জানি আমাদের আরও কঠিন সাজা দিলেই হয়তো সমাজের উন্নতি হোত।

সেন ॥ আপনারা ভিড় করবেন না। ওকে বলতে দিন।

[অন্ধকারে চলে যায় নির্ঝর ও টুনটুন]

সেন ॥ হরিহরবাবু, আপনি কি বলতে চান ?

হরি ॥ আমি যখন বহু চেষ্টা করেও একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারি নি, তখন আমার এক বন্ধু এ লাইনে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেয়। বাড়িতে ছ-সাতজন প্রাণী। আমি একাই উপার্জন করি। সেই অবস্থায় গোটা কতক টাকায় কি করে সংসার চালাই বলুন ? প্রায় রোজই আমি হাওড়া স্টেশনে গাড়ী নিয়ে যেতাম। কিন্তু কোন দিনই ঐ চোরটার থেকে রেহাই পাইনি।

সেন ॥ আপনার মৃত্যু হোল কেন তাই আমরা জানতে চাই।

হরি ॥ সেদিন ছিল শনিবার। সারাদিন খেটে খুটে মাত্র ৩০ টাকা রোজগার হয়েছিল। ঐ টাকায় তেল, মালিকের profit, পুলিশের ঘুষ দিয়ে আমার কাছে আর কিছুই থাকে না। তাই গাড়ী গ্যারেজ করার মুখে মেট্রোর কাছে একটা পার্টি পেয়ে গেলাম………।

সেন ॥ থামবেন না বলুন।

হরি ॥ ওরা চারজন ছিল। দুটো মেয়ে এবং দুটো ছেলে। সে এক কুৎসিত দৃশ্য। তাদের নিয়ে আমি গঙ্গার ধারে এসে গাড়ী park করলাম। একটা গাছের নীচে বসে আমি সিগারেট টানছিলাম। সেদিন চাঁদনী রাত ছিল। প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে মেয়ে দুটোর সঙ্গে ছেলে দুটোর ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। ওরা কিছুতেই কম নেবে না। আর ছেলেরা কিছুতেই বেশী দেবে না। আমি কাছে যেতেই ছেলে দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল। মেয়ে দুটো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আমি জানতাম কি হয়েছে। কিন্তু পয়সা দিয়ে আমার কণ্ঠ আগে থাকতেই রোধ করা ছিল। আমি রাতের পসারিনী কলকাতার নগ্নরূপ দেখেও কিছু বলতে পারিনি।

সেন ॥ Interesting ! থামবেন না বলুন।

হরি ॥ শেষে ওদের অনুরোধে ওদের একদিন রোডের ধারে নামাতে গিয়েই কে যেন আমার পিঠে পরপর কতকগুলো ছোরার ঘা বসিয়ে দিল। আমি যন্ত্রণায় কোকিয়ে উঠলাম। ওদের মধ্যে একজন বলল শুয়ারের বাচ্চা আমার বোনকে গাড়ীতে তুলে ব্যবসা করছিলি। অথচ বিশ্বাস করুন মনে প্রাণে আমি এসবকে ঘৃণা করি, আমারও যে বাড়ীতে বোন আছে। তবুও আমায় এ করতে হয়েছিল।

সেন ॥ আপনি যেতে পারেন হরিহরবাবু। টুনটুনমল দাম বাতড়া। টুনটুনমল দাম বাতড়া।

[হরিহর অন্ধকারে চলে যায়, অন্ধকার থেকে টুনটুনমল বেরিয়ে এসে আলোয় কল্পিত কাঠগোড়ায় উঠে দাঁড়ায়।]

যোগেন ॥ আমায় কেন আটকে রেখেছেন? আমায় ছেড়ে দিন না।

সেন ॥ ছেড়ে দেবার আমি কে? বক্তব্য রাখবেন ও মৃত আত্মাকে শান্তি দেবেন। বলুন আপনার কি বলার আছে।

যোগেন ॥ প্রচুর ঘুষ নিয়েছি সত্যি কথা। কারণ এ লাইনে এই তো নিয়ম। এখানে যারা ঘুষ নেয় না, তারা দপ্তরের কাছে নির্বোধ। তাই সরকার এদের মাইনে কম করে দিচ্ছেন। সরকার জানেন এরা এক একজন গেজেটেড অফিসারের মত টাকা মাসে মাসে রোজগার করে। তাই এদের জন্য Pay Commission বসে না, এরা Strike করে না। ধর্মঘট, ঘেরাও, বিদ্রোহ করে না। প্রমোশন পায় না, এরা তবুও অদ্ভুত এরা বেঁচে আছে, এরা বছরে একদম ছুটি নেয় না। কারণ, আমদানীতে ভাঁটা পড়বে, এই হোল একজন সৎ পুলিশের চরিত্র। এখন বলুন আমি যদি এদের মধ্যে একজন হয়ে থাকি আর হরিহরের রক্ত শোষণ করে থাকি তাহলে কি খুব একটা ভুল করেছি? আমাকে এ পথে নামালো কারা? কারা হরিহরের মেহনত করা পয়সার ভাগ নেবার জন্য আমার হাত বাড়াবার জন্য সাহায্য করেছে? বলুন বলুন।

[শংকর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে আদালতে]

শংকর ॥ চুপ করুন, নিজের অপরাধ ঢাকতে আর বড় বড় কথা বলবেন না। আমরা সব জানি।

যোগেন ॥ কি জানেন আপনি? কিছুই জানেন না! মাসে মাসে ডাক্তারের Bill, ঘর ভাড়া আর গোয়ালার টাকা দিতেই হাঁপিয়ে উঠি। তারপর ত্রিশটা দিন যে কি ভাবে চলে তা আপনি জানবেন কি করে? কারণ আপনার মত কোন দেশের টাকা গিলে অশ্লীল সাহিত্য রচনা করি না। সারাদিন মেহনত করি। পেটভরে খেতে চাই। পাই না। ক্ষুধার্ত থাকি। তাই ঘুষ নিচ্ছি। নেব, নেব ততদিন, যতদিন না এই কলঙ্কিত-ময় প্রশাসনের আমূল পরিবর্তন হচ্ছে।

শংকর ॥ প্রশাসন তৈরী করবে কারা?

যোগেন ॥ আপনারা যারা নিজেদের সমাজ-সেবক বলে ঘোষণা করেন।

সেন ॥ ওসব আইডেল টক ছাড়ুন। বলুন আপনার মৃত্যু হল কি করে?

যোগেন ॥ বোমার আঘাতে। আমি সকাল বেলা Dutyতে যাচ্ছিলাম। বাড়ী থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় যেতেই আমার সামনে কয়েকটা ছেলে এসে বলল, আপনার ঘুষ নেওয়া বন্ধ করতে হবে।

সেন ॥ আপনি কি বললেন?

যোগেন ॥ কেন? জিজ্ঞাসা করলাম। ওরা বলল, কেন'র উত্তর দেওয়া আমাদের কম্‌রেড শেখায়নি। আপনার বাড়ীর লোক আগামীকাল আপনার বাড়ীর দেওয়ালে দেখে নেবে।

সেন ॥ তারপর?

যোগেন ॥ আমি বললাম, আপনারা জানলেন কি করে যে আমি ঘুষ নিই? ওরা বলল, পুলিশ মাত্রেই ঘুষ নেয়। আমি বললাম, মিথ্যে কথা। ওরা চার্জ করলো পেটো। তারপর আর আমার মনে নেই।

শংকর ॥ আপনার শেষ বক্তব্য কি?

যোগেন ॥ আমার মনে হয় ওরা ভুল করেনি। তবুও যদি আমার এ অবস্থা দেখে অন্ত সকলে ঠেকে শেখে।

[বিচারক নড়ে চড়ে বসেন।]

সেন ॥ আপনি যেতে পারেন যোগেনবাবু। শংকর বাবু আপনি ঐ কল্পিত কাঠগোড়ায় উঠে দাঁড়ান।

[যোগেন অন্ধকারে চলে যায়। শংকর কল্পিত কাঠগোড়ায় উঠে দাঁড়ায়। শেঠ নড়ে চড়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।]

শংকর ॥ কি শেঠ ; অসুবিধা হচ্ছে ? আরে ভয় কি ? এখন আর মাল মশলা পেলেও নতুন কিছু লিখতে পারবো না। সুতরাং বিনা দ্বিধায় বলে যান।

সেন ॥ বলুন টুনটুনমল বাবু।

টুনটুন ॥ বিসওয়াস করুন সেন সাহাব। উহাদের হামি লকারের চাবি দিয়া দিয়েছিলেন। লেকিন উলোক রূপাইয়া লিলে নাই। উ ছেলেগুলা বললে তুমার ঐ লোটে গরীবের রক্ত আছে। তোমার ঐ বেহুতের রুপাইয়াতে আমরা আগুণ লাগাইয়া দিবো।

সেন ॥ তা হঠাৎ আপনার কাছেই বা ওরা এল কেন ?

টুনটুন ॥ উহারা বলে কিনা হামি বেলাক মার্কেটিয়ার আছি। হামি শালিমার রেলগুদামে মাল মাইনার পর মাইনা ডেমারেজ দিয়া ছাড়াই না।

সেন ॥ এ তো সত্যি কথা।

টুনটুন ॥ পুরা সাচ নেহি আছে। থোড়া থোড়া।

শঙ্কর ॥ না সব সত্যিকথা। বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে আপনারা অবাধে আমাদের শেষ করে দিচ্ছেন।

শংকর ॥ বছরের পর বছর কাপড, বেবীফুড, আনাজ, ওষুধ পত্র সব, সব আপনারা নষ্ট করে দিচ্ছেন। আপনাদের একটুও মায়া দয়া নেই। দেশের লোকের জন্য। আপনাদের গুলি করে মেরে ফেলা উচিত।

টুনটুন ॥ কসুর সব হামাদের নেহী আছে শংকরবাবু। ইসব কথা মিনিষ্টার-দের জিজ্ঞাসা করুন। মাল, মাল পাচারের জন্ত চান্দা না দিলে গুদামে মাল রাখতে দিতো। বলুন শংকরবাবু, মাল রাখতে দিত ?

শংকর ॥ অর্থাৎ আপনি এবং আপনারা নিজেদের স্বার্থের জন্য মিনিষ্টারদের অর্থ দিয়েছেন। সুতরাং আপনাকে মেরে আপনাকে ধ্বংস করে ওরা

খুব একটা ভুল করেনি। কারণ সমাজে আপনারাই এক শ্রেণীর মানুষ গড়ে তুলেছেন যারা উৎকোচ ছাড়া বাঁচতে পারে না।

টুনটুন ॥ সমুচ্চা কসুর হামাদের নেহী আছে শংকরবাবু। সরকারের ভী বহুৎ কসুর আছে। সরকার কেন ইসবের ইন্‌কোয়ারী করছে না?

শংকর ॥ সরকারের প্রতিনিধিদের মুখ নোট দিয়ে আপনারাই সেলাই করে রেখেছেন। আপনারা দেশের কুলাঙ্গার।

শেঠ ॥ গালি গুপ্তা করলে কি হবে শংকর বাবু। আগার দেখা যায় তো হামরা সকলেই সমাজের কুলাঙ্গার আছি। সো না হলে ছেলেগুলা বললে কেন লোট চাই না, ভোট চাই না। শুধু পেট পুরে খেতে চাই। শুধু খেয়ে পরে বাঁচতে চাই। মানুষের মত বাঁচতে চাই।

শংকর ॥ ঠিক তো বলেছে। কি হবে টাকা দিয়ে? টাকা তো আপনারও অনেক ছিল। টাকা আমার ছিল, ছিল মান, সম্মান, সমাজে প্রতিষ্ঠা ছিল। তবুও ওরা আমাদের ক্ষমা করেনি। রেহাই দেয়নি। আমরা মস্ত ভুল করেছি তার মাশুল তো গুণতেই হবে। টাকা তো সঙ্গে কেউ নিয়ে যাবে না। ইকনমিকস পলিসী একটা গোষ্ঠীর হাতে থাকলে—এইরকম বিপ্লব হবেই।

শেঠ ॥ হামার রুপাইয়া মেহনত করা আছে।

শংকর ॥ মেহনত করা নয়। বলুন—চুরি করা পয়সা, জোচ্চুরি করা পয়সা, লোক ঠকানোর পয়সা।

[নির্ঝর অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে বেরিয়ে আসে]

নির্ঝর ॥ Stop, stop that bloody lectures. দু কথায় যা শেষ হতে পারে তাকে ফ্যানাবার কোন প্রয়োজন নেই। শেঠ বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তাই ওরা ওর গদিতে ঢুকে ভোজালি দিয়ে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেয়। ওদের মতবাদ—"এরকম বদ শোষকের মত নরখাদকদের সমাজে বাঁচবার কোন অধিকার নেই।"

সেন ॥ ইউ অ্যাডমিট্ ইট টুনটুনবাবু?

টুন ॥ লেকিন হামি তো গঙ্গার ঘাটে মন্দির বানাইয়াছি। উহাতে কি হামার পাপ খণ্ডন হয় নাই ?

সেন ॥ অর্থাৎ আপনি নির্ঝরবাবুর কথা মেনে নিলেন। আপনি যেতে পারেন। শংকরবাবু আপনি বলুন।

[টুনটুনমল অন্ধকারে চলে যায়।]

নির্ঝর ॥ বলুন শংকরবাবু, আপনার কীর্তি কি আমিই প্রকাশ করে দেব না, আপনিই বলবেন ?

শংকর ॥ মৃত্যুর পর আমার আর কিছু গোপন করার ইচ্ছা নেই।

সেন ॥ আপনি কিছু বলতে চান নির্ঝরবাবু ?

নির্ঝর ॥ না বলতে চাইলে এখানে এলাম কেন ? অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে মানুষ আসে কেন ?

শংকর ॥ কেন ?

নির্ঝর ॥ নতুন করে ইনস্পিরেশন্ পাবার জন্য ! অন্ধকারের ঘোর কাটাবার জন্য। নতুন করে বাঁচবার জন্য।

সেন ॥ আপনি কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ান। এই মৃত আত্মার আদালতে আপনাকে witness হিসাবে এগজামিন করছে।

নির্ঝর ॥ তার আগে আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দিন। শুনেছি আপনাকে নাকি কোন party-এর লোক খতম করেছে। কেন খতম করেছে বলতে পারেন ?

সেন ॥ সে আমার জীবনের মস্ত এক কলঙ্ক। যা স্বপ্নে কোনদিন ভাবিনি তাই হোল আমার।

শংকর ॥ কি হোল আপনার ?

সেন ॥ গত বছর আমিই প্রশ্নপত্র সেট করেছিলাম। সেই প্রশ্নপত্রের খবর তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী জানতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তার ভাইপোকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে আমার বাড়ীতে হাজির। কি না আমি যে প্রশ্নপত্র সেট করেছি তার এক কপি তার চাই। কারণ অন্য সব প্রশ্নপত্র তার হস্তগত। কেবল আমারটাই ছাড়া। সেটা শিক্ষামন্ত্রীর ভাইপোকে এবছর London School of Economics-এ ভর্তি করতে হবে।

সুতরাং তাকে 85% Marks ক্যারী করতে হবে। কিন্তু সে ক্যালিভার তার নেই।

শংকর॥ আপনি প্রশ্নপত্র দিয়েছিলেন?

সেন॥ না।

নির্ঝর॥ তবুও পরীক্ষার আগে Economics-এর প্রশ্নপত্র Out হয়ে গিয়েছিল, এবং আপনি ফাঁকতালে বেশ কিছু কালো টাকা ঘরে তুলেছিলেন। তাই না?

সেন॥ আপনি জানলেন কি করে?

নির্ঝর॥ খবরে বেরিয়েছিল অন্য প্রশ্নপত্র সেট্ করা হয়েছে। কিন্তু সত্যি তা হয়নি। মাঝখান থেকে Tutorial Home-এর কাছে প্রশ্নপত্র বিক্রি করে……

সেন॥ আপনি জানলেন কি করে?

নির্ঝর॥ অথচ শিক্ষামন্ত্রীর ভাইপোকে সেদিন প্রশ্নপত্র দিয়ে দিলে আপনি প্রাণে বেঁচে যেতেন। আপনি তা করেন নি।

সেন॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। তা করিনি, করলে ভাল করতাম।

নির্ঝর॥ না ভাল করতেন না। আপনার মত কুৎসিত চরিত্র সমস্ত শিক্ষা জগতকে কলুষিত করেছে। এমন নোংরা শিক্ষাব্যবস্থার পেছনে যদি আপনাদের মহৎ দান থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের শিক্ষার মান অনেক উন্নত হবে।

সেন॥ আমার অন্যায় হয়ে গেছে—নির্ঝরবাবু।

নির্ঝর॥ এ অন্যায়ের মাপ নেই, প্রায়শ্চিত্ত নেই, এ অন্যায়ের ক্ষমা নেই। এ অন্যায়ের সাজা আপনি পেয়েছেন। Minister-এর ভাড়া করা গুণ্ডার গুলিতে, অথচ খবরের কাগজে বেরিয়েছিল ছেলেরা আপনাকে খতম করেছে।

শংকর॥ আমরা যেতে পারি মিঃ সেন?

নির্ঝর॥ না পারেন না। আরও একটু বাকী আছে। বলুন শংকরবাবু, আপনাকে হত্যা করা হলো কেন? মৃত্যুর পর খবরের কাগজের অর্ধেক স্থানটাই আপনি অধিকার করেছিলেন। সত্যি আপনি মহান।

সেন ॥ আপনি এত তথ্য জানলেন কি করে ?

শংকর ॥ সর্বঘটে কাঁঠালি কলা জানবে নাতো কি আপনি জানবেন মিঃ সেন ?

নির্ঝর ॥ মৃত আত্মার কাছে সত্য মিথ্যার কোন মায়াজাল নেই। স্বনামধন্য সাহিত্যিকের একটুকু জানা উচিত।

শংকর ॥ ভারতবর্ষে ব্যক্তি স্বাধীনতা যেমন আছে, তেমনি বাক-স্বাধীনতাও আছে। তাই আমি আমার প্রত্যেকটা উপন্যাসে রিয়ালিজমের ষ্টাইল মেনটেন্ করছি।

নির্ঝর ॥ Realism না কচু, ন্যাংটো কথা, উলঙ্গ দৃশ্যের অবতারণা করাকে তো Realism বলবেনই।

শংকর ॥ কেন "নিহত নায়িকা" উপন্যাস, "অনুজাক্ষ" উপন্যাস কি Realism নয় ?

নির্ঝর ॥ ও দুটো উপন্যাস আমি পড়েছি। সমালোচনাও পড়েছি—সুতরাং আমার কাছে মিথ্যা জয়গান গেয়ে কি লাভ ?

শংকর ॥ ও আপনারা ঘরে বসে, মাঠে, ময়দানে সিনেমায়, রেস্তোরায় পা ছোঁয়াছুয়ি করে ঠোঁট ঘষাঘষি করে, গা ঘষাঘষি করে যা খুশী তাই করবেন, আর তা আমরা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে অন্যায় করে ফেলেছি !

নির্ঝর ॥ যুক্তি যুক্তি যুক্তি। এই যুক্তি দিয়েই আপনারা আজকের সমাজকে আবরণহীন করে তুলেছেন। দিনের পর দিন ভদ্র পাড়ায় গড়ে উঠেছে বেশ্যা পল্লী। যুবক-যুবতীদের নৈতিক অধঃপতন হয়েছে, সমাজ বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে। আপনাদেরই অশ্লীল কথার মার-প্যাচে।

শংকর ॥ এখন যুগ অন্য স্রোতে প্রবহমান। সেই দিকে নজর রেখে আমরা এগোচ্ছি।

নির্ঝর ॥ মিথ্যা কথা। তাহলে নির্ঝর মিত্র আত্মহত্যা করত না। নির্ঝর মিত্র মরতো না শংকরেন্দু সেনগুপ্তকে বদনাম নিয়ে মরতে হত না।

শংকর ॥ আপনি আপনার বিবেক বুদ্ধি শিক্ষা মর্যাদার কথা একবারও চিন্তা করেননি। আপনি আমার বিবেকের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তাই আপনার এই দশা।

নির্ঝর ॥ তারজন্য আমার একটুও দুঃখ নেই, কারণ ঝর্ণা এবং আমি এক সঙ্গেই মরতে পেরেছি। সেজন্য আমরা আনন্দিত। আমাদের প্রেম ছিল সুন্দর। দুঃখ শুধু এখনও ঝর্ণার লাশ্ এখানে এল না, এলে পরে তার কথাও শুনতে পেতাম।

সেন ॥ অর্থাৎ আপনাদের জুটি বাঁধল না।

নির্ঝর ॥ আমরা স্বীকৃতি পেয়েছিলাম। আমাদের সেকেলে পার্টি তা মেনে নিতে পারেনি, তাই আমরা এ পথ বেছে নিয়েছি। মৃত্যুর সময় ঝর্ণার মুখে ছিল প্রাণবন্ত হাসি।

শংকর ॥ সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আপনারা নিজেদের সাধ-আহ্লাদের জন্য সমাজের কথা একবারও ভাবেন নি, এই ভাবেই আপনাদের খাম-খেয়ালীর জন্য এক একটি পার্টি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অথচ এসব যদি আমরা পাঠকগণের কাছে তুলে ধরি, প্রকাশ করি তাহলেই ভীষণ অন্যায় করে ফেলি, তাই না?

নির্ঝর ॥ আমাদের লিখতে বারণ করেছে কে? কিন্তু আপনারা আমাদের কথা না লিখে আমাদের চরিত্রকে বিকৃত করেছেন আপনার অস্নুগ্রাক্ষ উপন্যাসে মিত্রা আর প্রশান্তর যৌনদৃশ্যের সংলাপগুলো বর্জিত করলে কি চলতো না? ওগুলো বাদ দিলে কি বাজারে কম কাটতি হোত আপনার উপন্যাস খানার?

শংকর ॥ প্রকাশকদের, জিজ্ঞেস করুন, বাজারে যা demand আমরা সেই ভাবেই চলতে বাধ্য।

নির্ঝর ॥ অর্থাৎ আপনারা কতকগুলো খরিদ করা এস্‌কপিষ্ট, প্রকাশকরা যা বলবে, যে ভাবে চালাবে আপনারাও সেই ভাবেই চলবেন। আপনাদের কলমে প্রকাশকের পেচ্ছাব ভরা আছে। শুদ্ধ কালি নেই, যা দিয়ে এই অন্ধ তামস কাটতে পারে।

সেন ॥ অশ্লীল, অশ্লীল। নিয়মভঙ্গ হয়ে গেছে। আমি কোর্ট ডিসমিশাল করে দিচ্ছি।

নির্ঝর ॥ আর একটু বাকি আছে। বলুন শংকরবাবু আপনার মৃত্যুর জন্য আপনার কোন দুঃখ নেই?

শংকর ॥ আমি এত তাড়াতাড়ি মরতে চাইনি, তবুও মিথ্যে বদনাম নিয়ে মরতে হলো। মৃত্যু যখন হয়েছে তখন হা-হুতাশ করছি না, কিন্তু জোর গলায় বলবো যে এভাবে ধ্বংসের মধ্যে সমাজের উন্নতি হয় না। হয়নি, হবে না। একটা বুলেটেই কি মানুষের চরম সাজা হয়? আমি গুলি-বিদ্ধ হলাম। মৃত্যু কি আপনাদের কাছে এটা প্রমাণ করলো না যে, আমার অপরাধের সাজা আমি পেয়েছি। কিন্তু ব্যাপার একটু খতিয়ে দেখতে চেষ্টা করুন যে, মৃত্যুকে জয় করে আমরা এই চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি—মৃত্যুকে জয় করে সংসারের সব অভাব অনটনকে উহ্য রেখে পড়ে আছি এখানে। কোন সমস্যার মধ্যে পড়লাম না। সমাজকে কিছুই দিলাম না। বলুন পারবে আপনার চার দেওয়ালের ঘেরা আত্মারা এর কৈফিয়ত দিতে? হায়রে ধ্বংস প্রায় জাতি। সম্মুখে তোমার প্রবল বাধা, তার দিকে ধাবিত হও। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নয়। সমাজ চেতনার পথে মুক্তি আসবেই। মুক্তি আসতে বাধ্য।

নির্ঝর ॥ কাওয়ার্ড। চলুন মিঃ সেন। আলোর মধ্যে এসেও আমরা থাকতে পারলাম না। অন্ধকারই আমাদের ভাল, সমাজের কলঙ্ক। আমাদের স্বীকারোক্তি দেখে আজকের মানুষেরা যেন নিজেদের শুধরোবার চেষ্টা করে, তা না হলে যে অন্ধ তামসের মধ্যে এই অসহায় দেশের মানুষেরা বেঁচে আছে তাদের বিকাশ হবে না। শুধু তাই জবানবন্দী দিয়ে গেলাম—নিপীড়িত মানুষের কাছে, আর্তমানুষের কাছে তারা যেন আর আমাদের মত ভুল না করে।

সেন ॥ আপনাদের ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না।

শংকর ॥ ওরা আমাকে গুলি করেছিল। একটা নয় পর পর দুটো। দেহের সঠিক জায়গাগুলোতে। ওরা বলেছিল আমি অশ্লীল; আমি বুর্জোয়া, আমি বিদেশের চর, চোরাপথের অর্থলোভী সাহিত্যিক আমি—

নির্ঝর ॥ মিথ্যে নয় নিশ্চয়।

শংকর ॥ আপনার বয়স কম। কতটুকুই বা আপনি জানেন, কতটুকুই বা আপনার স্বচ্ছ দৃষ্টি ভঙ্গি।

নির্ঝর ॥ দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু আমাকে গুলি করেনি।

শংকর ॥ আপনি নিজেই আত্মহত্যা করেছেন। আত্মঘাতী হয়েছেন, তা একা হলেন না কেন, ঝর্ণাকে সঙ্গে নিলেন কেন?

নির্ঝর ॥ বিশ্বাস করতে পারিনি। মরেও মিল হয়নি। ঝর্ণাকে ছেড়ে গেলে, ওরা ছাড়ত না।

শংকর ॥ কারা?

নির্ঝর ॥ আমার পার্টির লোকেরা।

সেন ॥ আসল ঘটনাকে বলুন ডাক্তার আসার সময় হয়ে গেল।

নির্ঝর ॥ আমার ওপর অর্ডার ছিল, ঝর্ণাকে ছেড়ে দিতে হবে।

শংকর ॥ আপনার কাছে পার্টি বড় ছিল না ঝর্ণা।

নির্ঝর ॥ আপনার কাছে মা বড় না বাবা?

শংকর ॥ দুটোই।

নির্ঝর ॥ আমারও তাই।

সেন ॥ নির্ঝরবাবু তাড়াতাড়ি আপনার অধ্যায় শেষ করুন।

নির্ঝর ॥ অধ্যায় আমার কিছু নেই। মৃত্যু পরম শান্তি, মৃত্যু তুমি সুন্দর পার্টির কাছে আমি বিশ্বাসঘাতক। ওরা একটি শিশুকে হত্যা করতে বলেছিল। সত্যি একটি শিশুকে হত্যা করলে পার্টির ক্ষতি কিছুই হতো না, কিন্তু লাভ অনেক হত। ঝর্ণা রাজী হয়নি, আমিও না।

সেন ॥ কিন্তু শিশুটিকে কেন হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল?

নির্ঝর ॥ জানিনা। আমরা অর্ডার পাই, তামিল করি।

সেন ॥ কিন্তু আপনি তো তামিল করেন নি?

নির্ঝর ॥ না। তাই পার্টির নির্দেশে আমাদের সরিয়ে দেবার চক্রান্ত হল। কিন্তু সে চক্রান্ত ব্যর্থ কিংবা সফল যা ভাবুন তাই হয়েছে। আমরা দুজনে একসঙ্গে আত্মঘাতী হয়েছি।

সেন ॥ শিশুটিকে মারলেন না কেন?

নির্ঝর ॥ কারণ শিশুটিই ভবিষ্যত জীবনের কাণ্ডারী। ইতিহাস।

সেন ॥ আঃ শিশুটির কথা বলুন।

নির্ঝর ॥ পার্টির উদ্দেশ্য ছিল শিশুটিকে মেরে আমাদের এক কমরেডকে

ফুলটাইমার করে নেওয়া। কারণ ওই শিশুটিই ছিল কমরেডের। প্ল্যান ছিল শিশুটিকে মেরে কমরেডকে মুক্ত করা। সংসার থেকে মুক্ত করা।

সেন ॥ মানুষের মূল্য নেই।

নির্ঝর ॥ সকল মানুষের নেই। কারোর আছে, আমার মৃত্যু, ঝর্ণার মৃত্যু, ওই শিশুটির চেয়ে বেশী ছিল বলে আমরা এই পথ বেছে নিয়েছিলাম।

সেন ॥ সেই শিশটি বেঁচে আছে?

নির্ঝর ॥ না। না॥ [কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নিঝর।]

[মঞ্চ ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসে টেবিলের ওপর টুল নেই, লাশগুলো আগের মত পড়ে আছে। হিরুয়া মদ খেয়ে প্রবেশ করে। নেশায় টলছে। চুপচাপ থাকে হিরুয়া, আলো জ্বলে, ডাক্তার প্রবেশ করে।]

ডাক্তার ॥ কিরে শালার বেটা? আবার ধেনো গিলে এসেছিস?

হিরুয়া ॥ খোড়া না। মায়ের কসম্, বাপের কসম্ বলছি।

[বাইরে জনতার চিৎকার]

ডাক্তার ॥ শালার বেটা আর কপচাতে হবে না। শালা পেটে গেলে একেবারে মূর্তিমান ঈশ্বর, ন্যাকা বোকা। ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। নে শালার বেটা, লাশ নেবার জন্য বাইরে লোক চেঁচামেচি করছে। কাঁহাতক আর মিথ্যে কথা বলা যায়? নে ওঠা এটাকে।

[ডাক্তার ও হিরুয়া মিলে একটা করে লাশ ওঠায়, প্রয়োজনে অন্য কোন ডোমেরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে অবশ্যই হিরুয়া তাকে চিৎকার করে ডাকবে। একটার পর একটা লাশ কাটে আর ওঠায়। ডাক্তার নোট করে নেয় একটার পর একটা, হিরুয়া সব গোছাতে থাকে।]

ডাক্তার হিরুয়া·

হিরুয়া ॥ কি?

ডাক্তার ॥ আজকের লাশগুলোর পুলিশ Report শুনবি না?

হিরুয়া ॥ না—না।

ডাক্তার ॥ কেনরে শালার বেটা। রোজ তো শুনতে চাস। Report না শুনলে বলি তোর পেটের ভাত হজম হয় না। তা আজ কি হোল রে খেনো খেয়ে?

হিরুয়া ॥ ক্যা হোগা শুনকে? একই তো হোবে। হিন্দু যাবে শ্মশানে। মুসলমান যাবে কবরিস্তানে আউর খেরেস্তান যাবে দিবালওলা বাগিচা মে। সো বলছে ক্যায়া হোগা শুনকে?

ডাক্তার ॥ আজকের হিষ্ট্রীগুলো খুব মজাদার রে শালার বেটা মালখোর, শুনবি না?

হিরুয়া ॥ বোলিয়ে। হামার নিদ লাগছে জলদি বলিয়ে। মাল পিয়ে হামি আউর ঠিক থাকতে পারে না।

ডাক্তার ॥ তোর লজ্জা করে না?

হিরুয়া ॥ শরম লাগবে কাহে? হামার সে অত ছুপাছোবি নেহি আছে। দিল বেলায় সো দারু পিতে যাই।

ডাক্তার ॥ ইতর কুৎসিত। তোরাই সমাজের কলঙ্ক। আবর্জনা।

হিরুয়া ॥ হাম লোগ নেহী, আপলোগ, ঘুষ কা পয়সা সে সোমসার চলে আপলোগদের, হামার নেহী। হামি শালা ন্যাংটা। না ঘর না দুয়ার, লেকিন বুলে রাখছি হাঁ্যা কোই নেহী ছোড়েগা। যেমন করে উলোগ মরেছে। তেমনি কোরে আপনাকে মরতে হোবে।

ডাক্তার ॥ Shut up শুয়ারের বাচ্ছা, শালা জাতে ডোম, কথা বলবে মস্ত এক লাট সাহেবের মত। চুপ কর বলছি। হতচ্ছাড়া হাড়বেতে। তা—না হলে তোর চাকুরি নট্ করে দেব বলে দিচ্ছি।

হিরুয়া ॥ হামি ছোট জাত। নালা-নর্দমা সাফ করে চলে যাবে। লেকিন আপনি আপনার চাকরি গেলে বহু বেটীর ইজ্জৎ চলে যাবে।

ডাক্তার ॥ হিরুয়া। তুই আমায় এত বড় কথা বলতে পারলি? তোকে আমি রোজ টাকা দিই না?

হিরুয়া ॥ ওহি রুপাইয়াতে হামি ভুবনদাসীর ঘর যাই। খেনো পিলি।

হাপনার মতো খারাব আদমি কজনা আছে ? মরা লাশকেও ছোড়েন না। কপাইয়া দিলে মুর্দা সেলাই হোবে, নেহী এ্যাইসাই লিয়ে যাব। হাপনার নরকেও জগহ হোবে না। হাপনার রুপাইয়াতে হামি থুক ফেকে। থুঃ থুঃ থুঃ।

[হিরুয়া চলে যায়, ডাক্তার তাকে বাধা দেয়।]

ডাক্তার ॥ শোন হিরুয়া আমাকে একা ফেলে যাস না। আমাকে একা ফেলে যাস না। আমি ভালো হতে চাই হিরুয়া। আমি ভালো হতে চাই। আয় আমরা দু'জনে মিলে ভাল হতে চেষ্টা করি। তুই বেশ্যার ঘরে যাবি না তুই মদ খাবি না। আমি ঘুষ নেব না। যা করে এই কলঙ্কিত মানুষগুলো চিরনিদ্রায় শায়িত ওদের ছায়া থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই। তাই বলছি আমাকে একা ছেড়ে যাস না। আমি ভালো হতে চাই।

হিরুয়া ॥ হাঁ, হাঁ ডাকদার সাহাব। উলোগ জিন্দানে যো সমঝতে পারেনি সো উন্না মার গিয়ে সমঝছে। উলোগ জরুর হামলোগকো আচ্ছা হোতে বোলেছে। জরুর আচ্ছা হতে বলেছে।

[অন্ধকার নেমে আসে মুহূর্তের মধ্যে।]

নাট্যকারের ঠিকানা : 'অনির্বাণ' মনিরামপুর গভঃ কলোনী
বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

ভাঁড়

স্মরজিৎ দত্ত

চরিত্র

শৈলেন কর
কৌশিক
ক্যামেরাম্যান
রূপশ্রী
অমিতকুমার
বিভাস
অনন্ত
শেখর
এবং
কয়েকটি সংলাপহীন চরিত্র

[মঞ্চ : কালো পর্দা ঘেরা একটা ঘর। মঞ্চের পিছনের দিকে মাঝামাঝি অংশে একটি টেবিল ও একটি চেয়ার। তিনটি স্পষ্ট লাইট ব্যবহার করে মঞ্চকে প্রয়োজনমত তিনটি অংশ (জোন) হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।]

[মুখ্য চরিত্র শৈলেন কর মধ্যবয়স্ক। মুখে অতৃপ্তির ছাপ। পর্দা উঠতে দেখা যাচ্ছে একটি স্পট লাইট-এর আলোয় শৈলেন কি যেন লেখার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে এক একটা কাগজ ছিঁড়ে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে

ফেলছে। শৈলেন যখন লেখার চেষ্টা করছে তখন আবহ সঙ্গীতের মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা অংশ এক একটি জোনে অভিনীত হয়ে মিলিয়ে যায়। কখনো কেবল নেপথ্যে সংলাপ।]

[আবহ সঙ্গীতের মাঝে হঠাৎ বাধা]

নেপথ্যে (মহিলার স্বরে) ॥ (রেলের ব্রীজ পেরোনোর শব্দ) খোকা, খোকী, ছাখ, শ্যাস্‌বারের মত ছাইখ্যা ল'—সাড়া ব্রীজ, সাড়া ব্রীজ যায়...' (ব্রীজ পেরোনোর শব্দ বাড়লো) খোকা ছাখশস্‌ পদ্মা ক্যামন উথাল পাথাল করে ' (ব্রীজ পেরোনোর শব্দটা আবাহ সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে যায়)

[কয়েক মুহূর্ত পরে সামনের একটি অংশে। চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে দেখছে কৌশিক। কৌশিক বলে—

Silence, Light ready ?

নেপথ্যে ॥ OK !

কৌশিক ॥ Sound ?

নেপথ্যে ॥ OK !

কৌশিক ॥ Start Camera, Action ! (আবার অন্ধকার। আবহসঙ্গীত) একটি স্পটে রূপশ্রী ॥ সুলেখা তো শকুনের মত হামলে পড়ে। বাচ-বিচার নেই, কিচ্ছু নেই। আমি রিজেক্ট করলাম কি না করলাম ও accept করে নিল রোলটা ! বলুন professional decorum তো একটা আছে, না কি ? ও যদি না নিত আমি ঠিক বার্গেন করে script বদলাতে বাধ্য করতাম। [আলো মিলিয়ে যায়। আবহসঙ্গীত]

[আবার light এ কৌশিক ব্যস্ত হয়ে বোঝাচ্ছে]

'দুজনে ধাক্কা খেলেন। উনি বল্লেন sorry. আপনি বল্লেন idiot, উনি বলবেন sorry কইলাম তাও কন idiot—আশ্চর্য ? এইখানে দুজনের দুটো big closeup।

[আলো মিলিয়ে যায়। আবহসঙ্গীত]

একটি spot এ একটি ছেলে পরণে কোরাধুতি। অশৌচের পোশাক।

হঠাৎ থমকে তাকায়। চট করে বেরিয়ে যায় শৈলেন নিজের চেয়ারে বসে অস্থির ভাবে চুলে বিলি কাটতে থাকে।

(আবহসঙ্গীত)

[একটি spot এ বিভাস]

'ছেড়ে আসতে পারবে তোমার সিনেমা, প্রফেশনাল থিয়েটারের ভাঁড়ামো, সাংবাদিকের কাছে হ্যাংলামো? ছেড়ে আসতে পারবে তোমার টাকার লোভ, নাম-যশের লোভ। প্রতিপত্তির লোভ?...তুমি কোথাও গেলে ভীড় জমে যায়। লোকে তোমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ঐ দেখ, ঐ শৈলেন কর, ঐতো! তখন তোমার বুকের রক্ত ছলছলিয়ে ওঠে না শৈলেন দা? বলো, সে সব তুমি ছেড়ে আসতে পারবে?

[ঐ আলোটা মিলিয়ে যাবে। অন্য zoneএ শৈলেন আবার একটা কাগজ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে বিরক্ত মুখে উঠে দাঁড়ায়]

শৈলেন ॥ ধুর শালা! হবে না, হবে না, impossible। (সিগারেট ধরায়। পায়চারী করে) এটা কখনো সম্ভব? কি করে লিখবো? লেখা কি আমার কাজ? আমি তো একটা ভাঁড়, একটা জোকার। জোকারী করতে বলুন, ভাঁড়ামী করতে বলুন জমিয়ে রেখে দেব। সব হেসে কুটিকুটি হবে। অবশ্য আমাদের এমনি দেখলেই হাসে। কেন হাসে কে জানে। আমাদের হাসি দেখে হাসে, কান্না দেখে হাসে, কথা বলতে দেখলে হাসে, চুপ করে থাকতে দেখলে হাসে। পড়ে গেলে হাসে, উঠে দাঁড়ালে হাসে। কে জানে মরে যেতে দেখলেও হাসবে কিনা। কেন হাসে বলুনতো? আমারও তো দুটো হাত, দুটো পা, একটা মাথা আর সব মানুষের মত! তাহলে দেখলেই হাসি পাবে কেন? (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়) সবাই হাসে শুধু মিন্টু হাসে না। মিন্টু আমার ছেলে। আমি জানি ও কোনোদিনও হাসবে না। জানেন, আমাকে নিয়ে বোধহয় সবচেয়ে বেশী হেসেছে ভগবান। আমাকে সৃষ্টি করেই হেসেছে একটা প্রাণফাটা অট্টহাসি। সে হাসিটা এত তীব্র, এত ভয়ঙ্কর, যেন একটা আর্ত কান্নার চেয়েও ভীষণ। হাসি আর কান্না কখনো কখনো এক হয়ে যায়। গভীর

ভালবাসাও চোখে জল আনে। জানেন, সেই অট্টহাসিটা আমি এখনও হঠাৎ হঠাৎ যেন শুনতে পাই। আনমনে চমকে উঠি।

ইচ্ছে ছিল অমনি চমকে দেব সবাইকে। তাই শারদীয়া সিনেমা পত্রিকার এডিটার যখন লেখা চাইলেন তখন শেষ অবধি ঐ জন্তেই রাজী হয়েছিলাম। প্রথমে অবশ্য জানতাম আমার পক্ষে লেখা অসম্ভব, আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা বলুনতো, একটা ক্লাউন, একটা জোকার, একটা ভাঁড়, শুদ্ধ ভাষায় একটা হাস্যকৌতুক অভিনেতা—সে কখনো লিখতে পারে? অবশ্য বাংলা সাহিত্যের যা অবস্থা সব্বাই এক এক রাউণ্ড ট্রাই করে নিচ্ছে। সব্বাই লিখছে। এখানে চোর লেখে, পুলিশ লেখে, হিরো লেখে, জিরো লেখে, নেতা লেখে, বেশ্যা লেখে--সব্বাই লেখে, সাহিত্য করে, নবনব মুদ্রণ নিমেষে নিঃশেষিত হয়ে যায়। সব্বাই লেখে—লেখেনা শুধু লেখক সাহিত্যিক। সাহিত্য যেন রাস্তার বেওয়ারিশ ষাঁড়, মরে পড়ে আছে, মুচীগুলো কামড়াকামড়ি করছে কে কতটা ছাল ছাড়িয়ে দুপয়সা কামাতে পারে। তাই ভরসা করে আমিও ট্রাই করবো ভাবছিলাম।

কিন্তু কোত্থেকে শুরু করা যায়। শুরু করাটাই তো সমস্যা। হয়তো সবটাই কেবলই শুরু, কিংবা কিছুতেই সারাজীবন ধরে শুরুটাই করা গেল না। কে যেন বলেছিল, বিগিনীং ইস্ অফ্‌ন এ্যান এণ্ড। হয়তো তাই—শুরু আর শেষ গুলিয়ে যেতে যেতে কখন যেন এক হয়ে যায়। আঁতুড় ঘরের রক্তাক্ত অস্তিত্ব নিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আর্তচীৎকার দিয়ে শুরু, নাকি শ্মশানে চিতার আগুন আর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে শুরু? কে জানে? হ্যাঁ শ্মশানের কথায় মনে এলো। এই কদিন আগেই জহর রায় মারা গেলেন। শ্মশানে প্রচুর ভীড়। আমরা এত দুঃখের মধ্যেও খুশী, কেননা আর যাই হোক, আমাদের বিশ্বাস আবার সত্যি হলো—কোলকাতা শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে জানে, ভালবাসে। অস্বাভাবিক ভীড় দেখে আমরা অভিভূত। হঠাৎ চারদিকে গুঞ্জন। গুঞ্জন থেকে উচ্ছ্বাস, তার প্রকাশ প্রচণ্ড জোরে মুহুর্মুহু সিটী। কারা হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো—'ঐতো ঐতো গুরু এসে গেছে'। সিটির সঙ্গে কোমর দোলান উদ্দাম নাচ, আর চীৎকার 'গুরু গুরু'। বুঝলেন ব্যাপারটা? উত্তমকুমার

এসেছেন। মনে হল—জহর রায় তোমার শবদেহটা কোনো শিল্পীর শবদেহ নয়, ওটা একটা বেওয়ারিশ লাশ যাকে ঘিরে আজকের এই পৈশাচিক উল্লাসের সুযোগ। তোমার শিল্পীজীবন অর্থহীন জহর রায়, তোমার জীবনান্ত একটা নিছক মৃত্যুসংবাদ ছাড়া কিছু নয়।

ধ্যুৎ! এভাবে শুরু হয় নাকি! তার চেয়ে বরং সেই পেটেন্ট প্রশ্নটা দিয়েই শুরু করা যাক—আপনি প্রথম কি করে সিনেমা লাইনে এলেন? কিন্তু শুরুরও শুরু আছে। সিনেমায় নামার আগে আমি নাটক করতাম এখনও করি। অবশ্য এখনকার নাটকগুলোকে নাটক বলে ভুল করার কোনো কারণ নেই—প্রফেশনাল স্টেজে প্রফেশনাল ভাঁড়ের পার্ট করছি। নাটক প্রথম শুরু করেছিলাম সেই দামাল দিনের কলকাতায়। ছেঁড়া তার আর নবান্নের কলকাতা। নবজীবনের গানে কল্লোলিত কলকাতা। একদিকে প্রগতি লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ, অন্যদিকে গণনাট্য সঙ্ঘ। জর্জ বিশ্বাসের উদার কণ্ঠস্বর, বিকল মাইক্রোফোনের সামনে নিরাভরণ কণ্ঠে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠলাবণী—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। দেশ ভাগের যন্ত্রণায় কলকাতা তখন কাৎরাচ্ছে।

আমি পদ্মাপারের লোক। আমাদের চোখের জলের সঙ্গে রক্তের ফোঁটার তফাৎ ছিল না। শুরু করলাম উদ্বাস্তু সমস্যার ওপর নাটক। আমার চরিত্রটা ছিল শেয়ালদা স্টেশানে ঘর গেরস্থালী পাতা বুড়ো বাপের, অক্ষম বুড়ো। ঝড়ে ভেঙে গেছে, কিন্তু মরেনি। এ নাটকে আমার মেয়ে না খেতে পেয়ে প্লাটফর্মের সংসার ফেলে পালিয়েছে। আমরা দুঃখ পাইনি, কেননা ভেবেছিলাম যাই হোক মেয়েটা অন্তত খেতে পাবে। কিন্তু না, মেয়েটা নিজে না খেয়ে অন্যদের আর এক ক্ষিদের শিকার হয়েছিল। দুদিন পর তার লাশ ভেসে ওঠে গঙ্গায়। তৃতীয় দিন ভোরে তখন বোধহয় সবে প্রথম ট্রেণটা সিটি দিয়ে স্টেশান ছেড়েছে—

(মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। ট্রেণের শব্দ। আলো পড়ে একটি অংশে। বুড়ো অর্থাৎ শৈলেন শুয়ে আছে। তার ছেলেটা তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকছে—)

ছেলে ॥ বাবা, বাবা, ও বাবা

বুড়ো ॥ (ঘুমচোখে) এ্যাঁ, কি কস্?

ছেলে ॥ মতির লাশ পাওয়া গ্যাছে গঙ্গার পাড়ে—

বুড়ো ॥ (ধড়মড়িয়ে উঠে বসে) মতির লাশ? কস্ কি তুই?

ছেলে ॥ অরা মতিরে খুন কইর‍্যা ভাসায়ে দিছিল্, আইজ ভাইস্যা উঠছে গঙ্গায়—

বুড়ো ॥ (গভীর স্বরে) গঙ্গা! পতিতপাবনী গঙ্গা! মতিটার বড় ভাগ্যরে—

ছেলে ॥ কও কি বাবা?

বুড়ো ॥ তর মায়ের লাশটার ত' হদিশই মিলল না। ক্যাজানে কন্‌খানে পচ্‌ছে, শিয়াইল কুকুরে খাইসে? মতিটার তবু ভাগ্য—গঙ্গারে ত' পাইল!

ছেলে ॥ বাবা, তুমি কি পাগল হইস? (বুড়ো চুপ। চোখগুলো পাথরের চোখের মত ভাবলেশহীন) বাবা, মতির লাশ আনতে যাইবা না? সৎকার করবা না?

বুড়ো ॥ লাশ? মতির লাশ?…না ক্যান? লাশ ক্যান? শুধু মতির লাশ। আজতো সারা দ্যাশটাই দুইখান হইয়া লাশের মতো পইড়্যা আছে, আমার মতির মতো তারও সমস্ত গায়ে বীভৎস পৈশাচিক অত্যাচারের চিহ্ন।…নানা, তবু লাশ ফিরাইয়া দে, ত'রা লাশ ফিরাইয়া দে, আমার মতির লাশ ফিরাইয়া দে। আমি কাউরে ছাড়ুম না, কিছুতেই না। (অপ্রকৃতিস্থের মতো দৌড়ে বেরিয়ে যায়।)

ছেলে ॥ বাবা, বাবা—

(প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার। অন্য কোণে আলো পড়ে)

শৈলেন ॥ আমার এই অভিনয় দেখেছিল এক সিনেমা ডাইরেক্টারের দালাল, চাম্‌চা। ডাইরেক্টার ব্যস্ত লোক। সময় কম। তাই সাহিত্য-টাহিত্য ইত্যাদি খবর রাখা সম্ভব নয়। এই চামচাদের কেউ কেউ খবর নেয় কোন্ গপ্পোটা ফিল্‌মের উপযোগী, কখনও বা সিনেমার স্পেশালিস্ট গল্পলেখকের চামচার থেকে খবর নেয়, কখনও বা সরাসরি লেখকের কাছ থেকেই। কেউ কেউ আবার খবর আনে কে কোথায় কেমন অভিনয় করছে।

উঠ্‌তি অভিনেতারা এদের কৃপা পাবার জন্তে উন্মুখ হয়ে থাকে—ফিল্মে যদি একটা চান্স পাওয়া যায়। অমনি একজন চামচা খোঁজ করছিল ভাল বাঙাল বলিয়ে অভিনেতার। হঠাৎ কেন কে জানে আমায় চোখে ধরে গেল। শোয়ের পর সোজাসুজি জিগ্যেস করল—কি সিনেমায় অভিনয়-টভিনয় করার ইচ্ছে আছে নাকি? সিনেমায় অভিনয়? সে তো ভাবতেই পারিনা! বন্ধুরা বলল—লেগে যা, লেগে যা, তোর ভাগ্যে সিকে ছিঁড়েছে। সত্যিই সিকে ছিঁড়লো। স্ক্রীন টেস্ট-ফেস্ট হলো। স্যুটিং ডেট পড়ল। অনেক, অনেক আশা নিয়ে স্টুডিও ফ্লোরে এলাম। স্যুটিং চলছিল 'গাধুলী বেলা' ছবির। সিকোয়েন্সটা ছিল নায়িকা আমাকে অর্থাৎ বাঙাল চাকরকে একটা চিঠি দিয়েছে নায়ককে দিয়ে আসতে, নায়ক যেন আজ বিকেলে নায়িকার বাড়ী না আসে। কিন্তু আমি চিঠি দিতে যাওয়ার আগেই নায়ক এসে গেছে। সেই শটেরই টেক্ চলছে।

[মঞ্চ অন্ধকার সামনের স্টেজে আলো পড়ে। কৌশিক অর্থাৎ পরিচালক ভিউফাইণ্ডার দিয়ে নায়িকাকে অর্থাৎ রূপশ্রীকে দেখছে]

কৌশিক ॥ (ভিউফাইণ্ডার নামিয়ে) ওকে, সাইলেন্স। লাইট রেডী?

নেপথ্যে ॥ ওকে।

কৌশিক ॥ সাউণ্ড?

নেপথ্যে ॥ ওকে।

কৌশিক ॥ স্টার্ট, ক্যামেরা।

জনৈক ॥ (ক্লাপষ্টিক দেয়) সীন ফরটি ফোর, টেক ফোর।

কৌশিক ॥ এ্যাকশান!

রূপশ্রী ॥ (আবেগ ভরে অমিতের দিকে এগিয়ে আসে) না না আমি তোমায় বোঝাতে পারব না গো। তুমি বার বার ভুল বুঝছ। একটু ভেবে দেখ আমাদের সম্পর্ক—আমি মাষ্টার, তুমি ছাত্রী—

কৌশিক ॥ কাট্ কাট্! এই নিয়ে চতুর্থবার কাট করতে হল। একটু কনসেনট্রেট করুন, প্লীজ। ডায়লগটা তুমি মাষ্টার, আমি ছাত্রী।

রূপশ্রী ॥ (বিড়বিড় করে) তুমি মাষ্টার, আমি ছাত্রী। ওকে, ওকে।

কৌশিক ॥ রেডী, ষ্টার্ট এ্যাকশান—

রূপশ্রী ॥ না না, আমি তোমায় বোঝাতে পারবো নাগো। তুমি বার বার ভুল বুঝছো। একটু ভেবে দেখ আমাদের সম্পর্ক—তুমি মাষ্টার, আমি ছাত্রী—

অমিত ॥ জানি, আমি সব জানি রীতা, কিন্তু—

রূপশ্রী ॥ না, কোনো কিন্তু নেই। তুমি জানো না আমাকে নিয়ে সবাই মেতে উঠেছে—

কৌশিক ॥ কাট্ কাট্! মাতামাতি কোথায় এর মধ্যে? ডায়লগটা হলো আমাকে ঘিরে বিছানো এক গভীর ষড়যন্ত্রের জাল—

রূপশ্রী ॥ ওকে, ওকে।

কৌশিক ॥ ঠিক আছে? রেডী, ষ্টার্ট, এ্যাকশান—

রূপশ্রী ॥ না, না, আমি তোমায় বোঝাতে পারবো নাগো। তুমি বারবার ভুল বুঝছো। একটু ভেবে দেখ আমাদের সম্পর্ক—তুমি মাষ্টার, আমি ছাত্রী—

অমিত ॥ জানি, আমি সব জানি রীতা, কিন্তু—

রূপশ্রী ॥ না, কোন কিন্তু নেই। তুমি জানোনা আমাকে ঘিরে বিছানো কি এক গভীর ষড়যন্ত্রের জাল।...এখুনি অরুণ এসে পড়বে তুমি কথা দাও (হঠাৎ চাকরবেশী শৈলেনকে দেখে)। একি, তুমি ধ্বজের মতো দাঁড়িয়ে?

চাকর ॥ চিঠিটা।

রূপশ্রী ॥ চিঠিটা? ইউ স্টুপিড। সব শুনছিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

চাকর ॥ না, তুমি মাষ্টারবাবুরে পড়া দিতাছিলা, তাই—

রূপশ্রী ॥ তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো কি বলছিলাম—

চাকর ॥ শুনছি, কিন্তু বুঝি নাই। আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। পড়াশুনায় অত শক্ত শক্ত কথা বুঝি না, বুঝা বারণ।

রূপশ্রী ॥ ইউ বাস্টার্ড স্কাউণ্ড্রেল, তুমি চিঠিটা ওকে দাওনি কেন?

চাকর ॥ দিমু ক্যামনে? ওনার ত ত'র সয় না। আমি যাওনের আগেই

উনি আইস্যা পঁহছ্‌সেন। এমন মাষ্টার দেখি নাই বাবু, ঝড় নাই, জল নাই, ছুটী ছাটা নাই পড়াশুনার কি তাগিদ—

অমিত ॥ চোপ্‌!

চাকর ॥ এই চোপ দিলাম্‌—

রূপশ্রী ॥ আই সে, গেট আউট!

চাকর ॥ এ্যাঁ, কি কও?

রূপশ্রী ॥ আই সে, গেট আউট!

চাকর ॥ থাইসে! কি যে কও মাথামুণ্ডু, বুঝি না। যাই গিয়া।

রূপশ্রী ॥ যাও, বাঙাল কোথাকার। (শটের কম্পোজিশান ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে শৈলেন। অন্যরা বেরিয়ে যায়।)

শৈলেন ॥ বাঙাল কোথাকার!—গালাগাল! কোনো একটা দেশের ভাষা বলা, সেই দেশের মানুষ হওয়াটাই এদেশে হাস্যকর। হবে না? হাস্যকর হবে না? সে দেশের মানুষ যে ভাষার জন্যে প্রাণ দেয়, আমার সোনার বাঙলা গানের সুর গলায় নিয়ে মেশিনগানের সামনে বুক পেতে দিতে দ্বিধা নেই তাদের। আমরা তাদের দেখে হাসবো না তো কি! যাকৃগে, মরুকৃগে। কি হবে ও নিয়ে ভেবে? আমি তো অন্তত ওরই জন্যে তরে গেলাম। গোধূলী বেলায় আমার বাঙাল কথা আমায় সাকসেস এনে দিল। পরপর কনট্রাক্ট পেতে লাগলাম। না না, অভিনয় করার জন্যে নয়, ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বাঙাল কথা বলার জন্যে; ভাঁড়ামী করার জন্যে!

একটার পর একটা ছবিতে কনট্রাক্ট। ভীষণ ব্যস্ত। একদম সময় পাচ্ছি না। প্রত্যেকদিন তিন চারটে ফ্লোরে শুটিং থাকে। দেরি হয়ে যায় শুটিংএ পৌছতে। কিন্তু ওরা আমাকে ছাড়তে পারে না কেননা আমার বক্স অফিস হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সব রেডী করে ওরা আমার জন্যেও আজকাল অপেক্ষা করে থাকে—(আলো ম্লান হয়ে আসে। শৈলেনের প্রস্থান। আলো জোরাল হতে দেখা যায়, কৌশিক ব্যস্ত হয়ে পায়চারী করছে। ক্যামেরাম্যানের হতাশভাব)

ক্যামেরাম্যান ॥ দিস ইস টু মাচ দাদা

কৌশিক ॥ হ্যাঁ কি বলছ ?

ক্যামেরাম্যান ॥ বলছি ঐ শৈলেন করের জন্যেও শুটিং পোস্টপণ্ড করে বসে থাকতে হবে ?

কৌশিক ॥ কি করবো বলো, উপায় নেই।

ক্যামেরাম্যান ॥ উপায় নেই কি ? আপনারাই তো ওকে মাথায় তুলেছেন।

কৌশিক ॥ বক্স ব্যাপারটাও তো দেখতে হবে। শৈলেন যাই করুক আজ লোকে হাসবে। ওর বক্স আছে। ওর প্যাণ্ট খুলে গেলেও লোকে হেসে গড়িয়ে পড়ে—

ক্যামেরা ॥ আপনারাই তো এর জন্যে দায়ী।

কৌশিক ॥ আমরা ? প্রোডিউসার আগরওয়ালা পয়সাটা এমনি ঢালছে না। He wants return. তার সেফটি ভাল্ব হিসেবে চাই রূপশ্রীকে, অমিতকুমারকে আর ঐ শৈলেন করকে।

ক্যামেরা ॥ তার মানে সেক্স, গ্ল্যামার এ্যাণ্ড বাফুনারী! এই তো। এই নিয়েই তো বাংলা ছবি।

কৌশিক ॥ মাইথলজিটা বাদ দিলে যে ফর্মুলা থেকে ?

ক্যামেরা ॥ ঐ একই ব্যাপার। সেনসরশিপের ধাঁধায় সেক্স নিয়ে হাঙ্গামা তাই মাইথলজিক্যাল ছবিতে উর্বশী ন্যাংটো হয়ে নাচলেও সেটা মাইথলজির পাশপোর্ট পেয়ে যাবে। এই তো ব্যাপার—

কৌশিক ॥ না ঠিক তা নয়, আসলে লোকে এখন মাইথলজিটা নিচ্ছে ভাল। দেখছো না বাজার।

ক্যামেরা ॥ তাহলে আপনারা—এইসব প্রগ্রেসিভ পরিচালক, সাহিত্যিক, শিল্পী, নেতা সবাই মিলে এদ্দিন করলেনটা কি ? আশ্চর্য লাগে যখন দেখি লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিলে লাইন যত বড়, ঐসব ছবির টিকিট কাউন্টারে কিংবা কালীঘাটের মন্দিরে লাইন তার চেয়ে ছোট নয়। আপনাদের ঐসব আন্দোলন ইস নাথিং বাট এ সুপার ফ্লপ—

(শৈলেনের প্রবেশ)

শৈলেন ॥ কে, কে ফ্লপ করলো (কৌশিক, ক্যামেরাম্যান দুজনেই শশব্যস্ত উঠে দাঁড়ায়)

কৌশিক ॥ (বিগলিত ভাব) কি, কোন স্টুডিওয় ছিল শুটিং ?

শৈলেন ॥ ইন্দ্রপুরী। আর বলবেন না মশাই, ইন্দ্রপুরী থেকে এখানে এইটুকু আসতেই পাক্কা এক ঘণ্টা।

কৌশিক ॥ কেন ?

শৈলেন ॥ আর কেন—মিছিল। পাক্কা দেড় মাইল লম্বা মিছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাওয়া সেলিব্রেট করতে সভায় যাচ্ছে মিছিল করে—

কৌশিক ॥ এই গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যাপারটা যে কখন যায় আর কখন আসে সেটাই বুঝি না।

শৈলেন ॥ মুশ্‌কিল, বোঝা খুব মুশ্‌কিল।

ক্যামেরা ॥ কেন ?

শৈলেন ॥ বায়বীয় পদার্থ তো। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিংবা বলতে পারেন অনেকটা ভগবানের মতো। অদৃশ্য, কিন্তু আছে—আছে জান্‌তি পারোনা।

ক্যামেরা ॥ মনে হচ্ছে গণতন্ত্র সম্বন্ধে আপনার একটা স্পেশাল এ্যানালিসিস রয়েছে—

শৈলেন ॥ ঠিক এ্যানালিসিস নয়, গণতন্ত্রের প্যারালিসিসের ওপর একটা সংজ্ঞা—

কৌশিক ॥ শুনি, আপনার সংজ্ঞাটা কেমন।

শৈলেন ॥ (স্কুলে পড়া দেওয়ার স্বরে) জনগণের শবের উপর বসিয়া যে তান্ত্রিক শবসাধনা করা হয় তাহাকেই গণতন্ত্র বলে—

ক্যামেরা ॥ আপনার এইসব ব্যাপারগুলো হালকা করতে করতে এমন পর্যায়ে এনে ফেলেছেন যে—

শৈলেন ॥ যে একেবারে পল্‌কা হয়ে গেছে—এই তো ? বুঝলেন মশাই আপনাদের এইসব ইজমগুলো নিয়ে একটা বেশ মেডইজী উদাহরণ শুনলাম—

কৌশিক ॥ কি রকম উদাহরণ ?

শৈলেন ॥ ধরুন আপনার দুটো ছাগল আছে—

কৌশিক ॥ ছাগল ? রাজনীতি চর্চায় ছাগল !

শৈলেন ॥ ইয়েস ছাগল আর পাগল এই নিয়েই তো এখানকার রাজনীতি। ছাগল হচ্ছি আমরা যারা ঐ গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত হয়েছি, আর পাগলের কারখানা তো দেখছেনই। যে যত বেশী পাগলামী করতে পারবে সে নির্বাচনে তত বড়ো জায়েন্ট কিলার।

ক্যামেরা ॥ কিন্তু সব জায়গায় তো আর একই ব্যাপার চলছে না—

কৌশিক ॥ আহ্ থামুন না, ওঁর ছাগলের এ্যানালিসিসটা শুনি। ইণ্টারেষ্টিং! বলুন—

শৈলেন ॥ ধরুন, আপনার দুটো ছাগল আছে। সোশ্যালিজিমে ঐ ছাগল দুটো ভাগাভাগি হবে আপনার আর আপনার প্রতিবেশীর মধ্যে, কমিউনিজিমে দুটো ছাগলই স্টেট নিয়ে নেবে, এবং আপনাকে দরকার মত দুধ দেবে। ফ্যাসিজিমে ঐ দুটো ছাগল ওরা কেড়ে নিয়ে রান্না করে মাংস খাবে আর আপনাকে গুলি করে মেরে ফেলবে এবং গণতন্ত্রে দুটো ছাগলই রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে যাবে। তার একটা না খেতে পেয়ে মরে যাবে, অন্যটার দুধ দুয়ে ফেলে দিয়ে রাশিয়া কিংবা আমেরিকা থেকে দুধ ইমপোর্ট করা হবে।

[সবাই হাসে। রূপশ্রীর প্রবেশ। সঙ্গে সিনেমা পত্রিকার সাংবাদিক নীরেন এবং একজন ফোটোগ্রাফার। ফটোগ্রাফার কেবলই রূপশ্রীকে নিয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত।]

রূপশ্রী ॥ (ন্যাকামীর স্বর) আমরা নিশ্চয়ই শৈলেনবাবুর একটা আইটেম মিস করলাম। সত্যি আপনি যা হাসাতে পারেন না শৈলেনবাবু—

শৈলেন ॥ আপনার সুন্দর মুখে হাসি ফোটানোয় যে কি আনন্দ!

রূপশ্রী ॥ আপনি আবার লেগপুলিং করছেন—

শৈলেন ॥ কি যে বলেন, সে সৌভাগ্য কি আমার হবে?

রূপশ্রী ॥ দেখছেন নীরেনবাবু অসভ্যতাটা। ওহো, আপনার সঙ্গে তো আলাপই করিয়ে দেওয়া হল না। (শৈলেনকে দেখায়) ওঁকে তো চেনেনই—

নীরেন ॥ (নমস্কার করে) হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই—(কৌশিক ঘড়ি দেখে বারবার)

শৈলেন ॥ (প্রতিনমস্কার) আমার সঙ্গে আলাপ নয়, প্রলাপ বকতে হবে—

রূপশ্রী ॥ ইনি নীরেনবাবু। নীরেন...কি যেন বল্লেন পদবীটা ?

নীরেন ॥ নীরেন মুখার্জী।

রূপশ্রী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ নীরেন মুখার্জী, চলচ্চিত্র পত্রিকার সাংবাদিক। (কৌশিককে দেখায়) ইনি কৌশিক সান্যাল, এই ছবিটা পরিচালনা করছেন।

কৌশিক ॥ (নমস্কার করে) খুব ভাল হল আপনি এসেছেন। (ঘড়ি দেখে)

রূপশ্রী ॥ উনি আমার বাড়ী এসেছিলেন একটা স্পেশাল কাভারেজের জন্যে। আমি ওঁকে জোর করে এখানে নিয়ে এলাম।

কৌশিক ॥ খুব ভাল, খুব ভাল করেছেন। (ঘড়ি দেখে) তা আমরা এবার শুরু করি। কৌশিকবাবুও রয়েছেন—(নীরেনকে) একটু দেখুন বইটা কেমন এগোচ্ছে—

রূপশ্রী ॥ হ্যাঁ, আপনারা রেডী হয়ে নিন্, আমি ততক্ষণে বাকীটা সেরে নিই নীরেনবাবুর সঙ্গে—

কৌশিক ॥ আমরা রেডী। শুধু লাইটটা একটু—

রূপশ্রী ॥ বেশতো, আপনারা করুন। আমরা ততক্ষণে—। আসুন নীরেনবাবু (রূপশ্রী নীরেনকে নিয়ে একটা কোণে বসে। কৌশিক ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে মুকাভিনয়ের সাহায্যে আলোচনা করার ভাব করে। আলোর দিকে মাঝে মাঝে দেখায়। শৈলেন স্ক্রীপ্ট দেখতে থাকে একমনে)

নীরেন ॥ শুনলাম আপনি নাকি 'আঁধার রাত' ছবিতে শেষ অবধি সই করলেন না ?

রূপশ্রী ॥ কি করে করবো বলুন, স্ক্রীপ্ট এতো বাজে না, কি বলবো ?

নীরেন ॥ বাজে মানে ?

রূপশ্রী ॥ বাজে মানে ঐ আর কি—ক্যামেরা সারাক্ষণ অমিতকেই ফলো করছে, রূপশ্রী যেন ফ্যাল্না। এমন কি আমার একটা নাচের সিকোয়েন্সেও ক্যামেরা অমিতের চোখের একটা বিগ ক্লোজ শট নিচ্ছে—আশ্চর্য !

নীরেন ॥ হয়তো, ঐসময়ে নায়কের রিএ্যাকশানটা বোঝাবার জন্যে—

রূপশ্রী ॥ (উত্তেজিত) নাচের সিকোয়েন্সের নাচ বড়ো, না নায়কের রিএ্যাকশান বড়ো ?

নীরেন ॥ হ্যাঁ, সেতো ঠিকই বিশেষ করে আপনি যখন নাচছেন! আচ্ছা শুনলাম ও রোলটা নাকি শেষ অব্দি সুলেখা পেয়েছেন?

রূপশ্রী ॥ সুলেখাতো শকুনের মত হামলে পড়ে। বাচবিচার নেই, কিচ্ছু নেই। আমি রোলটা রিজেক্ট করলাম কি না করলাম ও অমনি এ্যাক্সেপ্ট করে নিল? বলুন প্রফেশানাল ডেকোরাম তো একটা আছে না কি? ও যদি না নিত, দেখতেন আমি ঠিক চাপ দিয়ে স্ক্রীপ্টটা বদলাতে বাধ্য করতাম। (ক্যামেরাম্যানের গলা শোনা যায়। নীরেন-রূপশ্রী মূকাভিনয় করতে থাকে)

ক্যামেরা ॥ (উপরের দিকে তাকিয়ে) আট নম্বর কাটো একটু। আট নম্বর এ্যাই আট নম্বর—

কৌশিক ॥ কিরে বাবা এ জবাব দেয় না কেন? শক-ফক খেয়ে মরলো নাকি? এ্যাই আট নম্বর—

ক্যামেরা ॥ (উপরের দিকে) সাত, দেখোতো কি হলো ওর। (সবাই উপরের দিকে তাকিয়ে) ওখানকার ওয়্যারিংগুলো ঠিক সুবিধের নয়, লোকগুলো ঐভাবে বসে থাকে।

কৌশিক ॥ (উপরের দিকে) সাবধান, সাবধান। (সবাই উপরের দিকে তাকিয়ে। কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে। হঠাৎ সবাইর মুখ হাসি হাসি হয়) কি কি হয়েছিল কি তোমার?

নেপথ্যে ॥ লাইটের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে নিয়ে ব্যাটা ঘুমোচ্ছিল—

কৌশিক ॥ ঘুমোচ্ছিল? ইয়ার্কি নাকি? মারা পড়লে তখন?

নেপথ্যে ॥ পার্টটাইম করেতো, নাইট ডিউটি দিয়ে এসে কাজ করছে। তাই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

রূপশ্রী ॥ (ন্যাকামীর ভাব) উহ্, আমার যা ভয় হচ্ছিল না—বুক ধড়াস ধড়াস করছিল একেবারে। শেষে আমাদের নিয়েও থানা পুলিশ টানাটানি হতো।

কৌশিক ॥ আসুন তাহলে সিকোয়েন্সটা দেখে নিন।

রূপশ্রী ॥ হ্যাঁ শুরু করুন, আমারও তাড়া আছে (রূপশ্রী এগিয়ে আসে)। মেকাপটা বোধহয় এতক্ষণে নষ্ট হয়ে গেল।

কৌশিক ॥ শট নেওয়ার আগে আরেকবার টাচ করে নিলেই চলবে।

রূপশ্রী ॥ শট নেওয়ার আগে মানে? এখন শট নিচ্ছেন না?

কৌশিক ॥ (আমতা আমতা করে) না মানে একটু রিহার্সাল দরকার—এ্যাকশান বেশী তো।

রূপশ্রী ॥ এ্যাকশানটা কেমন শুনি।

কৌশিক ॥ হ্যাঁ বলছি। শৈলেনবাবু কই, আসুন।

[শৈলেন এগিয়ে আসে। বিভাসের প্রবেশ]

কৌশিক ॥ কাকে চাই?

বিভাস ॥ শৈলেনদা—

শৈলেন ॥ আরে বিভাস, তুই?

বিভাস ॥ একটু কথা ছিল।

শৈলেন ॥ বোস বোস, শটটা সেরে নিয়েই আসছি।

রূপশ্রী ॥ (নীরেনকে) আপনি যাবেন না যেন, কথা আছে।

নীরেন ॥ না না আমি আছি। শটটাও দেখবো আর তাছাড়া শৈলেন—বাবুর সঙ্গেও একটু কথা আছে—

কৌশিক ॥ আসুন—(একটা অংশ দেখায়) এইটা ক্যামেরা জোন। (শৈলেনকে দেখায়) উনিও একজন নায়ক—

রূপশ্রী ॥ (শৈলেনের দিকে আড়চোখে তাকায়) নিশ্চয়ই বাঙাল?

শৈলেন। তা আর বলতে!

রূপশ্রী ॥ আপনি কিন্তু বেশী হাসাবেন না আমায়—প্লীজ!

কৌশিক ॥ (রূপশ্রীকে) আপনি কলেজ সেরে ফিরছেন। উনি ওদিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসে এখানটায় বাঁক নিচ্ছেন। দুজনে ধাক্কা খেলেন। উনি বল্লেন, সরি, বলে বই তুলে দিতে গেলেন, আপনিও নীচু হলেন, দুজনের আবার মাথায় ঠোক্কর। উনি আবার বল্লেন, সরি। বুঝতে পারলেনতো ব্যাপারটা—

শৈলেন ॥ সব বুঝছি, বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন—

রূপশ্রী ॥ আর ডায়লগ নেই?

কৌশিক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, এইতো (স্ক্রীপ্টটা দেখে) উনি বল্লেন সরি, আপনি

বল্লেন ইডিয়েট। উনি তখন বলবেন—সরি কইলাম, তাও কন ইডিয়েট, আশ্চর্য! এইখানে দুজনের দুটো বিগ ক্লোজ। তারপর মিডলঙে এসে ষ্টীল হয়ে যাচ্ছে, তার ওপরই টাইটেল্স। নিন্…আসুন। (ওরা দুজনে এগিয়ে আসে। কৌশিক ঐ অংশটা আবার দেখায়) এইখানটা এ্যাকটিং জোন। শৈলেনবাবু, আপনি এদিক দিয়ে বাঁক নেবেন যাতে একটা টার্নিং এ্যাকশান থাকে। রূপশ্রী দেবী, আপনি এদিকটা দিয়ে আসুন। রেডী? (সবাই মাথা নাড়ে) দাঁড়ান (ক্যামেরার পিছনে গিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে) হ্যাঁ নিন্, স্টার্ট। (দুজনে দুদিক থেকে আসে। রূপশ্রী জোনের বাইরে চলে যায়) না না রূপশ্রী দেবী আপনি জোনের বাইরে চলে যাচ্ছেন, আরও ডাইনে চেপে আসুন—

রূপশ্রী ॥ এইখানে ঠিক আছে?

কৌশিক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আবার শুরু করুন (দুজনে দুদিক দিয়ে আসে) ধাক্কা খায় (রূপশ্রী ক্যামেরার দিকে পিছন করে আছে) রূপশ্রী দেবী, ক্যামেরায় কম্প্লিট ব্যাক না, প্রোফাইল, প্রোফাইল (রূপশ্রী ঘুরতে থাকে ধীরে ধীরে)। হ্যাঁ ঠিক। নিন্ শুরু করুন আবার। শৈলেনবাবু স্পীডটা একটু বাড়বে। (শৈলেন মাথা নাড়ে। যথা নির্দেশ করে। সজোরে ধাক্কা খায়। রূপশ্রী টাল সামলাতে না পেরে বেসামাল হয়ে যায়। কাঁধে ধাক্কার চোটে উহ্ করে ওঠে) ওকে! বিউটিফুল!

শৈলেন ॥ সরি [রূপশ্রী কাঁধ ধরে বসে পড়েছে]

কৌশিক ॥ এ্যাকশান, এ্যাকশান রূপশ্রী দেবী।

রূপশ্রী ॥ কাঁধে ভীষণ লেগেছে, উহ্। (ফ্লোরে বসে পড়েছে)

শৈলেন ॥ সরি, সরি।

[সবাই দৌড়ে আসে। শৈলেন ওকে হাত ধরে তুলতে থাকে। নীরেনের ইঙ্গিতে ফটোগ্রাফার দৌড়ে এসে ঐ ছবিটা তুলতে থাকে]

রূপশ্রী ॥ (কঁকাতে কঁকাতে) মুখটা যেন বেশী বিকৃত না দেখায় প্লীজ। কি এ্যাঙ্গেল থেকে নিচ্ছেন? ধ্যাৎ, ও এ্যাঙ্গেলটা আমার ভাল আসে না।

[ফটোগ্রাফার বিভিন্ন দিক থেকে ছবি তুলতে থাকে।]

রূপশ্রী ॥ আমি আজ আর শট দিতে পারবো না কৌশিক বাবু—

কৌশিক ॥ আর পারবেন না ? তাহলে—?

রূপশ্রী ॥ যা হয় করুন, আমি প্রচণ্ড ইনজিওর্ড—

কৌশিক ॥ তাহলে তো প্যাকআপ করা ছাড়া উপায় নেই। খুব লেগেছে? ডাক্তার ডাকবো নাকি ?

রূপশ্রী ॥ না না আমি সোজা বাড়ী যাচ্ছি। ম্যাসেজ নিতে হবে। কদিনের ধাক্কা আবার কে জানে। চলুন, নীরেনবাবু—

নীরেন ॥ এ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে এই অবস্থায় যাবেন ? একটু বরং রেস্ট নিয়ে নিলে পারতেন।

রূপশ্রী ॥ সেই ভাল। আমি মেকাপরুমে বসছি। মিনিট পনেরো পর বেরোবো।

নীরেন ॥ আমি ততক্ষণে শৈলেনবাবুর সঙ্গে কথাটা সেরে নিই। (রূপশ্রী মাথা নেড়ে বেরিয়ে যায়। শৈলেন ওদিকে বিভাসের সঙ্গে মূকাভিনয়ে কথা বলছিল। পরবর্তী সংলাপ চলাকালীন নীরেন, শৈলেন ও বিভাস ছাড়া অন্যরা বেরিয়ে যায় ধীরে ধীরে) শৈলেনবাবু, একটু কথা ছিল।

শৈলেন ॥ হ্যাঁ বলুন না। আসুন বসুন। বোস বিভাস বিভাস কি যেন বলছিলি, তোদের নাটক অনন্ত ডাইরেকশান দিচ্ছে ?

বিভাস ॥ হ্যাঁ বল্লাম তো। আমরা সামনের মাসে প্রোডাকশান নামাবো। প্রোডাকশনের খরচ বাবদ কিছু টাকা দরকার। তোমরা ইউনিটের পুরোনো—

শৈলেন ॥ (হঠাৎ নীরেনকে) দেখলেন তো, শটটা বনচাল হয়ে গেল। সব আপসেট। এইভাবে আমাদের সময়গুলো যায়—নিজেরাই দেখলেন তো। আর আপনারা বলেন ছবি তৈরী হতে দেরি হয় কেন—

নীরেন ॥ এ তো আপনাদের হাতের বাইরে। আপনারা আর কি করবেন ?

শৈলেন ॥ ঐ তো কিসুই হাতে নেই। সব তাঁর ইচ্ছে। আমরা শুধু পুতুলের মতো নাচছি—

বিভাস ॥ শৈলেনদা, তাহলে আমাদের—

শৈলেন ॥ হ্যাঁ, কি বলছিলি, অনন্ত ডাইরেকশান দিচ্ছে, এ্যাঁ ?

বিভাস ॥ হ্যাঁ তাই প্রোডাকশান কস্টের—

শৈলেন ॥ বুঝলেন নীরেনবাবু, এই নাটক—নাটকই হচ্ছে আসল নাটকে অভিনয় করে যে একটা দারুন আনন্দ, যে স্যাটিশ্‌ফ্যাক্‌শান—

নীরেন ॥ যারা সত্যিকারের অভিনেতা তারাতো নাটক পছন্দ করবেনই।

শৈলেন ॥ বুঝলেন ফিলমের অভিনয়ে সেই কমিউনিকেশানের আনন্দটা নেই, নাটকে যে ডিরেক্ট কমিউনিকেশন।

নীরেন ॥ আপনি এ অব্দি কটা ফিল্মে রোল করেছেন ?

শৈলেন ॥ তাতো গুণে বলতে হবে। ধরুন গোটা পঁচিশেক হবে প্রায়।

নীরেন ॥ পঁচিশ ? সমস্তই কমেডিয়ান রোল ?

শৈলেন ॥ হ্যাঁ, একেবারে ব্রাণ্ডেড কমেডিয়ান—

বিভাস ॥ (বিরক্ত) শৈলেনদা, আমাদের প্রোডাক্‌শান কস্টের ব্যাপারে—

শৈলেন ॥ তোরা সত্যি দেখালি ! অনন্তও ডাইরেকশান দিচ্ছে, এঁ্যা ! বুঝলেন নীরেনবাবু, এই ছেলেগুলো, এদের সিনসিয়ারিটি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এইটুকু টুকু ছেলে ! প্রথম যখন নাটক করতে এলো কথা বলতে গলা কাঁপতো, ষ্টেজে দাঁড়াতে পা টোলতো। কিরে মনে আছে সব ? অথচ আজ, কি আত্মবিশ্বাস—

নীরেন ॥ ষ্টেজ সম্বন্ধে আপনার খুব দুর্বলতা আছে, আপনার একটা ইন্‌টারভিউতেও পড়েছিলাম—

শৈলেন ॥ আরে মশাই অভিনেতার তো ষ্টেজই সব। ওখানেই তো অভিনয়ের আসল এক্সপেরিমেণ্ট, আসল চ্যালেঞ্জ। বিদেশী এ্যাক্টরদের দেখুন না, স্যার লরেন্স অলিভিয়ার থেকে শুরু করে পিটার ওটুল

নীরেন ॥ কিন্তু চার্লি—

শৈলেন ॥ চার্লি ইজ্‌ চার্লি।

বিভাস ॥ শৈলেনদা, যে কথাটা বলছিলাম। আমার একটু তাড়া ছিল।

শৈলেন ॥ বুঝলি বিভাস। তোরা সত্যি অবাক করে দিয়েছিস। অনন্ত ডাইরেকশান দিচ্ছে, এঁ্যা ! বুঝলেন নীরেনবাবু এরা এতো কষ্ট করে—

বিভাস ॥ (প্রচণ্ড বিরক্ত) তুমি ব্যস্ত আছ শৈলেনদা। আমি আজ আসি।

শৈলেন॥ যাচ্ছিস। আয়। দেখা করিস মাঝে মাঝে। তোদের দেখলেও ভাল লাগে।

বিভাস॥ আমরা প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলায় রিহার্সালে বসছি। ওখানে খোঁজ করলেই পাবে আমাদের। আসি।

শৈলেন॥ আয়। (বিভাসের প্রস্থান)

নীরেন॥ আচ্ছা শৈলেনবাবু; আপনি প্রফেশানাল ষ্টেজেও তো প্রচুর নাটক করছেন?

শৈলেন॥ হ্যাঁ, করছি; মানে করতে বাধ্য হচ্ছি আর কি?

নীরেন॥ কেন বাধ্য কেন? আপনারা আছেন বলেই তো ওখানে চুটিয়ে ব্যবসা চলছে। আপনাদের বাদ দিয়ে—

শৈলেন॥ না ঠিক বাদ দেওয়ার ব্যাপার নয়—বাদ দেবেই বা কেন? আর আমরাও তো চাই ষ্টেজে থাকতে। হাজার হোক এ্যালায়েড ব্যাপার। আমরা জানি, আমাদের গ্ল্যামারের, বক্স অফিসের সুযোগ ওরা নিচ্ছে। নিক্, তাতে আমার কি এসে গেল? আফটার অল ইট্‌স মাই প্রফেশান। তাছাড়া (নীরেনের সামনে থেকে উঠে অন্য Zoneএ চলে আসে)... তাছাড়া...(ধীরে ধীরে নীরেনের উপর থেকে আলোটা মিলিয়ে যায়)। (অন্য Zoneএ এসে স্বর বদলে যায়) তাছাড়া আমাদেরও আর্থিক সিকিউরিটির প্রশ্ন আছে। অভিনয় জগতে আমায় বেঁচে থাকতে হবে। প্রফেশানাল ষ্টেজে, সিনেমায় রেগুলার পয়সা, সম্মান, পাবলিসিটি।... প্রয়োজন, এগুলো সমস্তই প্রয়োজন। এসব বাদ দিয়ে আমি অভিনয় জগতে থাকবো কি করে? মাঝে মাঝে ভাল রোলের জন্যে মনটা কেমন করে, কিছুই পাই না ভাঁড়ামো ছাড়া। তবু থাকতে হবে। ঐ ভালো রোলের লোভটুকু ছাড়তে হবে। কম্প্রোমাইজ। না না, এখানে ফেড আউট হয়ে যাওয়া চলে না। একবার পাদপ্রদীপের আলো থেকে সরে গেলে অনন্ত অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই।...কথাগুলো কেমন যেন সাফাই গাওয়ার মতো শোনাচ্ছে—না?...জানেন, ঐ বিভাস, অনন্ত ওদের দেখলেই নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয়। কিন্তু আমি তো কোনো অপরাধ করিনি। কি করতে পারতাম আমি? ওদের সঙ্গে গিয়ে

দাঁড়াতে, ওদের সঙ্গে অভিনয় করতে ভীষণ ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। আচ্ছা, একদিন ওদের রিহার্সালে গেলে কেমন হয়?

[আলো নিভে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আলো জ্বললে দেখা যাবে অনন্ত ও বিভাস বসে কথা বলছে। অন্যরা রিহার্সাল শুরুর অপেক্ষায়—মুখাভিনয় করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে]

অনন্ত ॥ তার মানে তোকে পাত্তাই দিল না?

বিভাস ॥ তুই বিশ্বাস করবি না অনন্ত, কথাগুলোও কেমন কায়দা করে এড়িয়ে যাচ্ছিল—

অনন্ত ॥ তুই যাই বল্ শৈলেনদা একেবারে বদলে যাবে বিশ্বাস করা শক্ত। এখনও তো ও ওদের শিল্পী ইউনিয়নেও লীডিং রোল নেয় শুনেছি—

বিভাস ॥ ওসব লোক দেখানো। যদি জেনুইন কিছু থাকতো এভাবে কথা এড়াবার চরিত্র তৈরী হতো না। আমি জানতাম ও এমনি একটা কিছুই করবে, সেই জন্যেই যেতে চাইছিলাম না। তোরাই জোর করে পাঠালি। খাম্‌খা হেনস্থা হতে হলো ঐ রিপোর্টারের সামনে!

অনন্ত ॥ কিন্তু আমাদের দলের প্রতি ওর নিজেরও একটা দায়িত্ব আছে।

বিভাস ॥ দায়িত্ব আছে নয়, ছিল। সব পাস্ট টেন্স। অতীতকাল। পাস্ট ইস পাস্ট।

অনন্ত ॥ এ্যাণ্ড পাস্ট ইস্ অল্‌সো গোল্ডেন—

বিভাস ॥ হ্যাঁ, পাস্ট ইস্ গোল্ডেন ঐ সব ধাপ্পাবাজদের জন্যে। ওরা বলবে আগে আমি হেন করেছি, তেন করেছি, বিপ্লবী নাটক করেছি, কত নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে—দেখিস্‌না ওদের ইন্টারভিউ গুলো। আজ এষ্টাব্‌লিস্‌ড হয়ে গিয়ে সব ভাঁড়ামো করছে—শালা!

অনন্ত ॥ (কথা ঘোরাবার ছলে) তুই খেপে গেছিস। ছাড় ওসব। চ' শুরু করি।

বিভাস ॥ হ্যাঁ চল্। (অন্যদের) নেরে, রেডী হ'। (অনন্তকে) কোন-খানটা নিবি প্রথমে?

অনন্ত ॥ পুলক তো এখনো আসেনি। তার মানে গোয়েবল্‌স বাদ দিতে হবে। তাহলে প্রথমে ঐ জায়গাটা নে যেখানে রোয়েমকে শেষবারের মতো ধরে আনছে। (স্ক্রীপ্ট খোলে) শেখর আয়। গোয়েরিং ঢুকছে, ষ্টেজে অলরেডী হিটলার রয়েছে।

বিভাস ॥ কিন্তু পুলককে তো দরকার। গোয়েবলসও আছে ওখানে।

অনন্ত ॥ ও জাস্ট একটা ডায়লগ। আমি বলে দেব। নে শুরু কর। স্ক্রীপ্ট ধর (একজনকে দেয়) দরকার না হলে প্রম্পট করবি না।

[সবাই জায়গা মতো চলে যায়। শেখর হিটলার ও অনন্ত গোয়েবলস্‌ চরিত্রে রয়েছে]

হিটলার ॥ না না কাউকে ছাড়বো না, কাউকে না। ছেলে মেয়ে বৌ বাচ্চা কাউকে না। কারো ক্ষমা নেই। (প্রম্পটারের দিকে ইঙ্গিত করে) বল্‌না শালা—

প্রম্পটার ॥ হিটলারের বিরুদ্ধে—

হিটলার ॥ হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ফলটা হাতে হাতে দেখে যাক সব। (গোয়েরিং-এর প্রবেশ। উত্তেজিত)

গোয়েরিং ॥ রোয়েমকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। (দরজা ঠেলে শৈলেনের প্রবেশ। মুহূর্তের জন্তে সবাই চুপ। সবাই তাকায় ওর দিকে। ও ইঙ্গিতে রিহার্সাল চালাতে বলে) আপনি তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলতে চেয়েছিলেন।

হিটলার ॥ হ্যাঁ, রোয়েম আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে (শৈলেন আপত্তি সূচক মাথা নাড়ে—অভিনয় যেন পছন্দ নয়) কিন্তু ও আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু...ওকে, ওকে নিয়ে আসুন গোয়েরিং (শৈলেন মাথা নাড়ে)

শৈলেন ॥ অনন্ত উইথ ইওর পারমিশান—একটা কথা (রিহার্সাল থেমে যায়)

অনন্ত ॥ বলো না, বলো কি বলবে—

শৈলেন ॥ বড্ড ফ্ল্যাট লাগছে।

অনন্ত ॥ কি করবো, আমি কিছুতেই সেভাবে দেখাতে পারছি না, আর শেখরেরও কিছু সমস্যা রয়েছে। একটু দেখিয়ে দাও না—

বিভাস ॥ অবশ্য যদি তোমার সময় থাকে। তোমার তো আবার স্যুটিং, বোর্ডের এ্যাকটিং, ইণ্টারভ্যু সব নানান—

শৈলেন ॥ (অপ্রস্তুত হাসি) চটে আছিস এখনও, আয় আয়। (অনন্তকে) সেই একনায়কই করছিস তাহলে—? একই ফর্মে ?

অনন্ত ॥ মোটামুটি একই বলতে পারো।

শৈলেন ॥ রোয়েমের বিচারের সীনটা নিচ্ছিস তো ?

অনন্ত ॥ হ্যাঁ, ঐ যখন রোয়েমকে শেষবারের মতো এ্যারেস্ট করে আনছে।

শৈলেন ॥ ছাখ্, এইখানটায় একটা জিনিষ মনে রাখতে হবে—সিচ্যুয়েশনটা কিছুতেই হালকা হতে দেওয়া চলবে না। কেননা পুরো জার্মানী তটস্থ। রাত্তির বেলা সব এ্যারেস্ট করে আনছে ঘুম থেকে তুলে। হিটলার মরিয়া। এখানে হালকা হওয়ার কোন স্থযোগই নেই। আয় ধর্। স্ক্রীপ্টটা ধর। আটকালে ধরিয়ে দিস।

অনন্ত ॥ তোমার এখনও মুখস্থ আছে ?

শৈলেন ॥ নো কমেণ্টস (হাসে বিভাসের দিকে চেয়ে) বিভাস আবার চটে যাবে। আয় শুরু কর। শেখর ছাখ্ মন দিয়ে।

[রিহার্সাল শুরু করে—শৈলেন হিটলার, অনন্ত গোয়েবলস এবং বিভাস রোয়েম]

হিটলার ॥ না না, কাউকে ছাড়বো না, কাউকে না। ছেলে-মেয়ে, বাচ্চা বুড়ো, কারো ক্ষমা নেই। হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ফলটা হাতে হাতে দেখে যাক সব। (গোয়েরিং-এর প্রবেশ খুবই উত্তেজিত)।

গোয়েরিং ॥ রোয়েমকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। আপনি তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলতে চেয়েছিলেন।

হিটলার ॥ হ্যাঁ, রোয়েম আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। কিন্তু ও আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু…ওকে নিয়ে আস্থন গোয়েরিং। আপনাকে প্যাপেন সম্বন্ধে যা নির্দেশ দিলাম—

গোয়েরিং ॥ হ্যাঁ, আমি লোক পাঠিয়েছি। (প্রস্থান)

গোয়েবলস ॥ আমার মনে হয় রোয়েমের কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা আমাদের শোনা উচিত। ওতো এভাবে—

হিটলার ॥ Secret Service থেকে সমস্ত খবর আমার কাছে এসেছে ডক্টর আমি কারও কথায় বিশ্বাস করি না, একমাত্র ঐ Secret Service ছাড়া। (রোয়েমকে সঙ্গে নিয়ে গোয়েরিং-এর প্রবেশ) হিটলার ও গোয়েবল্‌স রোয়েমকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। হিটলার রোয়েমের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। ধীরে ধীরে প্রচণ্ড ক্রূর দৃষ্টি নিয়ে হিটলার এগিয়ে আসে রোয়েমের দিকে। এগিয়ে এসে রোয়েমের বুক থেকে ব্যাজটা টেনে ছিঁড়ে নেয়।)

হিটলার ॥ আপনারা দুজন বাইরে যান। আমি আমার বন্ধু রোয়েমের সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলতে চাই (তথাকরন। ঠাণ্ডা স্বরে হিটলার) কেমন আছ রোয়েম? (রোয়েম নিরুত্তর) কি ব্যাপার? জবাব দিচ্ছ না? এ্যাডলফ্ হিটলার তোমায় জিজ্ঞেস করছে—কেমন আছ—শুনতে পাচ্ছ না?

রোয়েম ॥ এভাবে মাঝরাতে আমায় বিছানা থেকে তুলে আনার কি মানে হয়?

হিটলার ॥ তুমি কতো রাত আমার ঘুম নষ্ট করেছ জানো? আমার জন্য একটা রাত না হয় নাই ঘুমলে?

রোয়েম ॥ এ সব কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না!

হিটলার ॥ বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। হিটলারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার বুদ্ধি তোমার আছে, অথচ এটুকু বোঝার ক্ষমতা নেই তা বললে তো মানবো না। তোমার বুদ্ধি বিবেচনার ওপর আমার বিশ্বাস আছে রোয়েম। চক্রান্তকারী—

রোয়েম ॥ আমি কোনও চক্রান্ত করিনি।

হিটলার ॥ (উত্তেজিত চিৎকার) মিথ্যে কথা বলো না! তুমি, Gregor Strasser, Bruening, Schleicher সকলে মিলে চক্রান্ত করেছ। তোমরা, এই বিশ্বাসঘাতকেরা, ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বসে ষড়যন্ত্র করেছ কি করে আমাকে সরাবে অথচ তার পরেও আমার সঙ্গে বসে নির্লিপ্তভাবে আলোচনা করেছ আবহাওয়া নিয়ে, ছবি নিয়ে—আশ্চর্য! জানো—কি তোমাদের শাস্তি?

রোয়েম ॥ এ্যাডলফ, তুমি যা জানো পুরোটাই ভুল। বানানো—

হিটলার ॥ (উত্তেজিত) বানানো? তোমাদের ছক অনুযায়ী Bruening হবে ফরেন মিনিষ্টার, Strasser হবে মিনিষ্টার অফ ইকনমিক এফেয়ার্স, আর তুমি, তুমি হতে চেয়েছ ডিফেন্স মিনিষ্টার, SA-কে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে একচ্ছত্র রাজত্ব করতে চেয়েছ—

রোয়েম ॥ না! মিথ্যে কথা। এসব খবর তোমার কাছে কোথা থেকে এসেছে আমি জানি।

হিটলার ॥ কোথা থেকে এসেছে বলে তোমার অনুমান?

রোয়েম ॥ এ গোয়েরিং আর হিমলারের মাথার কাজ। ওরা ব্যক্তিগত আক্রোশবশে আমার নামে এইসব রটাচ্ছে। ওরা জানে, তোমার কানে একবার এই কথা তুলতে পারলে তুমি আমাদের ক্ষমা করবে না।

হিটলার ॥ তোমার অনুমান অনেকটা সত্য হলেও পুরোটা নয়, তোমরা বার্লিনে যে ক্যাবিনেট লিষ্ট নিজেদের মধ্যে বিলি করেছ তার কপি আমার কাছে আছে। নিজের চোখকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। আর তা'ছাড়া SA ও SS নিয়ে তোমরা যা শুরু করেছ তাতে লৌহদৃঢ় নাজী দলের মধ্যেও বিভিন্ন রকম ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে—

রোয়েম ॥ আমাদের কিছু করার নেই। গোয়েরিং-এর স্বৈরাচার আমাদের কাছে অসহ্য।

হিটলার ॥ তাই বলে তুমি দলে ভাঙ্গন আনবে, আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে?

রোয়েম ॥ চক্রান্ত তোমার বিরুদ্ধে নয়, আনুষঙ্গিক হিসাবে তোমার প্রসঙ্গও এসে গিয়েছিল।

হিটলার। কিন্তু আক্রমণটা তো শেষ অব্দি আমার ওপরই আসছে।

রোয়েম ॥ আমাদের কিছু করার ছিলনা।

[হিটলার চুপ করে যায়। খুব ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসে রোয়েমের দিকে]

হিটলার ॥ রোয়েম তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি—এসব পাগলামি ছাড়ো। আর কেউ হলে বলতাম না, সোজা দাঁড় করিয়ে গুলি করতাম।

কিন্তু তোমাকে বন্ধু বলেই জেনে এসেছি চিরকাল। গত চোদ্দ বছর ধরে অনেক ঝড়-ঝাপটা, বিপদে-আপদে আমরা এক সঙ্গে আছি। কোনদিন কোনও বিবাদ ছিলো না···কিন্তু আজ, আজ যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে (উত্তেজিত পদচারণা) না, না, তোমার একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু। এর ক্ষমা নেই রোয়েম···কিন্তু, কিন্তু তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু— তোমায়···তোমায় (পিস্তলটা বের করে এগিয়ে আসে, তুলে তাক করে রোয়েমের দিকে, হতবুদ্ধি রোয়েম দাঁড়িয়ে) নিজের হাতে গুলি করব না, রোয়েম—পিস্তলটা রেখে গেলাম। আমার হয়ে কাজটা তুমি সেরে নাও।

[চকিতে বেরিয়ে যায়, হতবুদ্ধি রোয়েম তখনও দাঁড়িয়ে।
ধীরে ধীরে পিস্তল তুলে নেয়।]

রোয়েম॥ মৃত্যু! আত্মহত্যা! না, রোয়েম আত্মহত্যা করবে না। অত ভীরু নয় রোয়েম। সে অনেক যুদ্ধ দেখেছে—অনেক যুদ্ধ করেছে··· এ্যাডল্‌ফ, এ্যাডল্‌ফ তোমার চোখে কি ভীষণ ক্ষমতালিপ্সা···কোথা থেকে কোথায় উঠেছ তুমি? তোমার চাহিদার শেষ নেই এ্যাডল্‌ফ। তুমি জানোনা, কি ভীষণ অন্ধকার গহ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ তুমি নিজে। রাশি রাশি রক্ত জমাট বাঁধতে বাঁধতে কালো হয়ে তোমার জন্য এক দুর্লঙ্ঘ্য কলঙ্ক সৃষ্টি করছে, তুমি নিজেই খুঁড়ছো তোমার কবর! আজ তুমি একনায়ক হয়েছো কি অসীম কলঙ্কের ওপর দাঁড়িয়ে! তোমায় দোষ দেব না এ্যাডল্‌ফ—দোষী আমি, আমরা, আর এই লক্ষ লক্ষ নাগরিক, যারা বোবা পশুর মতো তোমার স্বেচ্ছাচার মাথা পেতে নিচ্ছে, প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই যাদের সেই ভীরু ভেড়ার পাল ঐ মানুষগুলোই দোষী—যারা তোমায় সৃষ্টি করেছে, যারা তোমার মতো আরো এ্যাডল্‌ফ হিটলারের জন্ম দিচ্ছে, জন্ম দেবে পৃথিবী জুড়ে। তবু...তবু যদি মরতে হয়, আমি তোমার হাতেই মরবো। এ্যাডল্‌ফ, তুমি আমায় নিজে গুলি করে মারো, তোমার হাতে মরতে চাই আমি—অন্ততঃ একটাই সান্ত্বনা—আমি এক স্বৈরাচারী একনায়কের হাতে মরেছি যার জন্ম দিয়েছি আমি নিজে! এ্যাডল্‌ফ— (উত্তেজিত হিটলারের প্রবেশ। সঙ্গে গোয়েরিং)।

হিটলার ॥ (উত্তেজিত। চিৎকার করে) গোয়েরিং, নিয়ে যান ওকে আমার চোখের সামনে থেকে। গুলি করে মারুন ওকে। আমার নির্দেশ—ক্ষমা নেই তোমার রোয়েম! (গোয়েরিং রোয়েমকে ঠেলে নিয়ে যায়)

রোয়েম ॥ (চিৎকার করে) তুমি আমায় ছুঁয়ো না গোয়েরিং. মৃত্যুর আগে তোমার নোংরা স্পর্শ···, এ্যাডল্‌ফ, তুমি নিজে—(গোয়েরিং ইতিমধ্যে ওকে নেপথ্যে নিয়ে যায়। গুলির শব্দ। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। হিটলার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। কেবল ওর পদশব্দটাই কানে আসছে)।

হিটলার ॥ (শান্ত কণ্ঠে) না, কারো কাছে আমি জবাবদিহি করতে বাধ্য নই। আজ আমিই চূড়ান্ত বিচারক। শেষ বিচারের আশায় তোমাদের সবাইকে তাকিয়ে থাকতে হবে আমার দিকে—সমস্ত দেশকে। শুনে রাখো—সবাই শুনে রাখো ভবিষ্যতে একনায়কের বিরুদ্ধে মাথা তোলার স্পর্দ্ধা করো না, তার শাস্তি কি জানো—দেখছো তো? মৃত্যু! (দর্শকদের) কি ভেড়ার পাল, শুনতে পাচ্ছো, যে নায়ককে তোমরাই জন্ম দিয়েছ তার হাতেই তোমাদের জীবন মরণের চাবিকাঠি!—না, না, মাথা তুলোনা, মাথা তুলোনা, মাথা তুলোনা!! (ধীরে ধীরে পিস্তলটা দর্শকদের দিকে তুলে ধরে। আলো ক্রমশঃ উদ্‌ভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত হিটলারের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে আসে। শৈলেন হিটলারের ভূমিকা শেষ করে শূণ্য দৃষ্টি নিয়ে দর্শকদের দিকে কয়েকমুহূর্ত চেয়ে থাকে। হতাশভাবে টেবিলটা চাপড়ায়। মাথা নীচু করে নেয়। সবাই স্তব্ধ হয়ে ওকে দেখছিল। অনন্ত এগিয়ে আসে)

অনন্ত ॥ ফ্যাণ্টাসষ্টিক! সত্যিই শৈলেনদা এখনও তুমি অপূর্ব। (শৈলেন নিরুত্তর) কি হলো, শৈলেনদা?

শৈলেন ॥ (অন্যমনস্ক) উঁ?

অনন্ত ॥ কি হোল তোমার?

শৈলেন ॥ (ধীর স্বরে) আমি কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছি। (হঠাৎ স্বর বদলে) অনন্ত, আমাকে তোদের দলে নিবি? আমি আবার রেগুলার শো করবো তোদের সঙ্গে?

বিভাস ॥ অভিনয় করার একটা সীমা থাকা উচিত শৈলেনদা।

শৈলেন ॥ কি বললি ?

বিভাস ॥ তুমি ভাল অভিনেতা সে সবাই জানে। আমাদের বিশ্বাস করাবার জন্যে তোমার এই ষ্টার অভিনেতা মার্কা বুলি নাই বা ছাড়লে—

শৈলেন ॥ তুই কি বলছিস—আমি এসব এমনি বলছি ? অভিনয় করছি ? বিশ্বাস কর্, আমি সত্যিই ফিরে আসতে চাই।

বিভাস ॥ তোমার সিনেমা, প্রফেশানাল থিয়েটারের ভাঁড়ামো, সাংবাদিকদের কাছে হ্যাংলামো সব ছেড়ে আসতে পারবে ? ছেড়ে আসতে পারবে তোমার লোভ ?

শৈলেন ॥ লোভ ? কিসের লোভ ?

বিভাস ॥ টাকার লোভ, যশের লোভ, প্রতিপত্তির লোভ। তুমি কোথাও গেলে ভীড় জমে যায়—লোকে তোমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—ঐতো ঐতো শৈলেন কর—ঐ দেখ। তখন তোমার বুকের রক্ত ছল্‌ছলিয়ে ওঠে না শৈলেনদা ? সে সব তুমি ছেড়ে আসতে পারবে ? বলো ?

শৈলেন ॥ (ঢোক গিলে) যদি বলি পা-পারবো।

বিভাস ॥ (স্মিত হাসি) পারবে না শৈলেনদা। কেউ পারে না। পায়ের একটা ষ্টেপ ফেললে সে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।…কিদরকার তোমার ফিরে এসে ?

শৈলেন ॥ আমি তো বুঝতে পারছি না সব ছেড়ে আসতে হবে কেন ? তোরা শুধু আমাদের দোষ দিস। সবাই তো পেশাদারী। শিল্পী সাহিত্যিক সবাই। আমাদেরও তো বেঁচে থাকার একটা প্রশ্ন আছে—খেয়ে পরে বেঁচে থাকা ?

বিভাস ॥ খেয়ে পরে বেঁচে থাকা মানে সততা বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকা নয়। শৈলেনদা, তুমিই না একদিন বলেছিলে—উপনিষদে না কিসে যেন আছে—আত্মানং সংস্কুরুতে—নিজেকে, সমাজকে সংস্কার করাই শিল্পের কাজ। এই কি তার চেহারা ?

শৈলেন ॥ আমরাও তো তাই চাইছি। সাধ্যমত চেষ্টা করছি। কিন্তু তার জন্যে সব ছেড়ে আসতে হবে কেন ?

বিভাস ॥ ঠাকুর ঘরে ঢুকতে গেলেও বাসি কাপড়ে ঢোকা যায় না—সেটা ছেড়ে আসতে হয়।

শৈলেন ॥ না-না, গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করিস না। সোজাসুজি জবাব দে একটা কথার—আজ্ যদি শৈলেন কর একটা ছোট্ট দলে শুধু অভিনয় করে বেঁচে থাকতে চায়, নাটক নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় সেকি শিল্পী ছাড়াও শুধু জীবনটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে? আজ যদি হাবিব মোহনবাগান ছেড়ে ছোট্ট দল গড়ে নিয়ে শুধু খেলা নিয়ে পরীক্ষা করে বেঁচে থাকতে চায় —পারবে? সাহিত্যিকরা লেখার চাকরি ছেড়ে শুধু কেরাণীগিরী করে সাহিত্য চর্চ্চা করতে চায়—কতটা সুযোগ তার আছে? পারবে সে সাহিত্য করতে? বল্, জবাব দে।···আমরা সবাই এক একটা পণ্য, এক একটা বস্তু হয়ে গেছিরে, কেবল বিশেষ একটা দ্রব্যগুণ আছে। এ বাজারে সেটাকেই ভাঙ্গিয়ে খেয়ে বেঁচে থাকা—

বিভাস ॥ হ্যাঁ সেই দ্রব্যগুণ ভাঙিয়ে খেতে গিয়েই তো অশ্লীলতার গাড্ডায়। তোমাদের সৃষ্টির কথা নাই বললাম—তোমাদের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই অশ্লীল হয়ে গেছে। সেখানে মানুষের মনের কোনো দাম নেই—

শৈলেন ॥ কি বলতে চাস কি তুই?

বিভাস ॥ তুমি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ শৈলেনদা—

শৈলেন ॥ কি দেখবো কি?

বিভাস ॥ মনে পড়ে বৌদির মৃত্যুশয্যায় সেই টেলিগ্রামটার কথা? মনে করতে পারো কেন তোমার নিজের ছেলে তোমার অভিনয় দেখা বন্ধ করেছে? এই তো মানুষের দাম—

অনন্ত ॥ বিভাস—

শৈলেন ॥ (চিৎকার) বিভাস, প্লীজ ডোণ্ট ব্রিঙ্গ দ্যাট ওয়ার্ড (আলো মুহূর্তের জন্য নিভে যায়। আলো ম্লান থেকে তীব্রতর হতে থাকে সঙ্গে সঙ্গেই। শৈলেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। ধীর স্বরে) প্লীজ ডোণ্ট ব্রিঙ্গ দ্যাট ওয়ার্ড। প্লীজ। আমার কিছু করার ছিলো না, বিশ্বাস কর্। আমি বুঝতেই পারিনি ব্যাপারটা। কি একটা বাজে ছবির আউটডোর শুটিং চলছিল। ওহো মনে পড়েছে—মিলন সেতু। মিলন সেতুর আউটডোর। একদিন, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ শুটিং শুরু হবার নাম নেই। পরিচালক প্রোডিউসারের ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে কি নিয়ে ব্যস্ত। আমরা সবাই বিরক্ত হয়ে

উঠেছি। শেষ অব্দি আমি নিজেই গেলাম ওদের কাছে। প্রোডিউসার যে ঘরটায় ছিলেন সেখানে ঢুকতে গিয়েই কানে এলো—পরিচালক বলছেন, 'তাহলে আপনি নিজেই ওকে টেলিগ্রামের খবরটা দিয়ে দিন।' প্রোডিউসার অবাক হয়ে বল্লেন, 'পাগল হয়েছেন নাকি? এখন এই খবর দিলে শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে। কতটাকা ক্ষতি হবে ভাবুন তো। আর তাছাড়া ঘাবড়াবার কিছু নেই, লোকের অসুখ বিসুখ তো হয়ই তার জন্যে শুটিং বন্ধ হবে নাকি? বুঝলেন, কথাটা একদম চেপে যান। প্যাকাপের পর টেলিগ্রামটা দিয়ে দেবেন।' এরপর আর কথা শোনবার ইচ্ছে ছিলো না। একটু পরেই কাজ শুরু হলো। আমাকে নিয়েই শট। (শৈলেন এগিয়ে এসে মুহূর্তে বৃদ্ধ বাবার ভূমিকাভিনয় করতে শুরু করে। অমিতকুমার নগেন ও রূপশ্রী নায়িকার ভূমিকায়।)

শৈলেন॥ কই গো, শুইন্যা যাও—

নেপথ্যে॥ (মহিলার স্বর) এ্যাঁ কি কও?

শৈলেন॥ আরে শুনছ, নগার নাম বারাইসে কাগজে, খুব সুখ্যাত কর্‌সে—

নেপথ্যে॥ ক্যান?

শৈলেন॥ (কাগজ হাতে উত্তেজিত ভাবে) ক্যান কি গো, কত বড় আর্টিষ্ট হইছে তোমার পোলা স্বচক্ষে দ্যাইখ্যা যাও—

নেপথ্যে॥ খাড়াও, ডাইলে সম্বরটা দিয়া আইত্যাসি—

(নগেনের প্রবেশ)

শৈলেন॥ নগা, নগারে, তুই বাড়ীর মুখ উজ্জল করছিস্। আমি জানতাম একদিন—

নগেন॥ জানো বাবা, আমার একটা ছবি আট হাজার টাকায় বুক হয়ে গেছে।

শৈলেন॥ অষ্ট হাজার? কস কি? তোর দামই তো আট হাজার হইব না—

নগেন॥ ঐতো! তোমরা কদর বোঝ না তাই—

শৈলেন॥ আট হাজার টাকা ছবির দাম? কি ছবি আঁকছিলি নগা?

নগেন॥ ছবিটার নাম জল পড়ে পাতা নড়ে—

শৈলেন ॥ (উত্তেজিত) নগা, ইডা তো পঞ্চা কইসে। তার লাইগ্যা তুই তারে কি পেটন পিটাইসস্—

নগেন ॥ কি বলছ কি তুমি—

শৈলেন ॥ তোর ক্যানভাসে পঞ্চা রঙ ঢাইল্যা জাবড়া করছিল্, তার লাইগ্যা তুই তারে পেটন দ্যাস নাই ?

নগেন ॥ বাবা, চুপ—

শৈলেন ॥ চুপ ? কিসের চুপ ? পঞ্চা নিজে গোটা অক্ষরে লিখছিল জল পড়ে পাতা নড়ে, তুই তারে ব্যাদম প্রহার দিলি। আর সেইডা তুই-একজিবিশানে দিয়া—

নগেন ॥ বাবা, দোহাই চুপ করো। ওটা আমি আসলে একজিবিশানে দিইনি—

শৈলেন ॥ তাইলে ?

নগেন ॥ ওটাতে ছবিগুলো প্যাক করেছিলাম। সেটাকেই ওরা ছবি ভেবে টাঙিয়ে দিয়েছে, আর সেটাই কলা একাদেমী—(নেপথ্যে রূপশ্রী ॥ হ্যালো নটি বয় !)—কে ?

রূপশ্রী ॥ (ঢুকে এসেছে) আমি (শৈলেনের দিকে তাকায় নি। উচ্ছল মেজাজে রয়েছে) উহ্, তুমি একদিনেই ফেমাস হয়ে গেলে। কি ভীষণ ভালো লাগছে না আমার—

নগেন ॥ (অপ্রস্তুত হয়ে যায়) বাবা, এ আমাদের ক্লাস মেট, দেবযানী—

রূপশ্রী ॥ (শৈলেনের দিকে ফিরে) নমস্কার—

শৈলেন ॥ (হতচকিত) ন-নমস্কার—

রূপশ্রী ॥ ওরা সবাই ট্যাকসিতে ওয়েট করছে তোমার জন্যে। চলো। আজ কিন্তু সেলিব্রেট করবো আমরা—। চলো প্লীজ।

নগেন ॥ কোথায় ?

রূপশ্রী ॥ কোথায় আবার পার্ক ষ্ট্রীটে !! (হাত ধরে) চলো (দুজনে প্রস্থানোদ্যত) আসি মেসোমশাই, আবার দেখা হবে। টা-টা—   (প্রস্থান)

শৈলেন ॥ বাব্বা, ইডা তো সত্যই মডার্ণ আর্ট। ওগো, ওগো আমারে এট্টু জল দাও···

কৌশিক॥ কাট্। ···বিউটিফুল। ঠিক আছে প্যাকাপ করে নিন। (সকলে সাধারণ ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে। শৈলেনও প্রস্থানোদ্যত) ওহো শৈলেনবাবু, একটু আগেই একটা টেলিগ্রাম এসেছে আপনার নামে। (টেলিগ্রামটা এগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়।)

শৈলেন॥ (বিমূঢ়) টেলিগ্রাম? আমার নামে? (টেলিগ্রামটা তাড়া-হুড়ো করে পড়ে) একি, মদার্স কণ্ডিশান সিরীয়াস। হসপিটালাইজড্। কাম শার্প। মিণ্টু। ···এতো কাল সকালে করা টেলিগ্রাম! (আলোটা ওর ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে আসে)···প্রায় আড়াই দিন পর বাড়ী পৌঁছলাম। আমাকে ঢুকতে দেখেই মিণ্টু বারান্দা থেকে উঠে ঘরে চলে গেল। ওর পরনের কোরা ধুতিটায় চোখ পড়তেই বুকটা ধক্ করে উঠলো। তার মানে নিভা নেই—হ্যাঁ, নিভা নেই। ··· আমার জন্তে ওরা অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু নিভার শরীরটা নাকি পচে উঠছিল। বডিটায় গন্ধ বেরোচ্ছে দেখে ওরা আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করেনি। নিভা যখন চিতার আগুনে আকাশটাকে রাঙিয়ে দিয়ে অনেক অভিমান নিয়ে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছিল, আমি তখন সস্তা ভাঁড়ামো নিয়ে মশ্গুল। আমি তখন নিজেকে তিলে তিলে বিক্রি করছি। কিন্তু কি করবো, আমিই বা কি করতে পারতাম? (স্বরে গভীর শূণ্যতা নিয়ে একেবারে ভাবাবেগ বর্জিত কণ্ঠে বলে) যেদিন একটা মস্ত একটানা ভোঁ দিয়ে গোয়ালন্দ ঘাটে স্টীমারটা ভিড়ল, যেদিন মা আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, 'খোকা ত্থাখ্ ত্থাখ্, শ্বাস বারের মত ছাইখ্যা ল', সাড়া ব্রীজ, সাড়া ব্রীজ যায়'—সেদিন থেকে বুকের মধ্যে কেবলই ঝমঝম করে রেলগাড়ী চলছে। কেবলই মনে হচ্ছে, তুলসীমঞ্চ-কাঠগোলাপ-পদ্মদীঘি লক্ষ্মীগাই-ই কেবল হারিয়ে গেল না, আমিও কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছি! সেই তো আমার হারিয়ে যাওয়ার শুরু। মিণ্টু, তুই আমায় বুঝতে পারছিস না, না? আমি কি করতে পারতাম বল্তো? আমি যে হারাতে হারাতে প্রতি পদে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে বারবার নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি! একেবারে বিক্রি হয়ে গেছি আমি। মিণ্টু, বিভাস, অনন্ত, বল্, তোরা আমায় কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবিনা, না? (দরজায় কড়া

নাড়ায় শব্দ। অদ্ভুত ভীত স্বরে) কে? (সম্বিৎ ফিরে পায়) কে?

(দরজা ঠেলে জনৈকের প্রবেশ)

লোকটি ॥ আমায় শারদীয়া সিনেমার সম্পাদক পাঠিয়েছেন। আপনার স্মৃতিচারণটা লেখা হয়ে গেছে?

শৈলেন ॥ এ্যঁা, স্মৃতিচারণ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইতো—(ওয়েষ্টপেপার বাস্কেট থেকে ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো তুলে এগিয়ে দিতে যায়)

লোকটি ॥ এগুলো?

শৈলেন ॥ (শূণ্যস্বর, অপ্রকৃতিস্থ) হ্যাঁ...এগুলোই আমি (ছেঁড়া কাগজগুলো হাত উঁচু করে ওড়াতে থাকে) ...আমার কথা...আমার স্মৃতি, ভগ্নাবশেষ...। ভাববেন না, কিছু ভাববেন না। এ-ইতো আমি...এগুলো দেখেই লোকে হাসবে...হাসতে হবেই, কেননা আমিতো একটা ভাঁড়... (শেষের দিকে স্বর ভেঙে যায়। কাগজগুলো শৈলেনকে ঘিরে উড়ে উড়ে মঞ্চে পড়তে থাকে। শৈলেনের ঠিক মাথার উপর স্পট লাইট তীব্র হয়ে আসে। উড়ন্ত ছেঁড়া কাগজের ভীড়ে শৈলেন প্রায় হারিয়ে যায়। পর্দা)

নাট্যকারের ঠিকানা: ডেপুটি পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার, ডি-ভি-সি, ভবানী ভবন, কলকাতা-৭০০০২৭।

ব্ল্যাক মার্কেট

সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য

●

চরিত্র

রাম	ধনীলোক
শু	জোতদার
বারকোষ	মহাজন
ছড়ি	লরীর মালিক
ঝুলি	ধান কলের মালিক
কেলে	প্রথমে চাষীদ্বয় ও শ্রমিকদ্বয়, পরে পুলিশ।
কটা	
বল্টু	
দুরমুস	
ভাগনে	সুব্রত নামে পুলিশ অফিসার
হরি	রামের চাকর

●

[পাঁচটি বড় বড় বাড়ী পাশাপাশি সাজানো। রাম যে বাড়ীটিতে বাস করে সেটি সহ এই ছয়টি বাড়ীর মালিক। পর্দা খুললে দেখা যাবে রাম দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে বাড়ীগুলির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে মাইকে তখন পড়া হচ্ছে—]

হাত করে মহাজন, হাত করে জোতদার
ব্ল্যাক মার্কেট করে ধনী রাম পোদ্দার
গরীব চাষীকে মেরে হাতখানা পাকালো
বালীগঞ্জেতে বাড়ী খান ছয় হাঁকালো।

রাম॥ (কবিতা পাঠ শেষ হলেই রাম প্রচণ্ড জোরে হেসে ওঠে এবং পরবর্তী মুহূর্তে হাসি থামিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে হাতের লাঠিটা দিয়ে বাড়ীগুলির দিক নির্দেশ করে বলে)...এক ..দুই...তিন...চার...পাঁচ... ছয়...। হাঁ, ছয়। ছ'খানা বাড়ী। বালিগঞ্জের বুকে আমার ছ'খানা বাড়ী। কিন্তু, কত মেহনত করতে হয়েছে এই বাড়ীগুলো করার পেছনে, তাকি কেউ জানে! কত তাচ্ছিল্যকে তুচ্ছ করে, কত লোকের ভাগ্যকে নিজের অনুকূলে যোগ করে নিয়ে, এই বাড়ীগুলো আমার হয়েছে, সে খবর কী কেউ রাখে!! রাখে না। তাই, ওরা যখন চিৎকার করে—

[মঞ্চের সামনের ভাগে বাঁ দিক করে দাঁড়িয়ে থাকা কেলে, কটা, বল্টু, দুরমুস চীৎকার করে ওঠে]

চারজনে॥ হ্যাঁ অস্ত্র। আইনের সমস্ত অস্ত্রগুলো আমাদের হাতে তুলে দিতে পারো, আমরা দুনিয়ার ঐ সমস্ত ধনী লোককে, তাদের প্রাসাদ থেকে নামিয়ে আনতে পারবো!

বল্টু, দুরমুস॥ তোমরা কেউ আমাদের হাতে আইনের অস্ত্র তুলে দিতে পারো, আমরা প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়বো, যাতে আর কোনদিন কেউ আমাদের শ্রমের রক্ত চুরি করে ভোগ বিলাসের ইমারত তৈরী করতে না পারে।

কেলে, কটা॥ তোমরা কেউ আমাদের হাতে আইনের অস্ত্র তুলে দিতে পারো, আমরা প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়বো, যাতে আর কোনদিন কেউ জমির ভাগ চুরি করে লোভ লালসার ইমারৎ তৈরী করতে না পারে।

[হাতে বাজারপূর্ণ ব্যাগ হাতে ডানদিকের পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে হরি। সে ভেতরে ঢুকে হন্ হন্ করে এগিয়ে রামকে পেরিয়ে চলে গেলে রাম বিরক্ত হয়ে হরিকে ডাকে]

রাম॥ হরি—

হরি॥ আজ্ঞে?

রাম॥ যাচ্ছিল কোথায়?

হরি ॥ আজ্ঞে ভেতরে।

রাম ॥ ভেতরে! হারামজাদা পয়সাগুলো কে ফেরত দেবে!

হরি ॥ আজ্ঞে পয়সা—

রাম ॥ আকাশ থেকে পড়ছিস যে! দশ-দশটা টাকা বাজারে নিয়ে গেলি, তার থেকে কি একটা পয়সাও ফেরেনি?

হরি ॥ অমন করে বলবেন না বাবু—হ্যাঁ—কুরুং কুরুং বাজারে ত কোনদিন গেলেন না, কুরুং কুরু, দরটা জানবেন কি করে! আলু কত করে কিলো জানেন?

রাম ॥ কত আর—আট আনা—দশ আনা হবে।

হরি ॥ (বুড়ো আঙুল দেখায়) এই। তিন টাকা…তিন টাকা করে কিলো। কুরুং-কুরুং—হ্যাঁ—

রাম ॥ এ্যাঁ!! (নিশ্চল)

হরি ॥ হ্যাঁ। (ভেতরে গমন)

রাম ॥ (নিশ্চলতা ভেঙে প্রস্থান পথের দিকে যায়) আমি পাগল হয়ে যাবো……এই ভাবে আমার চাকর যদি দিনরাত আমাকে কুরুং-কুরুং বলে ঠকায়, তাহলে আমি কী করে আরও ছটা বাড়ী তুলবো!! হারামজাদা—পাজি—ছুঁচো…ভেবেছে, বাজারের কোন দর আমার—

[প্রবেশ করে স্থ, বারকোষ, ছড়ি, ঝুলি]

চারজনে ॥ আমরা এসেছি স্যার…আপনার আরজেন্ট কল পেয়েই আমরা দৌড়ে এসেছি।

রাম ॥ আমি পাগল হয়ে যাবো।

চারজনে ॥ কবে স্যার?

রাম ॥ হোয়াট!!

চারজনে ॥ আজ্ঞে আপনি কোথায় যাবেন বলছিলেন না, সেটা কবে যাবেন?

রাম ॥ রাবিশ। আমি কোথাও যাবার কথা বলিনি। আমি বলেছি, আমি পাগল হয়ে যাবো।

চারজনে ॥ কেন স্যার?

রাম ॥ হারামজাদা-হতচ্ছাড়া-পাজি-ছুঁচো-রাসকেল ঐ হরি, হরি আমাকে পথে বসিয়ে ছাড়বে।

সু ॥ কী সাংঘাতিক—!!

বারকোষ ॥ এমন সাংঘাতিক কথা আমরা জীবনে শুনি নি।

ছড়ি ॥ একটা চাকর, সে কি না আপনাকে পথে বসিয়ে ছাড়বে !!

ঝুলি ॥ শুধু পথে বসানোই নয়, স্যারকে একেবারে পাগল করে ছাড়বে !!

রাম ॥ তবে আর বলছি কি ! হারামজাদা দশ-দশটা টাকা নিয়ে বাজারে গেল…ফিরে এসে বলে কি না, কুরুং-কুরুং একটা পয়সাও ফেরে নি।

চারজনে ॥ ওহ্, এই কথা।

রাম ॥ মানে—?

চারজনে ॥ বাজারে জিনিসপত্রের যা দাম বেড়েছে—

রাম ॥ Get out…I say get out…

[রাম তেড়ে যায় লাঠি তুলে। চারজনে পলায়ন করে পিছনে রামও প্রস্থান করে।]

কেলে ॥ মানবো না। (নিশ্চলতা ভেঙ্গে মঞ্চে ছড়িয়ে পড়বে)

কটা ॥ আমরা যদি জোতদারকে বলি, এ ধান আমরা বুনেছি…এ ধান আমাদের। সংগে সংগে জোতদার আমাদের উত্তর দেয়—

[সু-এর প্রবেশ]

সু ॥ কী বলছিস রে কেলে, কটা, ও ধান কি আমার ! হে-হে-হে সব ধান মহাজনের। তোরা ভাগচাষী আর আমি— আমি তোদের কাজ দেখার ভাগী—হে-হে-হে—। [বারকোষের প্রবেশ]

বারকোষ ॥ বাজে কথা বলবেন না জোতদারবাবু। আপনি ভীষণ চালাক। সবসময় অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে সরে পড়ার ধান্ধা করেন।

সু ॥ এতে সরে পড়ার কী ধান্ধা করলাম মহাজনবাবু ?

বারকোষ ॥ সরে পড়ার ধান্ধা করেন না তো কী ! কেন আপনি, ওদের বললেন, সব ধান আমার।

বল্টু ॥ আমি বলছি—

দুরমুস ॥ নাহ্‌, তুই কোন কথা বলবি না।

বল্টু ॥ কেন বলবো না? যা সত্যি তা কেন প্রকাশ করবো না?

দুরমুস ॥ রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়। সেবার দেখলি না, ধানকলের মালিকের সংগে ঝগড়া হ'ল জোতদার-মহাজনের। আর। ওদের সবাইয়ের মালিক বালিগঞ্জের রাম পোদ্দার এসে সব দোষ চাপালো মাধাই-কানাই-এর ওপর। এমন কি ওদের চাকরী পর্যন্ত গেল।

সু ॥ বা-বাহ্‌, বা-বাহ্‌, বেড়ে কথা বলতে শিখেছিস ত' দুরমুস। সেবার কোথায় কি হ'ল···এবার কোথায় কী হবে.. তা তুই আগে থেকেই জেনে বসে আছিস দেখছি। [ঝুলির প্রবেশ]

ঝুলি ॥ কেনই বা জানবে না। আমি ধানকলের মালিক, মানে, ধানকল আমার। মানে, মালিক থাকে বালিগঞ্জে মানে, সেখান থেকে আঙুল নাড়িয়ে তিনি আপনাদের পুতুল নাচ নাচান। মানে—

সু ॥ আর মানের দরকার নেই ঝুলিবাবু। হে-হে-হে, মানে কথা হচ্ছে আমাদের মধ্যে, সেখানে আপনাকে সালিশী মারতে কেউ ডাকে নি। হে-হে-হে—

বারকোষ ॥ ঠিক কথা সু বাবু। আপনার কথা সর্ব্বৈব সত্য।

ঝুলি ॥ মানে—আপনাদের মধ্যে কথা হচ্ছে মানেটা কি? তাহলে আমার ধানকলের মজুররা এখেনে রয়েছে কেন?

বল্টু ॥ আমাদের এটা বিশ্রামের সময়।

দুরমুস ॥ আমরা আমাদের গাঁয়ের চাষীভাইদের সংগে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলছি। তাতে ওনাদের এখেনে আসার দরকারটাই বা কী, তাতো আমরা বুঝি না।

কেলে ॥ আমরা এবারকার ধান আর জোতদার-মহাজনবাবুর ঘরে তুলে দোব না।

কটা ॥ এবারকার ধানের ভাগ আমরাও পেতে চাই।

সু ॥ নিচ্চয়—নিচ্চয়...হে-হে-হে এতো সর্ব্বৈব সত্য কথা। ওরাই বা বছরের পর বছর ওদের ধান আমার গোলায় তুলে দেবে কেন?

বারকোষ ॥ গোলা আপনার নয়—গোলা আমার। কিন্তু তাতে ধান থাকে

মালিকের। মালিকের বিনা অনুমতিতে ওরা এ ধরনের কথা চলতেই পারে না। আর আপনিও ওদের সপক্ষে কোন কথা বলতে পারেন না।

স্থ॥ আমি কি পারি না পারি, সেটা আমাকেই ভাবতে দিন।

ঝুলি॥ মানে—কথা হচ্ছে কি—আমি ধানকলের মালিক মানে ধানকল আমার। Single boil করুন আর Double boil করুন—ধান ভাঙানোর চার্জ দেন কিন্তু আপনি।

স্থ, বারকোষ॥ সেটা মালিক আমাদের দিতে বলেন, তাই দিই।

[ছড়ির প্রবেশ]

ছড়ি॥ আর সেই ভাঙ্গানো ধান আমার লরীতে করে পৌছে দিয়ে আসে আমারই লোক। কিন্তু লরীভাড়াটা আমি পাই খোদ মালিকের হাত থেকে।

কেলে॥ দেখুন, কে কী করেন...না করেন, তা জানার দরকার আমাদের নেই।

কটা॥ হাঁটু ভর্তি কাদা জলে নেমে যে ধান আমরা বুনেছি, সে ধানের ভাগ এবার আমরা পেতে চাই।

কেলে॥ নইলে এ গাঁয়ের এক কণা ধানও আমরা এ গাঁয়ের বাইরে যেতে দোব না।

কটা॥ তার জন্যে যে কোনও ব্যবস্থা নিতে আমরা তৈরী।

স্থ॥ তাই নাকি?

কেলে/কটা॥ হ্যাঁ

বারকোষ॥ আর তোরা—তোরাই বা চুপ করে আছিস কেন? তোরা কিছু বল?

বল্টু॥ যে ধান ভেঙে আমরা চাল করবো, সেই চালের ভাগ তো আমাদের পাওয়া উচিত।

দুরমুস॥ উচিত নয়, আমরা সেই চালের অংশ অথবা তার আংশিক মূল্য পেতে চাই। [রামের প্রবেশ]

রাম॥ ভালো...ভালো...আংশিক মূল্য চাই···হি-হি-হি-হি-হি, তা কিসের আংশিক মূল্য রে বল্টু, দুরমুস?

[পূর্ণ আলোয় রামের প্রবেশের সংগে সংগে সু-ইত্যাদি রামের উদ্দেশে নমস্কার জানায়]

সু ॥ হে-হে-হে—আপনার মাথা—মানে আপনার মুণ্ডুর আংশিক মূল্য চায়।

রাম ॥ তাই নাকি ?

ঝুলি ॥ না হুজুর, ওরা কথাটা সেভাবে বলেনি।

রাম ॥ সাট আপ—। সাট আপ...সাট আপ। কে কিভাবে কথা বলেছে বা বলে নি. তা আমি বুঝবো! আমি যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা করছি, ততক্ষণ কারুর কোন কথা বলা নিষেধ—মানে, কেউ কোন কথা বলবেন না। সু ?

সু ॥ হুজুর ?

রাম ॥ আপনার মাঠের লোকজন এখেনে এসেছে কেন ?

কেলে/কটা ॥ আমরা জানতে এসেছি—

রাম ॥ এইপ্—চুপ। হারামজাদা-হতচ্ছাড়া-পাজি-ছুঁচো-রাসকেল, তোদের কথা বলতে কে বলেছে ? আমি কি তোদের জিজ্ঞাসা করেছি ?

সু ॥ এই, তোরা কথা বলছিস কেন ? হুজুর ত' তোদের কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি। তোরা চুপ করে থাক—কথা বলিস নি। বলুন হুজুর, কী যেন জিজ্ঞাসা করছিলেন ?

রাম ॥ ওরা এখেনে কেন এসেছে ? এখেনে, আমার বাড়ীতে ?

সু ॥ ঐ যে বললাম হুজুর মুণ্ডু—মুণ্ডুর ভাগ চাইতে এসেছে। মাঠে যে ধান ওরা ফলায়, তার ভাগ চাওয়া আর আপনার মুণ্ডুর ভাগ চাওয়া তো একই কথা হুজুর।

রাম ॥ মানে ওরা আমায় ঠকাতে চাইছে। তা হ্যাঁরে, তোরা আমায় ঠকাতে চাইছিস ?...কিরে কথা বলছিস না কেন, বল ?

বারকোষ ॥ আজ্ঞে আমি বলবো হুজুর ?

রাম ॥ সাট আপ। নো টক। আমি যখন আপনাকে বলতে বলবো তখন আপনি বলবেন। তার আগে কিছু বলবেন না।

বারকোষ ॥ মানে আমি অপমানিত বোধ—

[কথা শেষ হয় না। সু ইত্যাদি প্রায় লাফ দিয়ে বারকোষের মুখ চেপে ধরে। রাম হেসে ওঠে]

রাম। হি-হি-হি-হি-হি আছে। এখনও দু চারটে ভাল লোক আমার দিকে আছে। সবাই আমাকে ঠকাতে চায় না—ঠকায়ও না। তা হ্যাঁরে—তোরা চুপ করে গেলি! বল, তোরা আমায় ঠকাতে চাইছিস নাতো? তবে দ্যাখ, তোরা যদি আমাকে ঠকাতে চাসও, তোদের আমি ঠিক দোষ দিই না। কেন জানিস?

চারজনে॥ (সু ইত্যাদি) কেন হুজুর?

রাম॥ বাড়ীতেই আমি একটা চোর পুষছি। সে রোজ আমাকে ঠকায়। ঠকে ঠকে এখন আমি ছকে নিয়েছি, কে কদ্দুর পর্যন্ত আমাকে ঠকাবে। (হাসি। পরে হাসি থামিয়ে হঠাৎ রেগে) সব কটাকে পেটাবো। হারামজাদা, যার খাবি…যার পরবি, যার দয়ায় থাকতে পারবি, তাকেই কি না তোরা—

কেলে ইত্যাদি॥ আমরা অস্বীকার করি না।

রাম॥ তোরা অস্বীকার করলি কী না কর্‌লি তাতে আমার বড় বয়েই গেল। আমি তোদের তোয়াক্কাই করি না। তোদের সরিয়ে দোব।

সু॥ ওরে শোন। আমার কথা শোন। হুজুরের কথা তোরা মেনে নে।

দুরমুস॥ এমন মহান—।

বারকোষ॥ দেশের পরাণ—।

ছড়ি॥ দীনের দয়াল—।

সু॥ ধনীর ভয়াল।

চারজনে॥ তোরা ছুটি পাবি নে। নে-নে, আর কথা (সু, বারকোষ) বাড়াস নে, হুজুরের কথা তোরা মেনে নে।

রাম॥ আহ্, যারা বোঝবার নয়, তাদের অত করে বোঝাতে হবে না। আমি আমার সিদ্ধান্ত ঠিক করে নিয়েছি। আমি দেখতে চাই, আমার কাছ থেকে চাকরী চলে গেলে, ওদের চলে কেমন করে! হারামজাদা—হতচ্ছাড়া-পাজি-ছুঁচো-রাসকেল। যাঁর খাবে, তারই দাঁতের গোড়া উপড়োবে।

সু॥ কিরে, তোরা এখনও চুপ করে থাকবি?

ঝুলি॥ হুজুরের কাছে তোরা ক্ষমা চাইবি নে?

কেলে ॥ হ্যাঁ হুজুর। আপনি আমাদের জমি দ্যান, তাই আমরা চাষ করি।
সু ॥ (স্বগত) সত্যিই তো, ও জমি নামে আমার, আসল মালিক উনি।
কটা ॥ আপনি আমাদের বীজ দ্যান তাই আমরা ধান বুনি।
বারকোষ ॥ (স্বগত) সত্যিই তো, ও ধান নামে আমার। আসল মালিক উনি।
ঝুলি ॥ কিরে, তোরা চুপ করে রইলি কেন? তোরাও বল।
বল্টু, ভুরমুস ॥ সেই ধান আমরা মাড়াই করি, সেদ্ধ করি, ধান থেকে চাল বের করি।
রাম ॥ ভালো—ভালো। শুনে বড় ভালো লাগলো।
চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) খুউব ভালো···খুউব ভালো লাগলো।
রাম ॥ আরও ভালো লাগলো কেন জানো, কেউ হারামজাদা হরিটার মত এরা কুকুং-কুকুং করে না। কিন্তু—।
চারজনে ॥ (কেলে ইত্যাদি) কিন্তু সেই চাল আপনার নির্দেশে চলে আসে আপনারই গুদোমে, আর আমরা শুকিয়ে মরি।
চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) হু-জু-র—
রাম ॥ এ্যাঁ? কী হোলো?
চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) গোলমাল।
রাম ॥ এ্যাঁ!!
চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) হ্যাঁ হুজুর গোলমাল।
রাম ॥ তাই নাকি? মানে আমাকে ঠকাতে চায়?
সু ॥ হ্যাঁ হুজুর।
বারকোষ ॥ ওরা চায় না, আপনার কথা শুনতে কিংবা মানতে।
চারজনে ॥ (কেলে ইত্যাদি) না হুজুর। আমরা তা বলিনি। আমরা খেতে চাই। ফসলের ভাগ পেতে চাই।
রাম ॥ চুপ করে থাক।
সু ইত্যাদি ॥ চুপ করে থাক।
রাম ॥ হারামজাদা।
সু ইত্যাদি ॥ হারামজাদা।

রাম ॥ আমার কানকে ফাঁকি !!

সু ইত্যাদি ॥ প্রভুর কানকে ফাঁকি !!

রাম ॥ ভেবেছিস, আমি কিছু বুঝি না !!

সু ইত্যাদি ॥ ভেবেছিস, প্রভু কিছু বোঝেন না !!

রাম ॥ বেরো সব।

সু ইত্যাদি ॥ বেরো।

রাম ॥ তোদের জমি আমি নিয়ে নিলাম।

সু ইত্যাদি ॥ কাঁদলেও আর জমি পাবি না।

রাম ॥ তোদের চাকরী আমি নিয়ে নিলাম।

সু ইত্যাদি ॥ না খেয়ে মরগে যা।

রাম ॥ হতচ্ছাড়া-পাজি-ছুঁচো-রাসকেল—

সু ইত্যাদি ॥ হতচ্ছাড়া-পাজি-ছুঁচো-রাসকেল—।

চারজনে ॥ (কেলে ইত্যাদি) খবরদার—

[ওরা পাঁচজনে এক জায়গায় জড়ো হয়ে যায়। কেলে ইত্যাদি আরও বলে]

অনেকক্ষণ চুপ থেকেছি...অনেক গালাগাল শুনেছি। আর নয়।

কেলে, কটা ॥ আমাদের জমির ধান দেবেন কি না।

রাম ॥ তোদের বাবার জমি !! (সু ইত্যাদির সায়)

কেলে, কটা ॥ আমাদের বাবার জমিতে পা দিলে ঠ্যাং কেটে নিতাম।

বল্টু, তুরমুস ॥ মজুরি হিসেবে ধানের ভাগ আমাদের দেবেন কিনা !!

চারজনে ॥ (কেলে ইত্যাদি) বলুন উত্তর দিন।

রাম ॥ সাট আপ !! হারামজাদা, বেরো...বেরো আমার বাড়ী থেকে। সু, বারকোষ ছড়ি, ঝুলি—

চারজনে ॥ ॥ (সু ইত্যাদি) হুজুর—

রাম ॥ ওদের আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছি। সোজা কথায় যদি ওরা যেতে রাজী না হয়, ওদের চুলের মুঠি ধরে ক্যাৎ-ক্যাৎ করে লাথি মারতে মারতে বের করে দিন !

সু ইত্যাদি ॥ বেরো...বেরো এখান থেকে। (মারার জন্যে হাতের লাঠি

তোলে। কেলে, কটা ইত্যাদি খানিকটা পিছিয়ে সোজা হয়ে ফিরে দাঁড়ায়)

চারজনে ॥ (কেলে ইত্যাদি) নাহ্—।

চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) হুজুর—

কেলে, কটা ॥ অনেক মার খেয়েছি, আর নয়।

বল্টু, হুরমুস ॥ অনেক যন্ত্রণা সয়েছি, আর নয়।

চারজনে ॥ বলুন আমাদের ফসলের ভাগ দেবেন কি না?

চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) হুজুর— ?

রাম ॥ দোব। আমি ওদের ন্যায্য পাওনা দোব।

চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) হুজুর !!

রাম ॥ পা আমার খোঁড়া। কিন্তু পা খোঁড়া হয়েছিল কেন?

চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) কেন হুজুর?

রাম ॥ ১৯৪৬ সালে আমি রক্ত দিয়েছিলাম। তারপর থেকেই পায়ের শিরায় ওঠে টান। বহু ডাক্তার-বদ্যিকে দেখিয়েছি। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ভুল চিকিৎসার জন্যে পরে এক নামী নার্ভ স্পেশালিস্ট আমায় অপারেশনের কথা বলেন। কিন্তু, সেই সংগে দুটো ওষুধের কথাও বলেছিলেন। ওষুধ দুটো কী জানেন?

কেলে, কটা ॥ ধানের বদ্লা জান্।

বল্টু, হুরমুস ॥ মারের বদ্লা মার।

চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) এই—প্রভুর কথা শোন...প্রভুকে বলতে দে।

কেলে ॥ এখানে আমরা ওনার ঐ সব ফিরিস্তি শোনার জন্যে আসি নি।

রাম ॥ দাঁড়া—দাঁড়া...এতক্ষণ যখন সব কিছুই শুনলি, এটুকু বা আর বাদ দিবি কেন?

বারকোষ ॥ বেশী উত্তেজিত হওয়া ভাল না। তাই না হুজুর?

সু ॥ হ্যাঁ হুজুর, আপনি বলুন, আমরা শুনছি।

রাম ॥ তাহলে বলি?

ঝুলি ॥ বলুন হুজুর, ওষুধ দুটো কি?

রাম ॥ ওষুধ দুটো হল, মনকে দুর্বল করবে না আর চোখে জল আনবে না।

তা ডাক্তারের ঐ ওষুধ দুটোকে আমি আমার মনের মত করে পাঞ্চ্ করে নিয়েছি। সু, বারকোষ, ছড়ি ঝুলি—

চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) হুজুর ?

রাম ॥ ওদের জিজ্ঞাসা করুন তো, ওরা পাঞ্চ্ মানে জানে কি না !

চারজনে ॥ হ্যাঁরে তোরা জানিস্ ? [ওরা অবিচল]

সু ॥ ওরা গরীব। পড়াশুনো করার সুযোগ ওরা কোথায় পাবে বলুন ? ওরে হতভাগা, পাঞ্চ্ মানে হ'ল মিশিয়ে নেওয়া।

রাম ॥ হ্যাঁ ॥ মিশিয়েই নিয়েছি আমি। কারুর চোখের জল আমাকে টলাতে পারে না, যেমনি পারে না, শত আঘাতেও আমাকে দুর্বল করতে। যদি তা পারতো তাহলে চাল, মশলা, তেলের সমস্ত বাজারটা আমার হাতের মুঠোয় থাকতো না। বুঝেছিস হারামজাদা ? (বলেই বল্টুকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে) হারামজাদা...মারের বদলা মার্... সংগে সংগে সরে গিয়ে কেলোকে লাঠি দিয়ে আঘাত) ধানের বদলা জান্... (সু ইত্যাদি হাসবে) বেরো...বেরো এখান থেকে। আর কোনদিন নিজেদের গাঁ ছেড়ে এখেনে আসবি না বুঝেছিস ? তা সত্ত্বেও যদি আসিস, তাহলে—। ...কী হল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

চারজন ॥ (সু ইত্যাদি) কিরে শুনতে পাচ্ছিস না হুজুরের কথা ? যা এখান থেকে।

কেলে ॥ ঠিক আছে যাচ্ছি। কিন্তু এর শোধ আমরা নেব...এর শোধ আমরা নেব...(চলে যায় সব)।

রাম ॥ হরি...হরি—। ওহো-হো, ও তো আবার বাজারে গেছে। সু—

সু ॥ হুজুর ?

রাম ॥ বারকোষ—

বারকোষ ॥ হুজুর ?

রাম ॥ ছড়ি ?

ছড়ি ॥ হুজুর ?

রাম ॥ ঝুলি—

ঝুলি ॥ হুজুর ?

রাম ॥ কেন আপনাদের আমি ডেকে পাঠিয়েছি জানেন ?

সকলে ॥ না হুজুর !

রাম ॥ আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন, রক্তমাংসের শরীর আমার। বাজারে অনেকে আমাকে অনেক নামে ডাকে। কেউ বলে, কালো-বাজারী, কেউ আমার নাম রাম পোদ্দার বিকৃত করে বলে হারামী পোদ্দার। সবই আমার কানে আসে। কিন্তু, চুপ করে সব সহ্য করে যাই।—কেন জানেন ?

সকলে ॥ কেন হুজুর ?

রাম ॥ রাগা চলবে না···রেগে মাথা গরম করা চলবে না। আর ঠিক সেই-জন্যেই···সেইজন্যেই কারুর গায়ে হাত তোলা আমার সয় না, যদি না, আমাকে ভীষণ রাগিয়ে দেয়।

সকলে ॥ হ্যাঁ হুজুর।

রাম ॥ আজ আমি সত্যিসত্যিই ভীষণ রেগে গিয়ে ওদের মারলাম—কেন জানেন ?

সকলে ॥ কেন হুজুর ?

রাম ॥ ওরা বড় বেয়াদপ্ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে হারামজাদা ঐ সব চেষোগুলো। খালি, নেই—নেই...দাও দাও !! হারামজাদা···তোদের জন্ম হয়েছে কেন ! দেশের মংগল-অমংগল যদি তোরা না দেখিস, ভেবে তোরা যদি চাষাবাদ না করিস তাহলে দেশের অবস্থা কী হবে ?

সকলে ॥ জয় মহারাজ নন্দলালের জয়।

রাম ॥ মানে ?

সু ॥ আজ্ঞে, আপনি শোনেন নি ?

রাম ॥ কী ?

সু ॥ সেই কবিতাটা। সেই যে—একদা নন্দলাল যে করিল ভীষণ একটি পণ, স্বদেশের তরে—

তিনজনে ॥ যে করেই হোক, রাখিবেই সে জীবন।

সু ॥ স্বদেশের তরে—

তিনজনে ॥ যে করেই হোক, রাখিবেই সে জীবন।

সু ॥ স্বদেশের তরে—

তিনজনে ॥ যে করেই হোক রাখিবেই সে জীবন।

সু ॥ কী সাংঘাতিক এই লাইন দুটো। ঠিক যেন—

তিনজনে ॥ কবি, এই ধনী রাম পোদ্দারকে মনে করেই লিখে গেছেন।

সু ॥ আহা-হা, কী স্বদেশ ভাবনা! যেন—

বারকোষ ॥ সকাল বেলায় গরুর মুখে জাব্‌না—। কিংবা—।

ঝুলি, ছড়ি ॥ মদের পাশে কচি ঘাসের দাব্‌না।"

রাম ॥ তাহলে আর একবার বলুন।

চারজনে ॥ কী হুজুর?

রাম ॥ ঐ যে 'জয়' না কী যেন একটা বললেন।

চারজনে ॥ জয় মহারাজ নন্দলালের জয়।

রাম ॥ আহা-আহা, কী সুন্দর, কী মনোরম! আবার একবার বলুন?

চারজনে ॥ জয় মহারাজ নন্দলালের জয়।

রাম ॥ Shut up—শালা শূয়োরের বাচ্চা ··গেঁয়ো গর্দভ...আমারই ডাকে বাড়ী বয়ে এসে, আমাকে অপমান করবে, আর আমি তা মেনে নেব!!

চারজনে ॥ নো হুজুর···না।

রাম ॥ Shut up আমি নন্দলাল? হারামজাদা! কান খুলে শুনুন, আমি নন্দলাল নই, আমি রাম পোদ্দার। লোকে বলে, আমি ব্ল্যাক-মার্কেট করি। হ্যাঁ তাই···তাই। কিন্তু কেন করি? দেশের স্বার্থে নিশ্চয়। যদি আমি তা না করতাম, যদি আমি জিনিসপত্রের দাম না বাড়াতাম, যদি আমি চালের দাম না বাড়াতাম, যদি আমি চিনি-মশলা-সরষের তেল-বাদাম তেল-রেপসীড তেলের দাম না বাড়াতাম, তাহলে দেশের লোক আরও বেশী বেশী খেতো আর নিজেদের পিলে বাড়াতো। হ্যাঁ পিলে। সেই পিলে বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হত যে, একদিন সারা দেশটা পিলে রোগে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু আমি দোব না···যেমন আমি দিই নি মুসলমান কিংবা ইংরেজদের আমলে, তেমনি আজও দোব না। এখন শুনুন, যে জন্যে আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি।

সকলে ॥ বলুন স্যার?

রাম ॥ আপনারাও যদি নিজেদের ধনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে আমাকে ফলো করুন, কঠোর পরিশ্রম করুন। দেখেছেন নিশ্চয়ই, ইদানীং ট্রামে-বাসে-স্টেশনে-লরীতে কী লেখা থাকে—নো সাবষ্টিচ্যুড্ অফ হার্ড ওয়ার্ক।

সকলে ॥ হ্যাঁ স্যার।

রাম ॥ ঐ হার্ড কথাটাকে হোর্ড করে নিন। HOARD-হোর্ড তাহলে কী দাঁড়ায়? নো সাবষ্টিচ্যুড্ অফ হোর্ড ওয়ার্ক—মানে মজুতদারের কোন বিকল্প নেই। বুঝেছেন?

সকলে ॥ নিশ্চয় স্যার।

রাম ॥ নিশ্চয় স্যার ত' পরিশ্রমটা করেছেন কোথায়? এখনও পর্যন্ত ধান তোলার কোন রিপোর্ট দিয়েছেন?

সু ॥ দেবার সময় পেলাম কই স্যার?

বারকোষ ॥ এসেই ত' দেখি কেলে-কটা-বল্টু-ভুরমুষের দল এখেনে হাজির।

রাম ॥ ওরা শয়তান—বিশ্বাসঘাতক—দেশদ্রোহী। দেশের ভালো ওরা চায় না, আপনারা বরাবর তা দেখে এসেছেন, এবং এখনও চোখের সামনে তা দেখলেন। কিন্তু, ওরা থাকবে না—বেশীদিন পৃথিবীর বুকে ওরা থাকবে না। কারণ, যে রাখে, সেই থাকে। আমরা রাখি মানে মজুত করি, তাই আমরা পৃথিবীর বুকে ছিলাম, আছি থাকবো। থাক, ওসব তত্ত্বের কথায় এখন আমাদের দরকার নেই। এখন আমাদের দরকার ধানের। ধানের খবর বলুন?

সু ॥ ভাল না হুজুর।

রাম ॥ হোয়াট!! ভাল না মানে? এত সুন্দর বৃষ্টি হয়েছে...জলের কোন অভাব ছিল না, B.D.O. থেকেই বলুন বা, নিজেদের থেকেই বলুন ভালো বীজ দেওয়া হয়েছে···লোহাচূর আর গোবরপচা সারে মাঠকে মাঠ বোঝাই করে দেওয়া হয়েছে···তবু ধান ভাল হয় নি মানে?

সু ॥ একটু জল···একটা জলের অভাবেই এই অঘটন।

রাম ॥ ঝাপসা কথা শুনতে বা বলতে আমি ভালবাসি না। যা বলার সরাসরি বলুন?

সু ॥ যে পাঁচটা গাঁ আমাদের control-এ, তার সবটাই উঁচু জমির ওপর। খালধারের নীচু জমি যেটুকু আছে, সে সব জমিতে ধান খারাপ হয় নি। কিন্তু, আশ্বিন কার্তিকে এক ফোঁটা বৃষ্টি না হওয়ায় বিঘে প্রতি ধান আদ্ধেক ফাঁপা-চড়া রোদে সব শীষ শুকিয়ে হলদে হয়ে গেছে।

রাম ॥ বারকোষ, আপনারও কী ঐ একই কথা?

বারকোষ ॥ হুজুর, আমার খবর আরও খারাপ।

রাম ॥ কেন?

বারকোষ ॥ আমাকে দেখলেই চাষীরা ক্ষেপে তেড়ে আসে। বলে, ঐ শালা বারকোষ, বারকোষ নিয়ে ধান তুলতে এসেছে। মার্ শালাকে। তবে হুজুর, আমার হাতে যে সাতটা গাঁ আছে, তার সবটাই নীচু জমি। ধান খুব ভালো হয়েছে।

রাম ॥ যাক বাঁচালেন।

বারকোষ ॥ বাঁচালেন কী হুজুর!! ধানটা তোলাবে কে? তার ওপর 'ফসল বুনবে যে, ধান তুলবে সে' না কি যেন সব আইন-টাইন হয়েছে। তাতে ত' ওরা সবাই আবার মাথায় চড়ে বসছে।

রাম ॥ ওহ্, এই কথা! ওরা যে ফসল বুনেছে, তার প্রমাণ আছে কিছু?

বারকোষ ॥ না তা অবশ্য নেই।

রাম ॥ তাহলে কোন চিন্তা নেই। ও ধান উঠবে...যেমন করেই হোক উঠবে। দরকার হয়, বাইরের লোক দিয়ে—।

বারকোষ ॥ কিন্তু, সেটা কী ভালো হবে হুজুর?

রাম ॥ মানে?

বারকোষ ॥ গতবারই ওরা আমাদের মেরে ফেলছিল। খুব কপাল জোরে কোন রকমে বেঁচে গেছি। এবার ওরা হাতে আইন পেয়ে গেছে—।

রাম ॥ বেশী কথা বলা আমি পছন্দ করি না। আমার চাই কাজ। গাঁয়ের জোতদার, মহাজন সেজে সব বসে থাকবেন, আর কথামত কাজ করতে পারবেন না, তাতো হয় না। যে করেই হোক, ২০ হাজার টন চাল আমার চাই, নইলে পোষ মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা ফেরত চাই। ঝুলি—।

ঝুলি ॥ হুজুর?

রাম। আপনার ধানকলে ২০ হাজার টন ধান, মাড়াই ভানাই হবে না?

ঝুলি॥ বিশ কেন হুজুর, আপনি বলে দিন ২০০ হাজার টন ধান ভেঙে আপনার গুদোমে পাঠাতে পারি।

রাম॥ ছড়ি—!

ছড়ি॥ হুজুর?

রাম। লরী সব ঠিক আছে?

ছড়ি॥ তিনটে ব্রেক-ডাউন হয়ে গ্যারেজে রয়েছে। বাকী আটটা ঠিক আছে।

রাম॥ বাকী তিনটেও সাতদিনের মধ্যে রাস্তায় নামাতে হবে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই ধান কাটা শুরু হবে শুনুন সু, বারকোষ—

সু, বারকোষ॥ বলুন হুজুর?

রাম॥ এখন থেকে চাষীদের সংগে খুব ভালো ব্যবহার করবেন। ওরা যেন বোঝে, ওরা যা করছে, সেটাই ঠিক। ধানগাছগুলো কেটে শুকোতে দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা। সংগে সংগে আমায় খবর পাঠাবেন। ছড়ি-

ছড়ি॥ বুঝতে পেরেছি হুজুর। সংগে সংগে আমার লরী আর লোক নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে খড়্ সমেত ধান তুলে এনে—

ঝুলি॥ আমার ধানকলে। (হাসি)।

রাম॥ হ্যাঁ। মনে থাকে যেন। একটু এদিক সেদিক হলে—(প্রস্থান পথের দিকে এগোয়। পেছন ফিরে ওদের দিকে তাকায়)। খাবারের ব্যবস্থা যদি অন্য কোথাও করে না থাকেন, তাহলে এখানেই সবাই খেয়ে যাবেন।

(প্রস্থান)

ঝুলি। কী মশাই, কী ভাবছেন?

সু॥ কী আর ভাববো? হয় ধান নয় মান।

বারকোষ॥ হয় ধান, নয় মান। এবার যে কী করে ধানগুলো কাটাই!

ছড়ি॥ সে ভাবনা ত' আপনার নয়। চাষীরা ধান যখন বুনেছে, তা ওরা কাটবেই। সংগে সংগে আমাকে খবর পাঠিয়ে দেবেন। ব্যস, তারপর যা করার আমি করবো।

ঝুলি॥ কী করবেন আপনি? কাঁচা ধান ত' আর স্যারের গুদোমে তুলবেন না,

তার জন্তে দরকার আমাকে। কোন রকমে আমার ওখানে এনে ফেলে দেবেন। তারপর চাল হয়ে গেলে, কোন্ ধানে কোন চাল বেরিয়েছে কে ধরবে !! (হাসি)

সু॥ কিন্তু বিশ হাজার টন চাল! এক আধ টন হলে—

ছড়ি॥ টাকাগুলো যখন advance নিয়েছিলেন, তখন মনে ছিল না?

[বাজার সমেত হরির প্রবেশ]

হরি॥ মশাইরা কী থাকবেন, না যাবেন? কুরুং-কুরুং।

সু॥ মানে?

হরি॥ বলছি, মশাইরা কী থাকবেন না, যাবেন?

সু॥ তোমার মালিক যে বলে গেল, এখানে খাওয়া দাওয়া করে যেতে।

হরি॥ বাবু, একথা বলে গেচেন! অসম্ভব, হতেই পারে না। কুরুং-কুরুং—।

সু॥ আমি কি তাহলে মিথ্যে কথা বলছি? তুমি এদের জিজ্ঞাসা কর না, তোমার বাবু কী বলেছেন!

তিনজনে॥ হ্যাঁ ভাই, তোমার বাবু ঐ কথাই চলে গেছেন।

হরি॥ আমি এখনও বলছি অসম্ভব। বাবু ও কথা আপনাদের বলতেই পারে না কুরুং-কুরুং। বড়জোর বলতে পারেন, আপনারা খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা যদি অন্য কোথাও করে না থাকেন, তাহলে এখেনে খেঁয়ে যাবেন।

সু॥ হ্যাঁ। এ কথাই বলে গেছেন।

হরি॥ হতেই হবে। বাবুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন আপনারা ক'টা বছর! আমি করছি প্রেথম যখন বাবু বড়বাজারে মুদীর দোকান দিল। সে কি আর আজকের কথা! 'সারা দেশ জুড়ে তখন স্বাধীন হ'ব…স্বাধীন হব' সে কি ধিন্‌তা নাচন। কোলকাতায় তখন ট্রাম-বাস চলতো বটে, তবে এত ঘন ঘন নয়, আর এত লোকও ছিল না। যাক সে কথা, যে কথা বলছিলেন কুরুং-কুরুং। আপনারা তাহলে যান, অন্য কোথাও খাবার ব্যবস্থা করুন গে।

চারজনে॥ এ কি যাচ্ছো কোথায়?

হরি॥ আপনাদের সংগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্ বক্ করলে ত' আমার রান্নাগুলো হয়ে যাবে না। বাড়ীতে দ্বিতীয় লোক নেই। বাবু আবার ঠিক ১২-৩০ টায় খেতে বসেন। আর তাও কি—সব সেদ্ধ।

সকলে ॥ এঁ্যা !!

হরি ॥ হ্যাঁ। কুরুং-কুরুং এতটুকু নুন পর্যন্ত বাবু খান না। তেল তো কোন দূরের কথা। মাছ-মাংস-ডিম যে কদ্দিন দেখিনি ভগবানই জানেন।

সকলে ॥ তাহলে ওটা কী?

হরি ॥ এটা! হে-হে-হে, কাঁটা, মাছের কাঁটা, ঐ যে একটা কুকুর, বাবুর ঐ একটাই সখ—কুকুর পোষা। সেই কুকুরের জন্যে কুরুং-কুরুং। বাজার থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে এগুলো নিয়ে আসি। দেখবেন দেখবেন আপনারা?

স্থ ॥ নাহ্, তুমি যখন বলছো—

হরি ॥ তাহলে বলুন, এখানে কী আপনারা খাবেন?

স্থ ॥ ওয়াক্ থুঃ, ওসব মানুষে খায়!

বারকোষ ॥ আমাদের পেটে ত' আর ন্যাবা হয় নি, যে ঐসব সেদ্ধ খাবো।

হরি ॥ সে আপনাদের ইচ্ছে। শেষে খেতে বসে আমাকে গালাগাল দেবেন, তাই বলে দেওয়া। আপনাদের মত মান্যি গন্যি লোককে ত' আর আমি ঐসব সেদ্ধ দিয়ে খেতে দিতে পারি না—তাই আগে থেকে বলে দিলুম! কুরুং-কুরুং— (প্রস্থান)

স্থ ॥ তাহলে চলুন। শুনলেন ত' সব। এখেনে দাঁড়িয়ে না থেকে কোনো হোটেলে-ফোটেলে খাবার ব্যবস্থা দেখিগে।

তিনজনে ॥ অগত্যা। তাই চলুন। (প্রস্থান)

স্থ ॥ ওহে শুনছো?

হরি ॥ (ভেতর থেকেই) বলুন—

স্থ ॥ তোমার বাবুকে বলো, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে ফেরার পথে আবার দেখা করে যাবো—কেমন? (প্রস্থান)

হরি ॥ আচ্ছা—। (বেরিয়ে আসে) এঁ্যাঃ, খাওয়া-দাওয়া করে যাবে! ওনারা খাওয়া-দাওয়া করে যান, আর আমি বসে বসে রাঁধি! সে বান্দা আমি নই। তার ওপর শুনেছি গাঁয়ের ঐসব জোতদার-মহাজনগুলো নাকি কুরুং-কুরুং ঢাকীদের মত গেলে!

[ভেতরে গমনোদ্যত। রামের প্রবেশ]

রাম ॥ তুই হতচ্ছাড়া, আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে ছাড়বি।

হরি ॥ কেন হুজুর ?

রাম ॥ মাছ আনতে তোকে কে বলেছে ? আর এনেছিলই যখন, তখন ওদের দেখাবারই বা কী দরকার ছিল ?

হরি ॥ দেখিয়েছি কোথায় ?

রাম ॥ না দেখাস নি। কিন্তু যদি ওরা ঐ পুটলীটা খুলে দেখতে চাইতো ?

হরি ॥ দেখতে চাইলেই হ'ল ! এমন কথা বলবোই বা কেন, যে, ওরা দেখতে চাইবে ! তাহলে আপনার কাছ থেকে ট্রেনিং পেলাম কী ?

রাম ॥ পয়সা ফেরত দে।

হরি ॥ কুরুং-কুরুং !! পয়সা !!

রাম ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ পয়সা। দশটা টাকা নিয়ে বাজারে গেলি—কিছু কি ফেরে নি ?

হরি ॥ কোত্থেকে ফিরবে ? দিন-রাত চাল-ডাল-তেল-মশলার মণ মণের হিসেব কষছেন। খুচরো আলু-পটল-কপি-কড়াইশুঁটির দর জানেন। ধরুন না কেন আলু—আলুর দরই তিনটাকা করে কেজি।

রাম ॥ কত ?

হরি ॥ তিনটাকা। পটল ছ টাকা, কপি একটা দেড় টাকা, কড়াইশুঁটি ছ টাকা, মাছ আঠারো টাকা। কুরুং-কুরুং—টমেটো—।

রাম ॥ তোকে হতভাগা এত দর দিয়ে এসব কে আনতে বলেছে ? আবার হাসছিস ! হতচ্ছাড়া-হারামজাদা-পাজি-ছুঁচো-রাসকেল—।

হরি ॥ গালাগাল আমাকে হুজুর, যত ইচ্ছে আপনি দিতে পারেন। তবে হুজুর এ সবই আপনার শিক্ষে।

রাম ॥ আমার শিক্ষা ?

হরি ॥ তা নয়তো কী ? আপনিই বলুন হুজুর, ঐসব জোতদার মহাজনদের কাছ থেকে আপনি কত করে চাল কেনেন, আর কত করে বিক্রি করেন। তারপর ডাল-তেল-মশলা—কুরুং-কুরুং, এগুলো ত' বাদই দিলাম।

রাম ॥ হারামজাদা, আবার মুখের ওপর কথা !!

হরি ॥ মুখের ওপর কথা হল ? আপনি যা করেন, আমিও তো তাই করি ?

রাম ॥ আমি কী করি ?

হরি ॥ কেন কম দামে মাল কিনে বেশী দামে বিক্রি করেন। আমিও তেমনি —(কুরুং-কুরুং—র‍্যা— !

রাম ॥ বেরো—বেরো এখান থেকে। দরকার নেই আমার চাকরের।

হরি ॥ তা না হয়, যাচ্ছি। কিন্তু, আমি চলে গেলে, আপনাকে, আপনার ভাগনেকে রেঁধে খাওয়াবে কে ?

রাম ॥ কাকে রেঁধে খাওয়াবি ?

হরি ॥ কেন আপনাকে, আপনার ভাগনেকে। বাব্বাঃ এই প্রেথম আপনার বাড়ীতে আপনার একজন আত্মীয় এল। সেই জন্যেই ত' ভালমন্দ আনতে গিয়ে একটু বেশী খরচ হয়ে গেল।

রাম ॥ Shut up কোই নেই হ্যায়। তিনকূলে আমার কেউ নেই। কোথায় —কোথায় সে ?

হরি ॥ ঐ তো শুনছেন না.. ভেতরে...গান গাইছে ?

রাম ॥ গান গাওয়াচ্ছি! হারামজাদা! পিঠের ছাল তুলে দোব···থানায় পাঠাবো...জেলে পাঠাবো...কোথায় আছিস হতভাগা—

(প্রস্থান পেছনে হরি)

[অপর দিক দিয়ে পুনরায় প্রবেশ সু, বারকোষ ছড়ি, ঝুলি]

সু ॥ চুপ!

বারকোষ ॥ ব্যাপারটা খুব গোলমেলে মনে হচ্ছে !

ছড়ি ॥ দূর মশাই! পেটে ছুঁচোয় ডন্ মারছে, আর, ওনারা এখন ডিটেকটিভ গিরি ফলাচ্ছেন !

ঝুলি ॥ যাই বলুন, ভাগ্যিস্ ফিরে এসেছিলাম। নইলে, এই বালিগঞ্জে কোথায় হোটেল-হোটেল করে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতেন ? এখন প্রভুর পায়ের তলায় সটান শুয়ে পড়ে বলবো—

তিনজনে ॥ প্রভু, কোথাও কিছু জুটলো না। যা শাক-ভাত সেদ্ধ আছে দিন। নইলে হুজুর মরে যাবো।

ঝুলি ॥ দূর মশাই, শাক ভাত সেদ্ধ খেতে যাবো কোন্ দুঃখে! শুনলেন না, কাটা পোনা মাছ দিয়ে কপির ডাল্না হবে ?

সু ॥ তার আগে দাঁড়ান, ওদের গোলমালটা আগে মিটুক।

ঝুলি ॥ আদৌ এটা গোলমাল নয়।

সু ॥ গোলমাল নয়?

ঝুলি ॥ না। পাছে অন্য কেউ এসে সম্পত্তিতে ভাগ বসায়, তাই রামবাবু সকলের কাছে বলে বেড়ান, তিনকূলে তার কেউ নেই। কিন্তু আসলে—।

সু॰॥ চুপ। চলুন, ওরা আসছে। আবার ঐ পাঁচিল ধারটায় চুপ করে বসি।

ছড়ি ॥ দেখুন, আপনাদের মধ্যে থ্রিল, এ্যাকসন থাকতে পারে, আমার নেই। পেট আমার চু-চু করছে। এখুনি আমার কিছু খাওয়া দরকার। নইলে বায়ু সরতে আরম্ভ করবে।

[ভেতরে গোলমাল—বেরো…বেরো শয়তান…মামা!]

সু ॥ চলুন—চলুন মশাই…তাড়াতাড়ি চলুন…এখুনি এসে পড়বে ওরা।

[চারজনের প্রস্থান]

রাম ॥ হারামজাদা…বল…বল বলছি…বল তুই কে?

ভাগনে ॥ আহ্, ছেড়ে দাও মামা, লাগছে।

রাম ॥ লাগাচ্ছি!! হারামজাদা চিটিং বাজী!! জানিস না তুই কার বাড়ীতে হানা দিয়েছিস!! বল তুই কে?

ভাগনে ॥ না ছাড়লে বলবো কি করে? আগে ছাড়ো তবে তো বলবো।

রাম ॥ সেটি চলবে না। আমি ছাড়ি, আর তুই পালা—সে বান্দা আমি নই। পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে তবে আমি ছাড়বো হরি—এই হরি—এই হরি—[একটি বড় হাতা নিয়ে প্রবেশ করে হরি]

হরি ॥ বাবু?

রাম ॥ হারামজাদা!! ঐ হাতা এনেছিস কেন? আমি কী তোকে—

হরি ॥ আজ্ঞে আপনার ভাগ্নে…ওকে একটু হাতা করে দুধও খাওয়াবেন না? নইলে, কুরুং-কুরুং—।

রাম ॥ Get out I say—এই কোথায় যাচ্ছিস?

হরি ॥ আজ্ঞে আপনি যে যেতে বললেন!

রাম ॥ হতচ্ছাড়া-পাজি-ছুঁচো-রাসকেল !! নিয়ে যা—নিয়ে যা একে থানায়। দারোগাবাবুর হাতে দিয়ে বলবি—

ভাগনে ॥ আহ্, কী হচ্ছে কী মামা !!

রাম ॥ Shut up নিকুচি করেছে তোর মামার! কে তোর মামা !! দুনিয়ায় আমার কেউ নেই—ভাইপো-ভাগ্নে-ভাইঝি, পিসী-মাসী-খুড়ী কেউ নেই। বল হারামজাদা কে তুই ?

ভাগনে ॥ তখন থেকে খালি মেরেই চলেছ—আগে ছাড়বে তবে না বলবো ?

রাম ॥ কিছুই তোকে বলতে হবে না। যা বলার পুলিশের কাছে গিয়ে বলবি। হরি—।

হরি ॥ বাবু ? এই যে হাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি বললেই কুরুং-কুরুং—গরমজল এনে মুখে ঢেলে দোব।

রাম ॥ দ্যাখ হরি, রসিকতার একটা সময় কাল আছে। এটা রসিকতার সময় নয়।

ভাগনে ॥ আহ্, মামা, তুমি বুঝছো না কেন—

রাম ॥ Shut up—কে তোর মামা, বলি কে তোর মামা ? হারামজাদা! তোর মত শঠ, শয়তান যদি আমার ভাগনে হত, আমাকে মামা বলে ডাকার আগে তার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলতাম।

ভাগনে ॥ মনে অত নোংরামির প্রশ্রয় দাও কেন ? মনে যত বেশী নোংরামির প্রশ্রয় দেবে মনটা তত নোংরা হয়ে—।

রাম ॥ Shut up !! Don't give me জ্ঞান। এই হরি শোন ?

হরি ॥ কুরুং-কুরুং, বলুন কী করবো ?

রাম ॥ একে নিয়ে যা…এখুনি থানায় নিয়ে যা। মেজ দারোগাবাবুকে গিয়ে বলবি—। এ কিরে—এই কাঁদছিস কেন ?

হরি ॥ আমাকে আর যা খুশী বলুন, কিন্তু ঐ থানা পুলিশের কাছে যেতে বলবেন না।

রাম ॥ কেন ? তোর ভয়টা কিসের ?

হরি ॥ ভয় কী আর সাধে !! ও মাছের মধ্যে ইলিশ আর কাজের মধ্যে পুলিশ—এই দুটোকেই আমার সমান মনে হয়।

রাম ॥ ঠিক আছে—তোকে পুলিশের কাছে যেতে হবে না। তুই চুপ কর। এই যে, এ বাড়ীতে কখন ঢোকা হয়েছে ?

ভাগনে ॥ কেন ? হরি বলেনি কিছু ? কাল রাতে।

রাম ॥ হোয়াট !! কাল্‌রাত থেকে এক অজানা অচেনা ধুম্ব পুরুষ আমার বাড়ীতে আস্তানা গেড়েছে, আর আমি বাড়ীর মালিক হয়ে কিনা—

ভাগনে ॥ অবিশ্যি হরি তোমাকে বলার স্কোপ পায় নি। কারণ, কাল রাতে ত' তুমি বাড়ী ফেরোনি।

রাম ॥ That's not your look out—আমি বাড়ীতে ফিরি না ফিরি, তুই খবরদারি করার কে ? হরি—

হরি ॥ বাবু ?

রাম ॥ এর হাতে কোন স্যুটকেশ-ফুটকেশ ছিল ?

হরি ॥ হ্যাঁ স্যুটকেশ ত' একটা ছিল ? আমাকে এসে বললে আমি শ্যাম-বাজারের দিদির বাড়ী থেকে এসেছি। তাই আমি বেশী কথা না বলে, ওপরের দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটা—।

রাম ॥ সব্যনাশ করেছে। চল্‌…চল্‌ হারামজাদা তোর স্যুটকেশে কী ছিল ! ইতিমধ্যে কী কী গেঁড়িয়ে স্যুটকেশে পুরেছিল ! (টানতে টানতে ভেতরের দিকে নিয়ে যায়। পেছনে হরিও যায়)

[অপরদিক দিক দিয়ে প্রবেশ করে স্থ, বারকোষ, ছড়ি, ঝুলি]

ছড়ি ॥ এদিকে আপনারা মজা লুটছেন, আর ওদিকে আমাদের বাড়ীতেও ভাগনে টাগনে কেউ গিয়ে হাজির হয়েছে কি না কে জানে !

ঝুলি ॥ কেন, আপনিও কী বাড়ীর চাকরের ওপর সব ফেলে বাইরে রাত কাটান নাকি ? (বাইরের দিক দেখতে দেখতে)

ছড়ি ॥ আমি যখন লরী ও'লা, তখন মাঝে মধ্যে বাইরে রাত কাটাতে হয় বৈকি। তবে আমি আপনার মত রেড-মার্কড্‌ জায়গায় গিয়ে রাত কাটাই না।

ঝুলি ॥ Shut up—আমার ব্যক্তিগত affairs'এ নাক গলাবেন না।

স্থ ॥ কী হচ্ছে কী আপনাদের ?

বারকোষ ॥ দেখছেন, এদিকে এক সমস্যা এসে হাজির। এই সময় আপনারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছেন!

ছড়ি ॥ আমার খিদে পেয়েছে—ব্যস, আমি চললাম।

ঝুলি ॥ আপনি একা যাবেন? আমারও যে খিদে পেয়েছে।

সু ॥ আমি জমি তদারকীর কাজ ছেড়ে দোব।

বারকোষ ॥ কেন?

সু ॥ মশাই, কী করে রামবাবুর গোলায় ২০ হাজার টন চাল তুলে দোব, যে চিন্তায় পাগলা হয়ে যাচ্ছি, আর ওনারা এখন নিজেদের খিদের চিন্তায় মশগুল। আমি ওসব জোতদারী কারবার ছেড়ে দোব।

বারকোষ ॥ হুজুরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে contract form'এ সই করার সময়, এ কথা মনে হয় নি?

সু ॥ টাকা ত' আপনিও নিয়েছেন।

বারকোষ ॥ আমি টাকা নিয়েছি—যে করেই হোক ধান তুলে দোব।

ছড়ি ॥ তুলে দোব মানে!! আমার লরী ছাড়া আপনি ধান তুলতে পারবেন?

ঝুলি ॥ রামবাবু ধান চান না, চান চাল। আমার কলে ভাঙ্গা হবে।

সু ॥ আমরা জানি, আপনার ধানকলের সে Capacity আছে। কিন্তু অতটা ধান দিয়ে দিলে, আমাদের পরিবার-ছেলে-পুলে নিয়ে সারাবছর না খেয়ে মরতে হবে।

বারকোষ ॥ সত্যিই ত' একথা ত' মাথায় আসেনি। নিজের হাতের মুঠোয় সব চলে গেলে, নিজেরা খাবো কী? শেষে কী, ঐ চাল বাজার থেকে আমাদের কিনে খেতে হবে?

সু ॥ সেইজন্যেই বলছি, চলুন, হুজুরের পা ধরে ঝুলে পড়ি। যদি কোন রকমে মনটা ভেজাতে পারি।

ছড়ি ॥ এঁ্যাঃ, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর!! আরে মশাই আপনারা ত' মাত্র এক বছর রামবাবুর সংগে কারবার করতে নেমেছেন, আর—

ঝুলি ॥ আমি, সতের বছর। সতের বছর ধরে আমি আর উনি একসংগে কাজ করে চলেছি। এক চুল এদিক ওদিক হবার যো নেই contract is contract.

সু/বারকোষ ॥ এখন উপায় ?

ঝুলি ॥ উপায় একটা ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়।

সু ॥ বলুন ? দয়া করে বলুন ?

বারকোষ ॥ আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবো !

সু ॥ তাতে যদি দরকার হয়, এইখানে অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাবো।

ছড়ি ॥ না মশাই, আমি ঐসব অনশনের মধ্যে নেই। এমনিতেই আমার পেট চুঁ-চুঁ করছে।

ঝুলি ॥ দূর মশাই! আপনারা খালি খাওয়া-খাওয়া দেখছেন, ভদ্রলোকের বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে না খেয়ে মরার যোগাড় হয়েছে, আর আপনি—

সু ॥ তাড়াতাড়ি বলুন, কী উপায় আছে ? আমরা তাই করবো।

বারকোষ ॥ নইলে, এই বয়সে যদি ব্যাগ নিয়ে বাজার থেকে চাল কিনতে হয়—লজ্জার একশেষ।

ঝুলি ॥ সবই ত' বুঝছি। কিন্তু ঐ ভাগ্‌নেটা এসে যে সব গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছে। এখন কী রামবাবুকে সে সব কথা বলতে পারবেন ?

সু ॥ বলতেই হবে—যে কোন ভাবেই হোক। আপনি বলুন ?

[ভেতরে গোলমাল "—ছেড়ে দাও মামা, আর কখনো করবো না"…"হারামজাদা, চুরি করে, তোকে জেল খাটিয়ে ছাড়বো—" বলেই ভাগনেকে ছুড়ে ভেতরে ফেলে দেয়। পেছনে এসে হাজির হয় রাম, তার হাতে একটা সোনার বাঁট, তার পেছনে হরি]

রাম ॥ দেখলি…দেখলি হরি, বললাম না এ বেটা চোর !! আমি যদি ভোর রাত্রে—

ভাগনে ॥ না মামা বিশ্বাস কর—

রাম ॥ Shut up. আমার কোন ভাগ্‌নে নেই। তাছাড়া তোর মত একটা চোর হবে আমার ভাগনে !!

হরি ॥ ছ্যা—ছ্যা ; তা কি কখনো হতে পারে বাবু ?

ভাগনে ॥ তুমি যদি ব্ল্যাক মার্কেট করে সমাজের মাথা হতে পারো, আমি চোর হয়ে তোমার ভাগ্‌নে হতে পারবো না ?

রাম ॥ Shut up—তোকে আমি মেরেই ফেলবো। হারামজাদা। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা !! আমি ব্ল্যাকমার্কেট করি...(মারতে উদ্যত)

স্থ ॥ হুজুর। একা পারবেন না। তাছাড়া, আপনার পা খোঁড়া...আপনি আমাদের ওপর ছেড়ে দিন।

বারকোষ ॥ আমরা থাকতে আপনি কেন কষ্ট করবেন হুজুর ?

ছড়ি ॥ যদি হাতে হ্যাণ্ডেলটা থাকতো এক ঘায়ে শেষ করে দিতাম।

ঝুলি ॥ কোন কিছু করতে হবে না হুজুর, আমার কারখানায় পাঠিয়ে দিন। ওকে গরমজলে পুড়িয়ে মারবো।

চারজনে ॥ ছেড়ে দিন হুজুর আমাদের হাতে।

[রাম কিন্তু ওদের কথা শুনছে না। সে ভাগনেকে গালাগাল দিচ্ছে আর মেরেই চলছে। পুলিশ বেশে প্রবেশ করে, কেলে, কটা, বল্টু, দুরমুস। কেলে কটার হাতে রাইফেল, বল্টু-দুরমুসের হাতে লাঠি]

চারজনে ॥ ছেড়ে দিন ওনাকে।

পাঁচজনে ॥ (হাত তুলে) মা...মা...মানে ?

চারজনে ॥ আগে সরে যান। তারপর কথা।

রাম ॥ হে-হে-হে, সে ত' বটেই...সে ত' বটেই। আপনারা এসে গেছেন, ভালই হয়েছে। এই দেখুন না, ঐ লোকটা আমার ভাগনে সেজে বাড়ীতে ঢুকে আমার জিনিসপত্র চুরি করেছে। এ একটা চোর !

কেলে ॥ উনি চোর নন। উনি আমাদের অফিসার।

পাঁচজনে ॥ অফিসার !!

কেলে ॥ হ্যাঁ অফিসার। বালিগঞ্জ থানার উনি O. C.

পাঁচজনে ॥ O. C. !! (পাঁচজনে মাথায় হাত দিয়ে বসে)

কেলে ॥ স্যার, আপনার লাগে নি তো ?

সুব্রত ॥ লাগার কথা পরে হবে। আগে ওকে গাড়ীতে তুলুন।

চারজনে ॥ (স্থ, বারকোষ ইত্যাদি) হুজুর !!

রাম ॥ কেন আমাকে গাড়ীতে তোলা হবে, আমি জানতে চাই ? (কেলে, কটা ইত্যাদি তৈরী হয়।)

চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) কেন ওনাকে গাড়ীতে তোলা হবে, আমরাও জানতে চাই ?

সুব্রত ॥ বেশী জানতে চাইবেন না, তাতে বিপদ বাড়বে। আপনাদের বিরুদ্ধেও কম অভিযোগ সরকারী অফিসে জমা নেই।

ছড়ি ॥ আমি চললাম। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। (প্রস্থান)

রাম ॥ ছড়িবাবু !

ঝুলি ॥ এখুনি আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে। আমি চলি। (প্রস্থান)

রাম ॥ ঝুলিবাবু !!

সু, বারকোষ ॥ আমরাও চললাম। মাঠের ধানগুলো বোধ হয় হরির লুঠ হয়ে গেল। (প্রস্থান)

রাম ॥ বিশ্বাসঘাতক…শয়তান…ওদের আমি—!!

সুব্রত ॥ রেগে কোন লাভ হবে না রামবাবু।

চারজনে ॥ (কেলে ইত্যাদি) চলুন।

রাম ॥ আমার দোষ কী…কেন আমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হবে… জানতে না পারা পর্যন্ত জ্যান্ত অবস্থায় আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না।

সুব্রত ॥ আস্তে…আস্তে রামবাবু…অত তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী একটা! শ'য়ে শ'য়ে অভিযোগ থানায় জমা আছে! থানায় চলুন—সব জানতে পারবেন। কালাচাঁদবাবু নিয়ে যান।

[ওরা রামকে নিয়ে টানতে টানতে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে। হরি কেঁদে ওঠে।]

হরি ॥ বাবুগো…একি সব্যনাশ হ'ল গো…।

॥ পর্দা ॥

[সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা অনুসরণে লেখা হল এই একাংক]

নাট্যকারের ঠিকানা : ৮ ন্যায়লঙ্কার ঠাকুর রোড, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্ প্রসঙ্গে—

শ্রী বোম্মানা বিশ্বনাথম্ আদিতে তেলুগুভাষী, কিন্তু তিনি শুধু বাঙালা লেখেনই না, আধুনিক বাঙলার একজন উল্লেখযোগ্য লেখক-রূপেই নিজের স্থান করে নিয়েছেন···বিশ্বনাথমের মতো উদার দৃষ্টি বহু-ভাষাবিদ্ সাহিত্যিকরাই ভাবী ভারতকে গড়ে তুলবেন এই আশা নিয়েই স্বাগত জানাচ্ছি তাঁকে।

(যুগান্তর : ২৮শে আগষ্ট, ১৯৬০)

···The essence of Bengal's literary style he has mastered to perfection. He has been offering distinct service to the Bengali literature····· Some day he (Bommana Viswanatham) may be the 'Joseph Conrad' of Bengal.

(The Amrita Bazar Patrika, 25th Sept. 1960)

বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা ভাষায় তিনি একটি ঈর্ষণীয় রচনাভঙ্গী আয়ত্ত করেছেন।

(দেশ : ১৯শে নভেম্বর, ১৯৬০)

তাঁর প্রত্যেকখানিতে তিনি গভীর সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

(আনন্দবাজার : ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬২)